মাসুদ রানা

টপ সিক্রেট

দুই খণ্ড একত্রে

কাজী আনোয়ার হোসেন



সেবা প্রকাশনী

মাসুদ রানা

দুইখণ্ড একত্রে

কাজী আনোয়ার হোসেন

টপ সিক্রেট

মাসুদ রানার জীবনে এরচেয়ে মারাত্মক ঘটনা
আর ঘটেছে কিনা সন্দেহ। চোখের সামনে থেকে
ধরে নিয়ে গেল ওরা পিতৃসম রাহাত খানকে।
শত্রুর দেওয়া সূত্র ধরে তাদের ফাঁদে পা দেওয়াটাই সমস্যা
সমাধানের একমাত্র উপায়। গ্রিসের রাজধানী এথেন্সে
চলে এসেছে রানা। এখানে তৃতীয় পক্ষ ভারতকে চেনা গেল।
দেখা গেল, ইন্ডিয়ান আর্মি ইন্টিলিজেন্স-এর
চীফ মাধব সিন্ধিয়ার জীবনে চাওয়ার মত জিনিস মাত্র একটাই
আছে–মাসুদ রানার লাশ। রাহাত খান বন্দি,
রানা তাঁকে উদ্ধার করবে কি, শত্রুরা ওকেও ধরে
এনে সর্বনাশের বারো আনা পূর্ণ করে ফেলল। তারপর?

সেবা প্রকাশনী, ২৪/৪ সেগুনবাগিচা, ঢাকা-১০০০
সেবা শো-রুম: ৩৬/১০ বাংলাবাজার, ঢাকা-১১০০
প্রজাপতি শো-রুম: ৩৮/২ক বাংলাবাজার, ঢাকা-১১০০

মাসুদ রানা - ৩৩২, ৩৩৩

টপ সিক্রেট ১,২

লেখকঃ কাজী আনোয়ার হোসেন

কৃতজ্ঞতায়ঃ তৌকির কবির তুষার

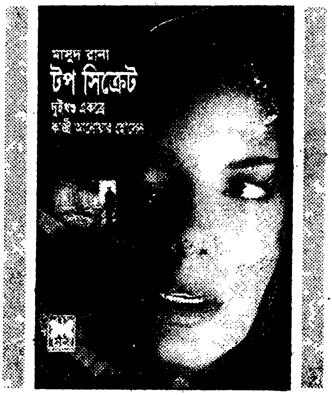
স্ক্যান ও এডিটঃ ফয়সাল আলী খান

মাসুদ রানা

টপ সিক্রেট

(দুইখণ্ড একত্রে)

কাজী আনোয়ার হোসেন



সেবা প্রকাশনী
২৪/৪ সেগুনবাগিচা, ঢাকা-১০০০

ISBN 984-16-7332-0

প্রকাশক
কাজী আনোয়ার হোসেন
সেবা প্রকাশনী
২৪/৪ সেগুনবাগিচা, ঢাকা ১০০০

প্রথম প্রকাশ ২০০৫

রচনা: বিদেশী কাহিনী অবলম্বনে

প্রচ্ছদ বিদেশী ছবি অবলম্বনে
রনবীর আহমেদ বিপ্লব

মুদ্রাকর
কাজী আনোয়ার হোসেন
সেগুনবাগান প্রেস
২৪/৪ সেগুনবাগিচা, ঢাকা ১০০০

হেড অফিস
সেবা প্রকাশনী
২৪/৪ সেগুনবাগিচা, ঢাকা ১০০০
দূরালাপন ৮৩১ ৪১৮৪
মোবাইল. ০১১-৮৯৪০৫৩
জি. পি. ও বক্স: ৮৫০
E-mail sebaprok@citechco.net
Web Site www.ancbooks.com

একমাত্র পরিবেশক
প্রজাপতি প্রকাশন
২৪/৪ সেগুনবাগিচা, ঢাকা ১০০০

শো-রুম
সেবা প্রকাশনী
৩৬/১০ বাংলাবাজার, ঢাকা ১১০০
প্রজাপতি প্রকাশন
৩৮/২ক বাংলাবাজার, ঢাকা ১১০০
মোবাইল ০১৭৮ ১৯০২০৩

Masud Rana
TOP SECRET
Part I & II
By Qazi Anwar Husain

সেবা প্রকাশনী

উনচল্লিশ টাকা

সূচি:

মাসুদ রানার ভলিউম

	...র রাহাত-১,২ (একত্রে)	৪০/-
	...নমাদ-১,২ (একত্রে)	৩৫/-
	...বুশ-১,২ (একত্রে)	৩২/-
	...রক বারমুডা-১,২ (একত্রে)	৩৮/-
	...বনামী বন্দর-১,২ (একত্রে)	৪১/-
...	নকল রানা-১,২ (একত্রে)	৩৫/-
...২১-১২২	রিপোর্টার-১,২ (একত্রে)	৪৫/-
১২৩-১২৪	মরুযাত্রা-১,২ (একত্রে)	৩৮/-
১২৫-১৩১	বন্ধু+চ্যালেঞ্জ	৪৪/-
১২৬-১২৭-১২৮	সংকেত-১,২,৩ (একত্রে)	৫৫/-
১২৯-১৩০	স্পর্ধা-১,২ (একত্রে)	৩৫/-
১৩২-১৫৩	শত্রুপক্ষ+ছদ্মবেশী	৪৪/-
১৩৩-১৩৪	চারিদিকে শত্রু-১,২ (একত্রে)	৩৪/-
১৩৫-১৩৬	অগ্নিপুরুষ-১,২ (একত্রে)	৪৫/-
১৩৭-১৩৮	অন্ধকারে চিতা-১,২ (একত্রে)	৪৫/-
১৩৯-১৪০	মরণকামড়-১,২ (একত্রে)	৩৫/-
১৪১-১৪২	মরণখেলা-১,২ (একত্রে)	৪০/-
১৪৩-১৪৪	অপহরণ-১,২ (একত্রে)	৪১/-
১৪৫-১৪৬	আবার সেই দুঃস্বপ্ন-১,২ (একত্রে)	৩৩/-
১৪৭-১৪৮	বিপর্যয়-১,২ (একত্রে)	৪১/-
১৪৯-১৫০	শান্তিদূত-১,২ (একত্রে)	৪৩/-
১৫১-১৫২	শ্বেত সন্ত্রাস-১,২ (একত্রে)	৫০/-
১৫৮-১৬২	সময়সীমা মধ্যরাত+মাফিয়া	৪৬/-
১৫৯-১৬০	আবার উ সেন-১,২ (একত্রে)	৩৭/-
১৬২-১৬৫	কে কেন কিভাবে+কুচক্র	৪৭/-
১৬৩-১৬৪	মুক্ত বিহঙ্গ-১,২ (একত্রে)	৫৮/-
১৬৬-১৬৭	চাই সাম্রাজ্য-১,২ (একত্রে)	৬২/-
১৭২-১৭৩	জুয়াড়ী ১,২ (একত্রে)	৩৪/-
১৮০-১৮১	সত্যবাবা-১,২ (একত্রে)	৩৮/-
১৮২-১৮৩	যাত্রীরা হুঁশিয়ার+অপারেশন চিতা	৪৩/-
১৮৪-১৮৫	আক্রমণ '৮৯-১,২ (একত্রে)	৪১/-
১৮৮-১৮৯-১৯০	শ্বাপদ সংকুল-১,২,৩ (একত্রে)	৫৪/-
১৯১-১৯২	দংশন-১,২ (একত্রে)	৪২/-
১৯৫-১৯৬	ব্ল্যাক ম্যাজিক-১,২ (একত্রে)	৩৬/-
১৯৭-১৯৮	তিক্ত অবকাশ-১,২ (একত্রে)	৩৭/-
১৯৯-২০০	ডাবল এজেন্ট-১,২ (একত্রে)	৩৭/-
২০১-২০২	আমি সোহানা-১,২ (একত্রে)	৩৯/-
২০৩-২০৪	অগ্নিশপথ-১,২ (একত্রে)	৩৫/-
২০৫-২০৬-২০৭	জাপানী ফ্যানাটিক-১,২,৩ (একত্রে)	৫৩/-
২০৮-২০৯	সাক্ষাৎ শয়তান-১,২ (একত্রে)	৩৮/-
২১০-২১১	গুপ্তঘাতক-১,২ (একত্রে)	৩৯/-
২১২-২১৩-২১৪	নরপিশাচ-১,২,৩ (একত্রে)	৫৫/-
২১৭-২১৮	অন্ধশিকারী১,২ (একত্রে)	৩৭/-
২১৯-২২০	দুই নম্বর-১,২ (একত্রে)	৩৬/-
২২১-২২২	কৃষ্ণপক্ষ-১,২ (একত্রে)	৩৭/-
২২৩-২২৪	কালোছায়া-১,২ (একত্রে)	৩৯/-
২২৫-২২৬	নকল বিজ্ঞানী-১,২ (একত্রে)	৩৪/-
২২৭-২২৮	বড় ক্ষুধা-১,২ (একত্রে)	৩৮/-
২২৯-২৩০	স্বর্ণদ্বীপ-১,২ (একত্রে)	৪০/-
২৩১-২৩২-২৩৩	রক্তপিপাসা-১,২,৩ (একত্রে)	৪৮/-
২৩৪-২৩৫	অপচ্ছায়া-১,২ (একত্রে)	৩৬/-
২৩৬-২৩৭	ব্যর্থ মিশন-১,২ (একত্রে)	৩১/-
২৩৮-২৩৯	নীল দংশন-১,২ (একত্রে)	৩২/-
২৪০-২৪১	সাউদিয়া ১০৩-১,২ (একত্রে)	৩৪/-
২৪২-২৪৩-২৪৪	কালপুরুষ-১,২,৩ (একত্রে)	৪৮/-
২৪৫-২৪৬	নীল বজ্র ১,২ (একত্রে)	৩২/-
২৫৪-২৫৫	সবাই চলে গেছে ১,২ (একত্রে)	৩৮/-
২৫৬-২৫৭	অনন্ত যাত্রা ১,২ (একত্রে)	৩৯/-
২৬৩-২৬৪	হীরক সম্রাট ১,২-(একত্রে)	৪২/-
২৫৮-২৬৫	রক্তচোষা+সাত রাজার ধন	৪৩/-
২৬৯-২৮৫	বিগব্যাঙ+মাদকচক্র	৪৩/-
২৭০-২৭১	অপারেশন বসনিয়া+টার্গেট বাংলাদেশ	৩৮/-
২৭২-২৭৩	মহাপ্রলয়+যুদ্ধবাজ	৩৯/-
২৭৪-২৭৫	প্রিন্সেস হিয়া ১,২ (একত্রে)	৪৬/-
২৭৬-২৯১	মৃত্যু ফাঁদ+সীমালঙ্ঘন	৪৫/-
২৭৯-২৮২	মায়ান ট্রেজার+জন্মভূমি	৪৭/-
২৮০-২৮৯	ঝড়ের পূর্বাভাস+কালসাপ	৩৮/-
২৮১-২৭৭	আক্রান্ত দূতাবাস+শয়তানের ঘাঁটি	৪২/-
২৮৩-২৮৮	দুর্গম গিরি+তুরুপের তাস	৩৮/-
২৮৪-৩১২	মরণযাত্রা+সিক্রেট এজেন্ট	৪২/-
২৯২-২৯৮	রুদ্রঝড়+অগ্নিবাণ	৩৭/-
২৯৪-৩০৪	কর্কটের বিষ+সার্বিয়া চক্রান্ত	৪২/-
২৯৫-২৯৭	বোস্টন জ্বলছে+নরকের ঠিকানা	৩৩/-
২৯৬-৩০৬	শয়তানের দোসর+কিলার কোবরা	৪২/-
২৯৯-২৭৮	কুহেলি রাত+ধ্বংসের নকশা	৪৩/-
৩০০-৩০২	বিষাক্ত থাবা+মৃত্যুর হাতছানি	৪০/-
৩৩২-৩৩৩	টপ সিক্রেট ১,২ (একত্রে)	৩৯/-

টপ সিক্রেট-১

প্রথম প্রকাশঃ ২০০৩

এক

দেশটা ইংল্যান্ড, সময়টা সেপ্টেম্বর অর্থাৎ শরৎ-এর শুরু, প্রিয় বন্ধুকে পাশে নিয়ে সানিংডেল ক্লাবের নতুন গলফ কোর্সের কিনারা ধরে অলস পায়ে হাঁটছে মাসুদ রানা, রোদ ঝলমলে ইংলিশ বিকেলের শান্তিময় নিঝুম পরিবেশ দেহ-মনে ভাল লাগার একটা অনুভূতি ছড়িয়ে দিচ্ছে।

ক্লাব ভবনের মাথার ওপর গোটা আকাশে ভেসে বেড়াচ্ছে সাদা পাল তোলা নৌকার মত ছেঁড়া-ছেঁড়া মেঘ, তবে দিগন্তটাকে যেন ধীরে ধীরে মুড়ে দেয়া হচ্ছে সোনার পাত দিয়ে। নতুন গলফ কোর্সের চারপাশে গাছপালা তেমন ঘন নয়, বেলে মাটিতে বুনো ফুলে ছাওয়া প্রচুর ঝোপ দেখা যাচ্ছে। আজ নিয়ে সাত দিন হলো লন্ডন থেকে সারের এই ক্লাবে রোজই আসছে রানা, উদ্দেশ্য খোলা বাতাসে কিছুক্ষণ হাঁটাহাঁটি, সুইমিংপুলে সাঁতরানো, পিংপং খেলা বা তাস নিয়ে বসা—এক কথায় একঘেয়েমির নির্যাতনকে ফাঁকি দেওয়ার চেষ্টা।

এখানে পুরানো কিছু বন্ধু-বান্ধব আছে, উপরি পাওনা হিসেবে তাদের সঙ্গ জোটে। ক্লাব চত্বরের এক কোণে সিলেটি হোটেলঅলা কাইসুল গাজীর রেস্তোরাঁ 'আ মরি' থেকে বেরিয়ে আসা সরষে ইলিশের গন্ধ, গরম ফিরনিতে দেয়া পেস্তা-বাদামের সুবাস আর কাচ্চি বিরিয়ানির ঘ্রাণ ওকে নস্টালজিক করে তুললে দেশি পরিবেশে বসে ডিনারটাও সেরে নেয় কোন কোন দিন। এই ডিনার খাওয়ানোর কথা বলেই সারের এই নিরিবিলি ঘুম-ঘুম শান্ত প্রান্তে সোহেল আহমেদকে আজ টেনে নিয়ে এসেছে রানা; ব্যক্তিগত কিছু উদ্বেগ আর চিন্তাভাবনা নিয়ে কথা বলবে।

বাঁকা হয়ে নেমে আসছে শারদীয় রোদ। ছোট সারি তৈরি করা বঁইচি ঝোপ, আঙুরলতা আর সিলভার বার্চের মসৃণ কচি ডালে গুঞ্জন তুলছে পোকামাকড়। মাথার ওপর পাইন গাছের পাতা ঝমঝম বৃষ্টির মত শব্দ তুলল হঠাৎ লাগা বাতাসে দুলে ওঠায়।

আজ আর সুইমিংপুলের দিকে যেতে ভাল লাগছে না রানার। কল্পনার চোখে দেখতে পেল এরপর কী ঘটবে। ক্লাবে ঢুকে বন্ধু-বান্ধবের সঙ্গে 'হাই-হ্যালো' করবে। পিংপং খেলতে নেমে এক-হাতি সোহেলের দর্শনীয় কসরৎ সহকারে সার্ভ করা দেখে মুগ্ধ হবে। আ মরি-তে বসে ডিনার খেয়ে লং ড্রাইভে লন্ডনে ফেরবার পথে গাড্ডায় পড়া ঐরাবতের স্বাস্থ্য সম্পর্কে খোঁজ খবর নিয়ে নিজের ফ্ল্যাটে সাড়ে এগারোটার মধ্যে একাকী শয্যাগ্রহণ। কাল সকালে উঠে আবার রানা

এজেন্সির অফিসে বিকেল চারটে পর্যন্ত ফাইলে মুখ গুঁজে থাকা। এরপর কল্পনা আর এগোতে পারল না, উদ্বেগটা ফিরে এসে প্রশ্ন তুলল, এটা কি···ও কি ঠিক এরকম জীবনই চেয়েছিল?

হঠাৎ থামল সোহেল। 'আর কত হাঁটাবি? চল, খেতে বসবার আগে তোকে স্ম্যাশ করে খিদেটা বাড়িয়ে নিই।'

একটু হাসল রানা। সত্যি, টেবিল টেনিসে সোহেলের স্ম্যাশ ফিরিয়ে দেয়া অত্যন্ত কঠিন। তারপরই আবার নিজের চিন্তায় ফিরে এলো। একঘেয়েমি না হয় অভিশাপ, তবে আত্মতৃপ্তি তারচেয়েও খারাপ, গুরুতর অন্যায়। মধ্যম মানে সন্তুষ্ট থাকা। নিজের অজান্তে নরম হয়ে পড়া।

চোখে অস্বাভাবিক বড় আকৃতির সানগ্লাস থাকলেও, গলফ কোর্সের আরেক মাথা থেকে লম্বা ও সুঠাম কাঠামোর অধিকারী রানাকে চিনতে তার কোন অসুবিধে হলো না। সঙ্গীর দেখাদেখি হঠাৎ দাঁড়িয়ে পড়া, ঘোরা, তারপর দীর্ঘ পদক্ষেপে ক্লাব ভবনের দিকে ফেরা–সবই তার পরিচিত লাগল। লাগারই কথা, কারণ গত এক হপ্তা বাইরে কোথাও বেরুলেই রানাকে সারাক্ষণ চোখে চোখে রাখছে লোকটা। তবে কখনোই কাছ থেকে নয়। দূরত্ব বেশি হলে টেলিস্কোপ বা বিনকিউলার ব্যবহার করে। এই মুহূর্তে তার দৃষ্টিশক্তি জরুরী প্রয়োজনের খাতিরে আরও শাণিত হয়েছে।

শ্বেতাঙ্গদের দেশে আরও একজন সাদা চামড়ার লোক, হোক সে মার্কিন, খুব কম লোকেরই দৃষ্টি আকর্ষণ করে। করলেও তার কিছু আসে যায় না। সে জানে সানিংডেল ক্লাবে মেম্বার ছাড়া কেউ ঢুকতে পারে না। তার কাছে মেম্বারশিপ কার্ড নেই, তবে প্রমাণ করতে পারবে সদস্যপদের জন্য আবেদন করা হয়েছে। সেই আবেদন পত্রে সুপারিশকারীর একটা সই আছে। সইটা ব্রিটেনের বর্তমান প্রধানমন্ত্রী টনি ব্লেয়ারের প্রেস সেক্রেটারির। তবে না, রানা ও সোহেলের পিছু নিয়ে ক্লাব ভবনের সামনে চলে আসা লোকটাকে কেউ কোন প্রশ্ন বা চ্যালেঞ্জ করল না। আসলে কেউ সেভাবে তাকে লক্ষই করছে না। এর মধ্যে বিস্মিত হওয়ার কিছু নেই তার ট্রেনিংই ছিল এরকম–সবার মাঝখানে থেকে কারও দৃষ্টি আকর্ষণ না করা।

ক্লাব ভবনের বাইরে লোকজন হাঁটাহাঁটি করছে। শরতের সূর্য আরও অনেক দেরি করে ডুববে। তাকে দেখে মনে হলো, জানালার নিচে নতুন লাগানো গোলাপ চারাগুলো স্বাভাবিক আগ্রহ নিয়ে পরীক্ষা করছে একজন লোক, যার মাথায় এক রাশ সোনালি চুল। চারাগুলো অবশ্য বেশিক্ষণ তার মনোযোগ ধরে রাখতে পারল না, পাশের ফ্লাওয়ার-বেডের সামনে চলে এসে অক্সআই ডেইজি দেখছে–মাথাটা যেন সরু সরু হলুদ রশ্মির সমষ্টি, মাঝখানটা গাঢ় সোনালি। যতই চারা আর ফুল দেখবার ভান করুক, সানগ্লাসের ভেতর থেকে তার চোখের দৃষ্টি জানালা গলে ক্লাব ভবনে ঢুকে পড়েছে। রানার পিঠে চোখ, সঙ্গীর স্ম্যাশ ঠেকাতে গলদঘর্ম হচ্ছে বেচারা।

বাইরে লোকটা সম্পূর্ণ শান্ত। চেহারায় কোন উত্তেজনা বা আবেগের চিহ্নমাত্র নেই। ঝড়টা বইছে তার মাথার ভেতরে। এই অপারেশন-এর প্রস্তুতি, আগেও

তিনবার নেয়া হয়, প্রতিবার একেবারে শেষ মুহূর্তে স্থগিত করা হয়েছে। এই কাজের জন্য বেঁধে দেয়া সময়সীমা এত কম যে এরপরও অপারেশন স্থগিত করা হলে গোটা পরিকল্পনাটাই বাতিল করতে হবে। সেটা কোনভাবেই ঘটতে দেয়া যায় না। এখন, প্রায় শেষ মুহূর্তে, যেভাবেই হোক অপারেশন শুরু করতে হবে তাকে। এর সঙ্গে ব্যক্তিগত বা পেশাগত কোন অহঙ্কার জড়িত নয়। জড়িত চলতি বিশ্ব-ব্যবস্থায় ইঙ্গ-মার্কিন একচ্ছত্র কর্তৃত্ব টিকিয়ে রাখবার প্রশ্ন। এই সাফল্য অর্জন করতে হলে রোমহর্ষক হিসেবে ইতিহাসে ঠাঁই পাবে এমন একটা অপরাধ ঘটাতে হবে। কোন সন্দেহ নেই যে চমকে উঠবে পৃথিবীর মানুষ! মিস্টার ব্লেয়ারকে এক হাজার কোটি ধন্যবাদ, তাঁর দেয়া প্ল্যান ধরে কাজটা করতে পারলে ইঙ্গ-মার্কিন পক্ষকে দায়ী করবার কোন সুযোগই কারও থাকবে না।

সূর্য সাদা মেঘের আড়ালে পড়ল। হঠাৎ ছুটে আসা দমকা বাতাসে ঠাণ্ডা লাগল তার, হাত দুটো শরীরের সঙ্গে সেঁটে এলো। মাত্র এক মুহূর্ত পর আবার নিজেকে শিথিল করে নিল সে। ঝড়টা মাথার ভেতর এখনও থামেনি। সে তার টাইম ও ডেট শেডিউল বিবেচনা করছে। তারিখ ও সময়, দুটোই খুব টাইট–আঁটসাঁট; তবে সময়ের হিসেবে আধ ঘণ্টা পিছিয়ে আছে সে। ঠিক সে নয়, পিছিয়ে আছে ঘটনাগুলো। পিংপং খেলা শেষ করে তার হিসেব করা সময়েই ডিনার খেতে বসেছে মাসুদ রানা, কিন্তু আজ সঙ্গে নতুন এক বন্ধু থাকায় এমন গল্প জুড়ে দিয়েছে যে টেবিল ছেড়ে ওঠার নাম নেই।

তবে লোকটার ভাগ্যই বলতে হবে, মাত্র আধ ঘণ্টা পিছিয়ে থেকে কার পার্কিং-এ পৌঁছাল মাসুদ রানা। সময়ের এই হিসাবটা হাতঘড়ির দিকে একবারও না তাকিয়ে নিখুঁতভাবে করতে পারল সে, প্রায় সেকেন্ডের কাঁটা ধরে। ওরা দুই বন্ধু একটা ফরাসী সিত্রোঁতে চড়ল। ঘড়ির কাঁটায় সাতটার বেশি বাজলেও সূর্য ডুবতে এখনও দেরি আছে।

এরপর নীরবতা। তবে এই নীরবতার ভেতরও দূর থেকে ভেসে আসা কিছু কণ্ঠস্বর কানে পশে। রাস্তা দিয়ে ছুটে গেল একটা ভারী ট্রাক, বহুদূর আকাশের কোণে একটা জেট ফাইটার, কোথাও একটা ঘড়ি ঢং-ঢং করে সময় জানাচ্ছে।

সিত্রোঁর অনেক পিছনে রয়েছে তার কালো মার্সিডিজ। নীলচে চোখে তীক্ষ্ণ দৃষ্টি।

'তোর কি মনে হয়, আমার···কি বলব···ধার কমে যাচ্ছে?' গাড়িতে বসে সোহলকে জিজ্ঞেস করল রানা।

অন্ধকারেও ঝকঝঁকে দাঁত দেখা গেল, হাসছে সোহেল। 'সবগুলো গেম হারার দুঃখ এখনও ভুলতে পারছিস না?'

'তা না, বলতে চাইছি···শোন, তা হলে সব কথা খুলেই বলতে হয়। যেমন ধর, আমি একজন বেকার লোক। তুই-ই বল, এ-বছর ক'টা অ্যাসাইনমেন্টে গেছি? তার মধ্যে সার্বিয়ার অ্যাসাইনমেন্টটা তো পুরোপুরি ব্যর্থ···'

রানাকে বেলগ্রেডে পাঠানো হয়েছিল ধরা পড়বার সমূহ আশঙ্কা আছে এরকম একজন বিসিআই এজেন্টকে সার্বিয়া থেকে বের করে আনবার জন্য। লোকটা

স্থানীয় মুসলমান, রানা পৌঁছানোর আগেই সার্ব সিক্রেট পুলিসের হাত থেকে নিজেকে বাঁচানো যাবে না বুঝতে পেরে সে আত্মহত্যা করে।

'আরেকজনের ব্যর্থতার জন্যে নিজেকে তুই দায়ী করতে পারিস না,' রানাকে থামিয়ে দিয়ে বলল সোহেল।

'না।' স্টিয়ারিং হুইলটা দু'হাতে চেপে ধরল রানা। 'কিন্তু আমাকে যেটা উদ্বিগ্ন করে তুলছে, চ্যালেঞ্জটা গ্রহণ করতে না হওয়ায় আমি যেন একটু স্বস্তি বোধ করেছি।' মাথা নাড়ল। 'কোথাও কিছু একটা গোলমাল আছে।'

'সেটা শারীরিক নয়, আর যাই হোক। এত ভাল শেপ-এ বহু বছর দেখিনি তোকে।'

ডিনার শেষে এক-দু'জন করে অনেকেই কার পার্কিং-এ এসে পরস্পরের কাছ থেকে বিদায় নিচ্ছে। তারা কেউ ব্যবসায়ী, কেউ পেশাজীবী–শান্ত প্রকৃতির ভালমানুষ, জীবনে কখনও হিংস্র আচরণ বা বিশ্বাসভঙ্গের ঘটনা ঘটায়নি। মানুষ হিসেবে এদের সবাই প্রশংসা পাওয়ার যোগ্য; কিন্তু নিজেকে তাদের সঙ্গে আলাদা না করতে পারার ব্যর্থতা হঠাৎ প্রায় বিদ্রোহের একটা ভাব এনে দিল মনে। 'ব্যাপারটা অনেকটা এরকম–মানুষ হিসেবে ভয়ঙ্কর হতে পারাটা এখন আর যেন সম্ভব নয়,' বলল রানা, রীতিমত চিন্তিত। 'আমি যেন অভ্যাসের একটা দাসে পরিণত হয়েছি। এক হপ্তা পার হতে চলেছে, রোজ এখানে আসছি, প্রায় একই সময়ে; দুই কি তিনজন নির্দিষ্ট বন্ধুর সঙ্গে খেলছি, সাঁতরাচ্ছি বা হাঁটছি, ফ্ল্যাটে ফিরছি প্রায় ঘড়ির কাঁটা ধরে, তার আগে রিজেন্সী ম্যানর-হাউসে গিয়ে বসের খোঁজ-খবর নিচ্ছি। এত সব রুটিন ধরে করছি অথচ কোন ভুল আমার চোখে ধরা পড়ছে না–অন্তত একটা সময় পর্যন্ত পড়েনি। আমার এই পেশায় বুদ্ধিমান কোন লোক এভাবে নির্দিষ্ট সময়সূচি অনুসরণ করবে না। তুই সেটা ভালই বুঝিস।'

এ তো সবাই জানে যে কোন অ্যাসাইনমেন্টে কাজ করবার সময় একজন এসপিওনাজ এজেন্টের চলাফেরায় কোন ছক তৈরি হওয়া উচিত নয়, শত্রুপক্ষ যাতে বুঝতে পারে কখন কোথায় থাকবে সে। সেটাই বলল সোহেল, 'তুই তো এখন কোন অ্যাসাইনমেন্টে নেই।'

'টুকরো টুকরো নয়, গোটা ছবিটা দেখতে বলছি। আমার অস্তিত্ব যেন একটা ছকে বাঁধা পড়ে যাচ্ছে। এটা ভেঙে বেরিয়ে আসবার একটা পথ আমাকে পেতেই হবে।'

'আমার অভিজ্ঞতা বলে, এর জন্যে এক ধরনের ঝাঁকি দরকার হয়, যেটা জীবনকে নতুন করে সাজিয়ে দেবে–তবে ব্যাপারটা সময় হলে আপনা থেকেই ঘটে। ভেবে-চিন্তে, চেষ্টা করে কিছু করবার দরকার হয় না।'

'নিয়তি বা অন্য কিছু?'

কাঁধ ঝাঁকাল সোহেল। 'যা খুশি বলতে পারিস।'

কয়েক মুহূর্তের জন্য গাড়ির ভেতর অদ্ভুত একটা নীরবতা নেমে এলো। তারপর স্টার্ট দিল রানা।

সোহেল বলল, 'বসকে দেখতে যেতে আজ তোর দেরি হয়ে যাবে।'

রানার মুখে অপরাধীর হাসি। 'এক ঘণ্টা দেরি করে গেলে উপদেশ আর

ধমক কিছু কম শুনতে হবে। তুইও আমার সঙ্গে চল না, তা হলে দুজনে ভাগ করে নেয়া…'

করজোড়ে মাফ চাইল সোহেল। 'আমার ভাগেরটা আমি রোজকার মত সকাল বেলা গিয়ে নিয়ে এসেছি। দুঃখিত, দোস্ত, তোরটা তোকেই মাথা পেতে নিতে হবে।' একটা কৃত্রিম দীর্ঘশ্বাস ফেলল সে। 'বুড়োর ভাবটা যেন সবকিছু আমরা ভুলে গেছি, তাই বাধ্য হয়ে এসপিওনাজের অ-আ-ক-খ নতুন করে শেখাতে হচ্ছে। উফ!'

সোহেলের বর্ণনায় আদি ও অকৃত্রিম একজন নিষ্ঠাবান শিক্ষকের প্রকৃত চেহারা দেখতে পেয়ে হেসে উঠল রানা। তবে কথা বলবার সময় যথেষ্ট সিরিয়াস মনে হলো ওকে। 'এটাই স্বাভাবিক। রোগবালাই একজন সেনাপতির দু-চোখের বিষ।'

গত শীতে খুবই কষ্টদায়ক একটা কাশি দেখা দেয় বিসিআই চীফ মেজর জেনারেল (অবসরপ্রাপ্ত) রাহাত খানের। অনেকে অনেকভাবে বলা সত্ত্বেও এ-ব্যাপারে চিকিৎসা করতে রাজি করানো যায়নি তাঁকে, সবাইকে বরং অভয়দানের সুরে তিনিই জানিয়েছেন, শীত কমে গেলে কাশিটাও চলে যাবে। বসন্ত ও গ্রীষ্মে গরম পড়ল, বৃষ্টি হলো, কিন্তু তাঁর খক্‌খকানির সঙ্গে কষ্টটা আরও বাড়ল বৈ কমল না। জুলাইয়ের এক সকালে এক গাদা টেলেক্স মেসেজ আর ই-মেইল নিয়ে প্রাইভেট সেক্রেটারি ইলোরা চেম্বারে ঢুকে দেখে বস্‌ রিভলভিং চেয়ারে নেতিয়ে পড়েছেন, শ্বাস নিতে ভয়ানক কষ্ট হচ্ছে। সঙ্গে সঙ্গে প্রথমে রানাকে, তারপর ডাক্তারকে খবর দেয় ইলোরা। ডাক্তারের কঠোর মনোভাব টের পেয়ে, সবার সামনে হেনস্তা হওয়ার ভয়ে সেদিন থেকেই চিকিৎসা শুরু করতে রাজি হন তিনি। ব্লাড টেস্ট, এক্স-রে ইত্যাদি করে দেখা যায় তাঁর ফুসফুসের অবস্থা বিশেষ ভাল নয়। মেডিকেল বোর্ড সিদ্ধান্ত দিল, চলতি শরতে চিকিৎসাটা হতে হবে লন্ডনের আশপাশে কোথাও, কারণ এ-সময়টা ফুসফুসের জন্য আদর্শ আবহাওয়া ওখানেই পাওয়া যাবে।

রাহাত খানকে লন্ডনে নিয়ে এলো রানা, সোহেল এখানে আগে থেকেই ছিল। লন্ডনের উইন্ডসোর হসপিটালে ভর্তি করা হয় বিসিআই চীফকে। প্রথম দিনই ব্রিটিশ সিক্রেট সার্ভিসের প্রধান মারভিন লংফেলো দেখতে এলেন। কিন্তু ডাক্তারদের নিষেধ থাকায় দু'মিনিটের বেশি কেবিনে থাকতে পারেননি। এখানে নতুন করে আবার সব টেস্ট করা হলো। রিপোর্টে বলা হলো—ব্রঙ্কিয়াল কানজেশচান; আরোগ্য লাভের উপায়—এক মাস কমপ্লিট বেড রেস্ট, কিছু ওষুধ, কিছু পথ্য, কিছু বিধি-নিষেধ মেনে চলা, আর আবহাওয়ার পরিবর্তন। বুদ্ধি করে বসের গুলশানের বাড়ি থেকে, বহুদিনের পুরানো ব্যাটম্যান (অব.) খাদেম আলি আর তার বউ শান্তা আলিকে লন্ডনে নিয়ে এসেছিল রানা, ফলে বুড়োর নিরাপত্তা আর মেজাজ-মরজি বুঝে সেবা-শুশ্রূষার ব্যাপারে অতিরিক্ত কোন ঝামেলায় পড়তে হলো না।

এখানে খাদেম আর তার স্ত্রী শান্তা সম্পর্কে কিছু বলা দরকার। ওরা দু'জন ফুফাতো-মামাতো ভাই-বোন, স্বাধীনতা যুদ্ধের সময় ষোলো বছরের কিশোর আর

বারো বছরের বালিকা ছিল। খাদেম মাঠে মাঠে গরু-ছাগল চরাত, জীবনে কখনও স্কুলে যায়নি; শান্তার দিন কাটত পুকুর পাড় থেকে শাক তুলে আর শুকনো পাতা কুড়িয়ে। যুদ্ধের শুরুতেই গ্রামে এলো পাকিস্তানী মিলিটারি। কোন কারণ নেই, যাকে সামনে পেল তাকেই ধরল ওরা, এক লাইনে দাঁড় করিয়ে ব্রাশ ফায়ার করে মেরে ফেলল। তাদের মধ্যে ওদের দু'জনের মা-বাবা ও আত্মীয়-স্বজনরাও ছিল। দৃশ্যটা শান্তাকে দেখতে দেয়নি খাদেম। ঝোপের ভেতর লুকিয়ে বসেছিল ওরা, শান্তার চোখে হাত চাপা দিয়ে রেখেছিল সে। মিলিটারিরা চলে যাওয়ার পর গ্রাম ত্যাগ করল ওরাও, সীমান্ত পেরিয়ে চলে এলো ভারতে। বয়স বাধা হয়ে দাঁড়ালেও, যুদ্ধ করবার ট্রেনিং নিতে খাদেম আর শান্তাকে ক্ষান্ত করা যায়নি। কোন ট্রেনিং ক্যাম্পে যখন সুবিধে করা গেল না, দু'জনে যুক্তি করে তখন একটা গেরিলা দলের সঙ্গে ভিড়ে গেল। তাদের ফাই-ফরমাশ খাটত, জিনিস-পত্র বইত, স্কাউট হিসেবে দেখে আসত পাকিস্তানী সৈন্য বা রাজাকাররা কোথায় থাকে, কোথায় যায়। এভাবেই শুরু। তারপর সুযোগ বুঝে হাতে অস্ত্র তুলে নেয়া। কীভাবে ট্রিগার টানতে হয় শেখা। লক্ষ্যস্থির করা। লোড করা। তারপর জানোয়ার হত্যা। রক্তাক্ত প্রতিশোধ।

স্বাধীনতার কদিন পর। রাইফেলের ভারে প্রায় কুঁজো হয়ে যাচ্ছে শরীর, এক কিশোর আর এক বালিকা গেরিলা যোদ্ধা জীবনে প্রথম ঢাকা শহরে পা দিয়ে একটুর জন্য একটা জীপের তলায় পড়তে পড়তে বেঁচে গেল। সেই জীপটা চালাচ্ছিলেন মেজর জেনারেল রাহাত খান। ড্রাইভিং সিট থেকে নেমে এসে ওদেরকে দেখলেন তিনি। দু'চারটে প্রশ্ন করেই সব বুঝতে পারলেন—আপনজন বলতে কেউ নেই ওদের, মাথা গোঁজার ঠাঁইও বলতে গেলে না থাকবার মত। কী ভেবে তিনি ওদেরকে জীপে তুলে নিলেন।

বিসিআই ট্রেনিং সেন্টারে অনেক উন্নতমানের প্রশিক্ষণ পেয়েছে ওরা, ধীরে ধীরে সিকিউরিটি গার্ড হিসেবে দক্ষতা অর্জন করেছে। এর জন্য দু'জনকেই প্রচণ্ড খাটতে হয়েছে। দিনের বেলা চলত কঠোর ট্রেনিং, গভীর রাত পর্যন্ত প্রাইভেট টিউটরের কাছে শিখতে হত লেখাপড়া। দেখতে দেখতে কয়েক বছর পার হলো। ট্রেনিং শেষ হয়েছে ওদের, এবার চাকরি হবে। কিন্তু রাহাত খানকে বিস্মিত করে ওরা দু'জন জানাল, তাঁকে ছেড়ে কোথাও ওরা যাবে না। চাকরি যদি করতেই হয়, চিরকুমার বুড়ো সার-এর রান্নাবান্না আর সেবা-যত্ন করবার চাকরিটাই তাদের দরকার।

সেই থেকে রাহাত খানের ধানমণ্ডির বাড়িতে রয়ে গেছে ওরা। রাহাত খান সময় মত ওদের বিয়ে দিয়েছেন। বিদেশে কোন কাজে বা বেড়াতে এলে, সম্ভব হলে ওদেরকেও তিনি নিয়ে আসেন। তবে দুঃখের বিষয় হলো, আজও এদের কোন সন্তান হয়নি।

লন্ডনের বাইরে কোয়ার্টারডেক, এই রিজেন্সি ম্যানারহাউসটা অনেক বছর আগে নিলামে কিনেছিলেন রাহাত খান। এটা তাঁর একটা দুর্লভ কানেকশনই বলা যেতে পারে। বিশাল এস্টেটসহ এ-ধরনের বাড়িগুলো তৈরি করা হয় আঠারোশো এগারো থেকে বিশ সালের মধ্যে। জর্জ, প্রিন্স অভ ওয়েলস, এই সময়টা রিজেন্ট

হিসেবে ব্রিটেনে দায়িত্ব পালন করেন। ওই সময়কার কোন বাড়ি বা এমনকি এক সেট ফার্নিচারের মালিক হতে পারাটাও আভিজাত্য অর্জন বলে মনে করা হয়।

গোটা এস্টেট ঘুরে দেখে খাদেম আর শান্তা জানাল, শ্বেতাঙ্গ-কৃষ্ণাঙ্গ সব ক'জন কর্মচারীকে সাময়িক ছুটি দেয়াটাই নিরাপত্তার দিক থেকে ভাল হবে। রাহাত খান তাদের এই পারামর্শ মেনে নিয়েছেন।

উইন্ডসোর পার্কের কিনারায়, কোয়ার্টারডেক-এ, মাত্র এক হপ্তা হলো বসবাস করছেন রাহাত খান; তাঁর ব্রঙ্কিয়াল কানজেশচান এরইমধ্যে বেশিরভাগ সেরে গেছে, কিন্তু খিটখিটে মেজাজটা স্বাভাবিক হতে প্রয়োজনের চেয়ে যেন সময় নিচ্ছে অনেক বেশি—সানিংডেল থেকে প্রতি সন্ধ্যায় নিজের ফ্ল্যাটে ফেরবার পথে কোয়ার্টারডেকে থামতে হওয়ায় সেটার আঁচ ভালই টের পাচ্ছে রানা।

তবে বাগে পেয়ে ও-ও ছাড়ছে না। ডাক্তাররা যে-সব নির্দেশ দিয়েছেন সেগুলো ঠিকমত পালিত হচ্ছে কিনা তা খুঁটিয়ে পরীক্ষা করবার দায়িত্বটা স্বেচ্ছায় নিজের কাঁধে তুলে নিয়েছে ও। বসের বেডরূমে ঢোকার আগেই খাদেম দম্পতির কাছ থেকে একটা রিপোর্ট পায়। বুড়ো আজ ঠিকমত খাওয়াদাওয়া সেরেছেন তো? ঘুমোবার সময় বই বা পত্রিকা নিয়ে বসেছিলেন? সময়মত ওষুধ খেয়েছেন? চুরুট বা পাইপ ধরাননি তো? রিপোর্ট পাওয়ার পর এক গাদা অভিযোগ নিয়ে বসের বেডরূমে ঢোকে রানা। ওর অস্ত্র হলো ভয় দেখানো—'ডাক্তারদের জানাতে হবে।' কী জানাতে হবে? এই যেমন, আপনি চুরুট না খেয়ে থাকতে পারছেন না, দিবা নিদ্রা বাধ্যতামূলক হওয়া সত্ত্বেও চোখে ঘুম নেই ইত্যাদি। কিন্তু রাহাত খান ওকে বলতে গেলে কোন সুযোগই দেন না। 'অমুক অ্যাসাইনমেন্টে তুমি খুব ভাল করেছিলে,' এভাবে শুরু করেন তিনি, ঠাণ্ডা ও মিষ্টি রসে প্রথমে সিক্ত করে নেন রানার মনটাকে, তারপর হালকা সুরে এক এক করে ধরতে থাকেন ভুলগুলো, কিংবা গড় গড় করে বলতে শুরু করেন কী করলে ক্ষতির পরিমাণ আরও কমানো যেত।

সিত্রোঁ ছাড়ল রানা, সানিংডেল ক্লাবের কার পার্ক থেকে বেরিয়ে রাস্তায় পড়ল। 'সত্যি কোয়ার্টারডেকে নামবি না তুই?'

'না রে।' হাতঘড়ির ওপর চোখ বুলাল সোহেল। 'তুই আমাকে রেল স্টেশনের সামনে ছেড়ে দে, ট্রেন ধরে আমি কেন্ট থেকে ঘুরে আসি।'

'কেন, কেন্টে কী?'

'তোর নামে এজেন্সি, অথচ দায়-দায়িত্ব সব আমার ঘাড়ে চেপে বসছে,' কৃত্রিম ক্ষোভের সুরে বলল সোহেল। 'কেন্ট শাখার বিরুদ্ধে অভিযোগ করছে স্কটল্যান্ড ইয়ার্ড, ওরা নাকি পুলিসের কাজে ব্যাঘাত সৃষ্টি করছে। আসলে কী ঘটছে দেখা দরকার। ওরা জানে আজ রাতে আসছি আমি।'

'যা, বেঁচে গেলি। ভাবছিলাম ঘাড় ধরে বসের সামনে নিয়ে গিয়ে দাঁড় করাব, বলব, সার, আপনার নামে দুনিয়ার নিন্দা করে বেড়াচ্ছে, কানটা ধরে একটু মুচড়ে দেন।'

'আগে তোর কান মোচড়াবেন,' হেসে উঠে বলল সোহেল। 'কারণ সকাল বেলা তোর সম্পর্কে ঠিক এই কথাই বসকে বলে এসেছি আমি।'

পনেরো মিনিট পর সোহেলকে রেল স্টেশনে নামিয়ে দিয়ে সিত্রোঁর লম্বা বনেট ঘুরিয়ে এ-থারটি থেকে বেরিয়ে এলো রানা। ওর সামনে এখন ধীর-স্থির দশ মিনিটের জার্নি, আঁকাবাঁকা হলেও দু'পাশে বনভূমি থাকায় এই রাস্তায় গাড়ি চালাবার মজাই আলাদা, তারপর পৌঁছে যাবে কোয়ার্টারডেকে।

রানা যখন চৌরাস্তায় গাড়ি থামিয়ে সোহেলকে রেল স্টেশনে নামিয়ে দিচ্ছে, সিত্রোঁকে দূর থেকে পাশ কাটিয়ে সামনে চলে এসেছে কালো মার্সিডিজটা। এই মার্সিডিজ কার পার্ক থেকে চুরি করা। সোনালি-চুল ড্রাইভার একটা বাঁক থেকে পঞ্চাশ গজ দূরে ঘন ঝোপের আড়ালে গাড়ি দাঁড় করিয়েছে। এই মুহূর্তে হিটাচি ট্র্যান্সসিভার-এ একটা মাত্র শব্দ উচ্চারণ করল সে। সাড়ে চার মাইল দূরে আরেক লোক মেসেজটা রিসিভ করল, সে-ও মেসেজ প্রাপ্তির স্বীকৃতি দিল মাত্র একটা শব্দ উচ্চারণ করে। দ্বিতীয় লোকটা নিজের সেট অফ করে ঘন জঙ্গল থেকে বেরিয়ে এলো দুই সঙ্গীকে নিয়ে। দু'ঘণ্টার বেশি হবে ওখানে শুয়ে অপেক্ষায় আছে তারা।

সোনালি চুল চুরি করা মার্সিডিজে আরও এক মিনিট বসে থাকল। অকারণে নড়াচড়া করা তার স্বভাব নয়, এমন কি এখনকার মত চরম উত্তেজনার মুহূর্তেও না। সময়সূচির হিসেবে, অপারেশন শুরুর মুহূর্তটি পঞ্চাশ মিনিট আগেই পার হয়ে গেছে। অর্থাৎ বড় রকমের আর কোন দেরি হওয়া চলবে না, হলে মারাত্মক একটা বিপর্যয় ঘটে যাবে, কারণ এইমাত্র যে রেডিও সিগন্যালটা সে পাঠিয়েছে সেটা পরিবর্তনের কোন উপায় নেই। সিগন্যালটা পাওয়ার পর-পরই একদল লোক ভয়ানক সব কাণ্ড ঘটাতে শুরু করে দেবে। তবে না, দেরি হওয়ার কোন কারণ নেই।

ষাট সেকেন্ড পর ঝোপের আড়াল থেকে বেরিয়ে সিত্রোঁর পিছু নিল মার্সিডিজ। সতর্ক গবেষণার ফলে জানা আছে এরইমধ্যে পরবর্তী বাঁক ঘুরতে শুরু করেছে সিত্রোঁ, অনুসরণরত মার্সিডিজকে রানা দেখতে পাবে না।

কাউন্টি সীমান্ত পেরিয়ে বার্কশায়ার-এ ঢুকল রানা। আধুনিকতার নামে ইস্পাত আর কাঁচ দিয়ে তৈরি আকাশ ছোঁয়া জঙ্গল, প্রতিটি ছাদে নানান আকৃতির ডিশ অ্যান্টেনা, ফুল-ফলের ছাদ-বাগান ইত্যাদি দেখতে দেখতে A329 পার হয়ে এলো। পাইনবনের মাঝখানে রাস্তা এখন অল্প ঢালু। খানিক পর বাঁয়ে খোলামেলা সবুজ শ্যামল ফার্মল্যান্ড, তবে ডানে এখনও দাপটের সঙ্গে ঘন বনভূমি বিশাল জায়গা দখল করে রেখেছে। ইংল্যান্ড একসময় কেমন ছিল, এ-ধরনের জায়গাগুলো তার স্মৃতিচিহ্ন হিসেবে টিকে আছে আজও। যেন এই ধারণার অসারতা প্রমাণ করবার জন্যই লন্ডন এয়ারপোর্ট থেকে সদ্য টেক-অফ করা ব্রিটিশ এয়ারওয়েজের একটা বোয়িং রানার চোখের সামনে উদয় হলো। এক দল ট্যুরিস্ট হয়তো স্পেনে ছুটি কাটাতে যাচ্ছে। যাচ্ছে যাক, তোমার কী! এ-সব ভুলে বুদ্ধি বের করো বুড়োকে কীভাবে হাসিখুশি রাখা যায়। জরুরী আরও একটা কাজ আছে। কাল থেকে দৈনন্দিন ছকে পরিবর্তন আনতে হবে।

এ-সব চিন্তা অন্যান্য জরুরী কাজের ফাঁকেই রানার মাথায় খেলছে—এই যেমন সতর্কতার সঙ্গে গাড়ি চালানো, মাঝেমধ্যে রিয়ার-ভিউ মিররে তাকানো। তবে ভিউ-মিররে একবারও কালো মার্সিডিজটাকে দেখা গেল না। দেখা গেলেও

রানা বিশেষ মনোযোগ দিত বলে মনে হয় না। গাড়িটা আগে কখনও দেখেনি ও। মুখোমুখি এনে দাঁড় করানো হলে লোকটাকে চিনতেও পারবে না। এক হপ্তা ধরে অনুসরণ ও নজরদারি চললেও, অস্বাভাবিক বা বেমানান কিছু রানার চোখে পড়েনি। গোটা ইংল্যান্ড না হলেও, অন্তত লন্ডন ওর জন্য অনেকটা হোম গ্রাউন্ড-এর মতই। শুধু ব্রিটিশ পাসপোর্ট থাকাটাই কারণ নয়, ব্রিটিশ সিক্রেট সার্ভিসের ও একজন অনারারি উপদেষ্টাও বটে। তা ছাড়া, ওর হাতে এই মুহূর্তে কোন অ্যাসাইনমেন্ট নেই। এ-সব কারণে রানা যথেষ্ট সতর্ক হওয়ার প্রয়োজন বোধ করেনি।

যে-লোক নিয়মিত কোথাও যায় তার ওপর নজর রাখা খুব সহজ। সেজন্যেই কিং'স রোডে রানার ফ্ল্যাটে নজর রাখবার কোন ব্যবস্থা করা হয়নি, ওখান থেকে রোজ সকালে রিজেন্ট পার্ক এলাকায় রানা এজেন্সির শাখা অফিসে আসার সময় ওকে ফলোও করা হয় না।

উইন্ডসর-ব্যাগশট রোডে চলে এলো সিত্রোঁ। খানিক পর ডান দিকে পড়ল কোয়ার্টারডেকে ঢোকার পাথুরে গেটওয়ে। কাঁকর ছড়ানো রাস্তাটা বেশি লম্বা নয়। সাদামাঠা চারকোনা একটা বাড়ি, পুরোটাই পাথরের। ধূসর-সবুজাভ রঙটা কালের সাক্ষী যেন, শেষ বিকেলের রোদে উদ্ভাসিত; বাড়ির তিন পাশে ছায়া ফেলেছে গায়ে গায়ে ঘেঁষা পাইন, বীচ, সিলভার বার্চ আর তরুণ ওক। প্রাচীন একটা লতানো গাছ, উইসটিরিয়া, ফ্যাকাসে বেগুনি আর সাদা ফুল নিয়ে কষ্টেসৃষ্টে এঁকেবেঁকে দোতলা পর্যন্ত পৌঁছেও থামেনি, রাহাত খানের বেডরূম সংলগ্ন ব্যালকনি ছুঁয়ে চেষ্টা করছে আরও কতদূর ওঠা যায়। ব্যালকনির সঙ্গে জানালাগুলো খোলা। সিত্রোঁর দরজা বন্ধ করে নিচু পোর্টিকোর দিকে এগোবার সময় রানার যেন মনে হলো ওই জানালাগুলোর পিছনে কিছু একটা নড়ল। সন্দেহ নেই খাদেম আলির বউ শান্তা বিছানা ঠিকঠাক করছে।

ঝুলন্ত তামার ঘণ্টা ঢং-ঢং করে বেজে উঠল। আবার জমাট বাঁধল নিস্তব্ধতা, মৃদু বাতাসে খসখস করছে শুধু গাছগুলোর কিছু পাতা। কল্পনার চোখে রানা দেখতে পাচ্ছে শান্তা এখনও দোতলায় ব্যস্ত, আর খাদেম কিচেনে ঢুকেছে মনিবের জন্য আজকের মত শেষ এক কাপ কফি বানাতে। সূর্য ওঠা ও অস্ত যাওয়ার মাঝখানে কোয়ার্টারডেকের সদর দরজা কখনোই বন্ধ করা হয় না। রানার ছোঁয়ায় সঙ্গে-সঙ্গে খুলে গেল সেটা।

প্রতিটি বাড়ির ভেতর নিজস্ব কিছু শব্দ আছে সাধারণত যা শোনা যায় না, মিশে থাকে দূর থেকে ভেসে আসা কণ্ঠস্বরে, পদশব্দে, রান্নাঘরে তৈরি নানারকম আওয়াজের সঙ্গে। চৌকাঠ তখনও ভাল করে পেরোয়নি, এই সময় ট্রেনিং পাওয়া ষষ্ঠ ইন্দ্রিয় সাবধান করে দিল রানাকে। গোটা বাড়ি গাঢ় গভীর নিস্তব্ধতার ভেতর ডুবে আছে। সমস্ত পেশী হঠাৎ টান-টান, স্টাডিরূমের নিরেট স্প্যানিশ মেহগনি দরজাটা ঠেলে খুলল ও। সাধারণত এখানেই লোকজনের সঙ্গে দেখা-সাক্ষাৎ করেন রাহাত খান।

শূন্য কামরা যেন হাঁ করে তাকিয়ে আছে ওর দিকে। ঘরের প্রতিটি জিনিস জায়গা মতই সাজানো। জলরঙ পেইন্টিংগুলো জানালার উল্টোদিকে টেবিলে

রাখা। দেয়ালে খুব বড় একটা ফটোগ্রাফ—কেন্দ্রীয় শহীদ মিনারের।

রানাকে দেখা, শোনা ও চিন্তা করবার সময় দেয়া হলো না। হল-এর ওদিকে ডাইনিংরূমে যাওয়ার দরজাটা আধ খোলা ছিল, হঠাৎ সেটা খুলে ভেতরে ঢুকল এক লোক। দাঁড়াল সিঁড়ির কাছে। হাতে লম্বা ব্যারেলঅলা পিস্তল, তাক করল রানার হাঁটুতে। কাঠ-কাঠ গলায়, স্পষ্ট করে বলল, 'ওখানেই দাঁড়াও, রানা। সাবধান, হঠাৎ নড়ে উঠো না। গুলি বেরিয়ে যাবে।'

দুই

কর্মজীবনে এরকম বহুবার পিস্তলের মুখে দাঁড়িয়ে হুমকি শুনতে হয়েছে রানাকে। প্রতিপক্ষ অচেনা হলে প্রথম করণীয় হলো কৌশলে যতটা পারা যায় সময় আদায় করা, তারপর তাৎক্ষণিকভাবে পাওয়া তথ্য বিশ্লেষণ।

শত্রুর উদ্দেশ্য কী, বস্ ও আলি দম্পতির কপালে কী ঘটেছে, এ-সব নিয়ে মাথা ঘামিয়ে আপাতত কোন লাভ নেই। তার বদলে লোকটার হাতের অস্ত্রের দিকে মন দিল ও। দেখেই চেনা যাচ্ছে—সাইলেন্সার লাগানো একটা নাইন-এমএম ল্যুগার। এই ক্যালিবারের একটা বুলেটের ওজন প্রায় আধ আউন্স, শব্দের গতিতে ছোটে। এই দূরত্ব থেকে ওকে যদি লাগে, শুধু পায়ে হলেও, ধাক্কা দিয়ে মেঝেতে ফেলে দেবে, সম্ভবত চৈতন্যও কেড়ে নেবে। এই মুহূর্তে যেখানে পিস্তলটা তাক করা, ওখানে লাগলে প্রায় নিশ্চিতভাবে ধরে নেয়া চলে যে জীবনে কখনও আর নিজের পায়ে হাঁটতে পারবে না ও। মানে দাঁড়াল, ওটা প্রফেশনাল-এর হাতে একটা প্রফেশনাল অস্ত্র।

চোয়ালের হাড় উঁচু, লম্বা মুখ লোকটার; হালকা কাপড়ের গাঢ় নীল সুট পরে আছে, জুতো জোড়ায় চকচকে পালিশ। বিজ্ঞাপনী সংস্থা বা টিভি চ্যানেলের জুনিয়র এক্সিকিউটিভ বলে চালিয়ে দেয়া যায়। মেয়েদের খুব পছন্দ হবে চেহারাটা। রানা বিশেষভাবে লক্ষ করল লোকটা ওরই সমান লম্বা, তবে কাঠামোটা একটু হালকা। মারপিট বা ধস্তাধস্তিতে হয়তো সুবিধে করতে পারবে না, কিন্তু তাতে তাকে নামাতে পারছে কে। ভীতিকর লেগেছে লোকটার কথা বলবার ধরন। প্রয়োজনীয় শব্দ ছাড়া অতিরিক্ত একটা শব্দও উচ্চারণ করেনি। এই লোক নিঃসন্দেহে ক্রিমিনাল। সেক্ষেত্রে পিস্তলে সে অবশ্যই দক্ষ। বিপদের সামান্যতম লক্ষণ দেখলেই অস্ত্রটা ব্যবহার করবে নির্দ্বিধায়।

এতসব চিন্তা রানার মাথায় তিন কি চার সেকেন্ডের মধ্যে খেলে গেল। সময়টা পার হওয়ার আগেই ড্রাইভওয়েতে একটা গাড়ির শব্দ হলো। ক্ষীণ একটু আশা জাগল মনে। কিন্তু ল্যুগার হাতে লোকটা এক চুল নড়ল না। নতুন আগন্তুক শক্তির ভারসাম্যে বৈষম্যেরই মাত্রা বাড়াবে, কমাবে না। কাঁকরের ওপর দিয়ে হন-হন করে হেঁটে আসার শব্দ শোনা গেল। সদর দরজা দিয়ে আরেকজন লোক ঢুকল ভেতরে। রানার দিকে সে ভাল করে একবার তাকালও না। নীলচে চোখের

ভাষা পড়া কঠিন। মাথার সোনালি চুল ঠিকঠাক করে নিয়ে একই রকম আরেকটা ল্যুগার বের করল ডান নিতম্বের কাছ থেকে। তারপর এমন ভাবে নড়ল, যেন আগেই মহড়া দেয়া আছে–মাপা পা ফেলে এগিয়ে গিয়ে পিঠ ঠেকাল হলরুমের দেয়ালে, সিঁড়ির কাছে দাঁড়ানো সঙ্গী আর রানার মাঝখানে একবারও এলো না।

'এদিকে এসে ওপরে ওঠো, ধীরে ধীরে,' প্রথম লোকটা বলল, সেই আগের মত শুকনো গলায়।

সশস্ত্র শত্রুদের উপস্থিতিতে একতলা থেকে পালানো যতই কঠিন হোক, মঞ্চটা বদলে ওপরতলায় উঠে গেলে মনটা একেবারে ভেঙে পড়তে চায়, বিশেষ করে যদি ল্যান্ডিং বা হলে একজন গার্ড থাকে। মনে মনে ওদের প্রশংসা করল রানা, তবে নির্দেশ মত ধীরে ধীরে সামনে এগোল। তিন গজ এগিয়েছে, সরু মুখ নিয়ে লোকটা পিছু হটতে শুরু করল, দু'জনের মাঝখানে নির্দিষ্ট দূরত্ব বজায় রাখছে। পিছনে সোনালি চুলও এগোচ্ছে একই তালে, পেটের সামনে এনে পিস্তলটা রানার পা লক্ষ্য করে ধরে আছে। দু'জনেই প্রফেশনাল, তাতে কোন সন্দেহ নেই।

কোয়ার্টারডেক হল-এর চারদিকে স্বাভাবিক পরিবেশের ওপর চোখ বুলাল রানা। পাইন প্যানেল চকচক করছে। ফার্নিচার যেখানে যেটা থাকবার কথা সব সেখানেই আছে। একটা মাত্র বিচ্যুতি চোখে পড়ল, মেঝেতে আধ খাওয়া একটা চুরুট পড়ে রয়েছে। মারাত্মক দুঃসংবাদ, মাথায় আকাশ ভেঙে পড়বার মত বিপদের মাত্রা বেড়েছে ওর সঙ্গে কোন অস্ত্র না থাকায়। যান্ত্রিক রোবটের মত জলপাই রঙের কার্পেট মোড়া সিঁড়ির ধাপ বেয়ে ওপরে উঠছে রানা। নিরাপদ দূরত্ব বজায় রেখে দুই অস্ত্রধারীর একজন পথ দেখাচ্ছে, আরেকজন অনুসরণ করছে। দক্ষতার কোন অভাব না থাকলেও বোঝাই যায় যে এরা ভাড়াটে লোক, লীডার বা কর্তাদের কেউ নয়। অপারেশনটা যাই হোক, কার দায়িত্বে পরিচালিত হচ্ছে তা আশা করা যায় একটু পরই জানা যাবে।

'ঢোকো,' এবার কথা বলল সোনালি চুল। প্রথম লোকটা সিঁড়িতে দাঁড়িয়ে চৌকাঠ পেরিয়ে রাহাত খানের বেডরুমে ঢুকল রানা। কামরাটা লম্বাটে ব্যালকনির দিকে জানালাগুলো বন্ধ, তবে পর্দা সরানো। প্রথমেই রানার চোখ পড়ল বসের ওপর।

রানার গলার ভেতর থেকে দুর্বোধ্য একটা আওয়াজ বেরিয়ে এলো আতঙ্কে।

নিজের বিছানার পাশে একটা হালকা কাঠের চেয়ারে বসে রয়েছেন রাহাত খান। কাঁধ দুটো ঝুলে পড়ায় মনে হচ্ছে তাঁর বয়েস রাতারাতি দশ বছর বেড়ে গেছে। হাত দুটো অসাড় ভঙ্গিতে ঝুলছে দুই হাঁটুর মাঝখানে। এক মুহূর্ত পর ধীরে ধীরে মুখ তুললেন তিনি, দৃষ্টি স্থির হলো রানার চোখে। চিনতে পারার এতটুকু লক্ষণও ফুটল না তাতে, না কোন ভাব লক্ষ করা গেল। চোখের স্বচ্ছ, পরিষ্কার বুদ্ধির ঝিলিক, দৃষ্টির সেই অন্তর্ভেদী ধার হারিয়ে গেছে। রানা শুনতে পেল, বসের খোলা মুখ থেকে অদ্ভুত একটা অস্পষ্ট শব্দ বের হলো–সম্ভবত বিস্ময়সূচক, কিংবা প্রশ্নবোধক, বা হয়তো সতর্কীকরণ, আবার একই সঙ্গে তিনটেও হতে পারে।

কিডনির ওপরের সারফেসে ছোট দুটো অ্যাড্রিনিল গ্ল্যান্ড রয়েছে, সেগুলো থেকে হড়হড় করে অ্যাড্রেনালিন হরমোন বেরুচ্ছে। শ্বাস-প্রশ্বাসের গতি বেড়ে যাওয়ায় রক্তে বেড়ে গেল অক্সিজেন, তাতে হৃৎপিণ্ড দ্রুতগতি লাভ করায় পেশীতে বাড়তি রক্ত সরবরাহ হচ্ছে এখন, ত্বকের কাছাকাছি রক্তবাহী খুদে উপশিরাগুলো বন্ধ হয়ে যাওয়ায় আহত হওয়ার ঘটনা ঘটলে ক্ষতির মাত্রা সীমিত পর্যায়ে থাকবে, এমনকি খুলির চুলও চোখে না ধরা পড়বার মত সামান্য একটু উঁচু হলো। রাহাত খানের দিকে এখনও তাকিয়ে রয়েছে রানা, কোত্থেকে এলো বলা মুশকিল, হয়তো অ্যাড্রেনালিন থেকেই—আশ্চর্য একটা উল্লাস। এক পলকে জেনে ফেলেছে যে ওর ধার কমে যায়নি, উপলব্ধি করছে প্রয়োজনের সময় এখনও সেই আগের মতই সুদক্ষ লড়াইয়ের একটা মেশিন ও।

নতুন একটা কণ্ঠস্বর শুনতে পেল রানা, আগের দু'জনের মত এর উচ্চারণেও মার্কিন বাচনভঙ্গি স্পষ্ট। 'ভয় পাওয়ার মত কিছু ঘটেনি, মিস্টার রানা। তোমার বসের কোন রকম ক্ষতি করা হয়নি। ওষুধ দেয়া হয়েছে, যাতে সহযোগিতা করেন। ওষুধের প্রভাব কেটে গেলে আবার আগের মত স্বাভাবিক হয়ে উঠবেন। ওই একই ইঞ্জেকশন এখন তোমাকেও একটা দেয়া হবে। বাধা দিতে যেয়ো না, কারণ তুমি বাধা দিতে যাচ্ছ বুঝতে পারলেই আমার সঙ্গীদের একজন তোমার হাঁটুতে গুলি করবে। সেই অর্ডারই দেয়া আছে। ইঞ্জেকশনটা নিতে তুমি কোন ব্যথা পাবে না। পা দুটো স্থির রেখে ট্রাউজার নিচু করো।'

লোকটা মোটাসোটা, বয়েস হবে চল্লিশের কাছাকাছি। মাথা জোড়া টাক চকচক করছে, অপর দুই সঙ্গীর মত এর চেহারাতেও কোন বৈশিষ্ট্য নেই। ভাল করে দ্বিতীয় বার তাকালে হয়তো ধরা পড়বে যে চোখ দুটোয় কিছু একটা আছে। ঠিক চোখে নয়, চোখের পাতায়—আকারে স্বাভাবিকের চেয়ে বেশ বড়। ওগুলোর মালিক ব্যাপারটা সম্পর্কে পুরোপুরি সচেতন, তাই কথা বলবার সময় ঘন ঘন পলক ফেলে আর তোলে। তার এই আচরণ অস্বস্তি জাগায়। তবে রানাকে মোটেও ভোগাতে পারছে না।

নিজের অজান্তেই শত্রুদের পজিশন লক্ষ করেছে রানা: একজন অস্ত্রধারী ওর সামনে, দ্বিতীয় লোকটা ল্যান্ডিঙে বা সিঁড়ির কোথাও দাঁড়িয়ে দরজাটা কাভার দিচ্ছে, তৃতীয়জন ব্যালকনির বন্ধ জানালার দিকে পিছন ফিরে দাঁড়িয়ে আছে, বয়স্ক চতুর্থ লোকটা বিছানার পায়ের দিকটায় ধৈর্য ও বিষণ্ণতার ধৈর্যের প্রতিমূর্তি সেজে অপেক্ষায়। লোকটা ডাক্তার, হাতে হাইপডারমিক।

দুটো সমস্যার সমাধান প্রয়োজন, কেন তা না জেনেই রানা বুঝতে পারছে ওগুলো অত্যন্ত জরুরী। জানালার পাশে দাঁড়ানো লোকটা এইমাত্র যে কথাগুলো বলল তার মধ্যে একটা ভাঁওতা আছে। কী সেটা? আর, ওই জানালাগুলো সম্পর্কে নগণ্য যে ব্যাপারটা লোক চারজন জানে না অথচ নিজের স্বার্থে ব্যবহার করতে পারবে রানা, সেটাই বা কী?

'মুভ!' বিশাল পাতা চোখ ঢাকল, তারপর আবার খুলল।

রানা অপেক্ষা করছে।

'অবাধ্য হয়ে কোন লাভ নেই। আমার নির্দেশমত কাজ করবার জন্যে পাঁচ

সেকেন্ড সময় দেয়া হলো তোমাকে। তারপরও যদি সহযোগিতা না পাই, তোমাকে অচল করে ধীরে-সুস্থে ইঞ্জেকশন দেয়া হবে।'

সেকেন্ড গোণার দিকে রানার মন নেই। সময়টা পার হওয়ার আগেই দুটো সমস্যার প্রথমটার সমাধান পেয়ে গেল ও। যে কথাগুলো বলা হচ্ছে তার ভেতর পরস্পরবিরোধী একটা ব্যাপার রয়েছে। অসহায় একজন মানুষকে নতুন করে অসহায় বানাবার জন্য ইঞ্জেকশন দিতে হবে কেন? কেন প্রথমে তাকে জখম ও অকেজো করা হচ্ছে না? বর্তমান পরিস্থিতিতে সেটাই তো সহজ, সময় কম লাগবে, থাকবে না কোন ঝুঁকিও। তারমানে ওকে তারা শুধু অসহায় বানাতে চাইছে না, চাইছে অক্ষত অবস্থায় অসহায় বানাতে। গুলি করবার হুমকিটাকে স্রেফ ধাপ্পা বলেই মনে হচ্ছে। তা যদি না হয়, হিসেব ও বিশ্লেষণে ওর যদি কোথাও ভুল হয়ে থাকে, শাস্তিটা হবে ভয়াবহ। কিন্তু আর তো কোন বিকল্প নেই।

লোকটার সেকেন্ড গোণা শেষ হলো। রানা নড়েনি। নীরবতার ভেতর রাহাত খান আরেকটা ছোট্ট দুর্বোধ্য শব্দ করলেন। তারপর–

'ধরো।'

রানার হাত দুটো ধরে হ্যাঁচকা টান দিল পিছন দিকে–কামরার বাইরে থেকে লম্বাটে মুখ কখন ভেতরে ঢুকেছে টের পায়নি ও। বিদ্যুৎবেগে গোড়ালি চালাল পিছনে। শক্ত কোথাও লাগল। সঙ্গে সঙ্গে মুক্ত হলো একটা হাত। কিন্তু পরমুহূর্তেই সেটা ধরে ফেলল সোনালি চুল।

এরপর যে ধস্তাধস্তি আর মারামারিটা হলো, যদিও একজন লড়ছে দু'জনের বিরুদ্ধে, তবু দুই পক্ষের শক্তি সমান বলেই ধরতে হবে। কারণ নিজের ধারণা সঠিক প্রমাণিত হওয়ায় উল্লাসে নতুন শক্তি পাচ্ছে রানা, তার সঙ্গে যোগ হয়েছে লড়াই করবার ক্ষমতা সম্পর্কে আত্মবিশ্বাস ফিরে পাওয়ার আনন্দ। আরও ব্যাপার আছে–ও লোকগুলোকে বিভিন্ন ভাবে আঘাত করতে পারবে, অথচ লোকগুলোকে খেয়াল রাখতে হবে ও যাতে গুরুতর ভাবে আহত না হয়।

তবে ওকে যাদের বিরুদ্ধে লড়তে হচ্ছে তাদের একজন ওর সমানই শক্তিশালী। একটু রোগা হলেও, তার কাজ হলো যে-সব নার্ভে সবচেয়ে বেশি ব্যথা লাগে সেগুলোর একটা নাগালে পেলেই চাপ দিয়ে থেঁতলে বা টান দিয়ে ছিঁড়ে ফেলা।

সবেগে চালানো কনুই একটুর জন্য উরুসন্ধিতে লাগেনি, তারপরও রানার শরীরের ওপরের অর্ধেক সামনের দিকে ঝুঁকে পড়ল। তখনও নিজেকে সামলে নিতে পারেনি, ইস্পাতের তৈরি আঙটার মত দশটা আঙুল ওর ঘাড়ের ওপর দেবে গিয়ে গ্যাঙগ্লিয়া নার্ভে চাপ দিল। ওর হাত দুটোর ওপরের অংশ ঠাণ্ডা কাদার সরু ধারায় পরিণত হলো। আবার রানা পিছন দিকে গোড়ালি চালাল, কিন্তু এবার ওর পা দুটো ধরে ফেলা হলো। তারপর জোরালো একটা মোচড় আর হ্যাঁচকা টান, ধপাস করে পড়ে গেল রানা। মেঝেতে মুখ দিয়ে শুয়ে আছে, এক লোক চেপে বসেছে কাঁধের ওপর, আরেক লোক শরীরের নিচের অংশটা ধরে রেখেছে। রিল্যাক্স! প্রয়োজন ছাড়া নোড়ো না! একটু চিন্তা করো! জানালায় কী আছে? ওটার নাগাল পেলে কী লাভ?

'বেঁধাও।'

বিষণ্ন লোকটার এগিয়ে আসা টের পাচ্ছে রানা। এই লোক ডাক্তার। ওকে ইঞ্জেকশন দেবে। কই হে, তুমি নাকি লড়াই করবার আত্মবিশ্বাস ফিরে পেয়েছ?

লড়বার জন্য নিজেকে তৈরি করল রানা। প্রতিদ্বন্দ্বীরা সংখ্যায় দু'জন এবং যথেষ্ট শক্তিশালী হলেও তাদের জন্য এটা অসম যুদ্ধ, কারণ রানাকে তারা গুরুতর ভাবে জখম করবার ঝুঁকি নিতে পারছে না। এই সুযোগটাই গ্রহণ করল রানা। ধস্তাধস্তি আর ঘুসোঘুসির মধ্যে লক্ষ রাখতে হচ্ছে ডাক্তার যেন ঘ্যাঁচ করে সিরিঞ্জের সুইটা শরীরের কোথাও বিঁধিয়ে না দিতে পারে। এরই ফাঁকে অস্পষ্টভাবে খেয়াল করল চোখে চামড়ার হুড লাগানো লোকটার সঙ্গে কী নিয়ে যেন ডাক্তারের তর্ক শুরু হয়েছে। এই সময় যে ব্যাপারটা জানা দরকার সেটা মনে পড়ে গেল।

ব্যালকনির দিকের সবগুলো জানালা বন্ধ হলেও, ডানপাশেরটা আটকানোর কোন ব্যবস্থা নেই। ওটার ছিটকিনি ভেঙে গেছে। তিন কি চারদিন আগে ব্যাপারটা বসকে জানিয়েছিল খাদেম আলি। উত্তরে মেজাজ দেখিয়ে বস্ বলেছিলেন, তিনি চান না একজন কাঠমিস্ত্রি এসে বেডরুমটা নোংরা করুক। ক'দিন পরই তো দেশে ফিরে যাবেন, তখন পুরানো কর্মচারীরা যা করবার করবে। কাজেই ওই জানালার কবাট দুটো যেখানে মিলিত হয়েছে সেখানে যদি জোরাল একটা ধাক্কা দেয়া যায়...

খাদেম আলি আর রাহাত খানের সংলাপ বিনিময় স্মরণ করতে গিয়ে মুহূর্তের জন্য একটু শিথিল হয়ে পড়ল রানা। শত্রুদের একজন অতিরিক্ত এক আউন্স শক্তি পেয়ে গেল। রানার একটা কব্জি ধরে ফেলল সে, আটকে রাখতে পারল, পরমুহূর্তে ওই হাতের ওপর দিকে সুই ফোটানোর ব্যথা অনুভব করল ও। ক্ষোভ আর হতাশার একটা ঢেউ ঠেলে সরিয়ে দিয়ে নিজেকে জিজ্ঞেস করল ওষুধটা কাজ শুরু করতে কতটা সময় নেয়। পরীক্ষা করবার ছলে ঢিল দিল সবগুলো পেশীতে। বুঝতে পারল সামান্য হলেও ওর ওপর থেকে কমে যাওয়া চাপের বিশেষ তাৎপর্য আছে। তারপর নড়ল ও।

এক সেকেন্ডেরও কম সময়ে শরীরটা মুচড়ে নিজেকে মুক্ত করল রানা। পিঠ ধনুকের মত বাঁকা করে পা দুটো এক করে সামনে ছুঁড়ল। লম্বাটে মুখ কর্কশ চিৎকার ছাড়ল। ফিনকি দিয়ে রক্ত বেরুচ্ছে তার নাক থেকে। ভারী শব্দ করে পড়ে গেল সে। অপর লোকটা রানার ঘাড় লক্ষ্য করে হাতের উল্টোপিঠ দিয়ে কোপ চালালেও দেরি করে ফেলেছে। কনুই চালিয়ে প্রায় অব্যর্থভাবে তার শ্বাসনালিতে লাগাতে পেরেছে রানা। আরেকজন, চোখের অস্বাভাবিক বড় পাতা একবারও ওঠা-নামা করছে না, রানাকে মেঝে থেকে উঠতে দেখে লাথি চালাল, কিন্তু তারও দেরি হয়ে গেছে। কীভাবে কী ঘটল বুঝে ওঠার আগেই ধরাশায়ী হয়ে জানালার দিকে রানার পথ পরিষ্কার করে দিল সে। রানার কাঁধের ধাক্কায় জানালার কবাট দুটো কজা থেকে ভেঙে বাইরের দিকে ছিটকে পড়ল। সেগুলোকে অনুসরণ করে ব্যালকনির নিচু রেলিঙে একটা হাত রাখল রানা, টপকাল, নিচে পড়ল নিখুঁত ভারসাম্য বজায় রেখে একই সঙ্গে চার হাত-পা মাটিতে দিয়ে। এরপর সিধে হয়ে এক ছুটে জঙ্গলে।

প্রথমে মনে হলো ছড়ানো ছিটানো পাইনগুলো মন্থরগতিতে ওকে পাশ কাটাচ্ছে। তারপর সংখ্যায় বাড়তে লাগল, একই সঙ্গে পাশ কাটানোর গতিও। পাইন ছাড়াও প্রচুর বঁইচি আর বুনো রোডডেনড্রন-এর ঝোপ দেখা যাচ্ছে। হাঁটছে, নাকি দৌড়াচ্ছে, নিজের কাছেই পরিষ্কার নয়। সম্ভবত দৌড়াতে চেয়ে হাঁটতে পারছে। ঝোপগুলো বাধা। পড়ে না যাওয়াটা খুব গুরুত্বপূর্ণ। আবার গতিও কমানো যাবে না। এই তো, হ্যাঁ, এভাবে ছুটতে হবে! কেন? ওদের কাছ থেকে পালাবার জন্য। ওরা কারা? আমেরিকান। এক লোকের চোখ বাজপাখির মত। ওই লোকটা বসের ভয়ানক ক্ষতি করেছে। বসকে বাঁচাতে হবে। এটাই প্রথম কাজ। তা হলে কি ফিরে যাবে বাড়িটায়? না। ছুটতে থাকো। বসের কাছ থেকে পালালে কীভাবে তাঁকে বাঁচানো সম্ভব? হ্যাঁ, শুধু এভাবেই সম্ভব। পালাও। কিন্তু কোথায়? যত দূরে পারো।

রানাকে আসলে এখন একটা মেশিন ছাড়া আর কিছু বলা যায় না। একটু পরেই বাকি সব কিছু ভুলে গিয়ে মনে রাখল শুধু পা ফেলবার কথা–একের পর এক, একের পর এক। তারপর যখন মনে কিছুই অবশিষ্ট থাকল না, শরীরটা তারপরও ছুটে চলেছে, সেই আগের গতিতেই, তবে দিক সম্পর্কে কোন ধারণা ছাড়াই। এভাবে আরও কয়েক মিনিট পার হলো। তারপর গতি মন্থর হয়ে পড়ল। এক সময় স্থির হলো ওটা। স্থির হয়ে দাঁড়িয়ে থাকল, তা-ও এক মিনিট হবে। ঝুলে পড়েছে মুখ, হাঁপাচ্ছে বেদম, মরা সাপের মত শরীরের দু'পাশে ঝুলছে হাত দুটো। চোখ খোলা থাকলে কী হবে, কিছুই দেখতে পাচ্ছে না। তারপর, সম্ভবত তলানি থেকে উঠে আসা শেষ ইচ্ছেশক্তিটুকুর তাগিদে, রানার শরীর দশ কি বারো কদম এগিয়ে আছাড় খেলো। একজোড়া বামন আকৃতির পপলার গাছের মাঝখানে, কর্কশ ঘাসের ভেতর ডুবে আছে। পাঁচ ফুট দূর থেকে পাশ কাটালেও কেউ ওকে দেখতে পাবে না।

তবে অত কাছাকাছি কেউ এলো না। ধাওয়াটা প্রথম থেকেই সুবিধের হয়নি। ব্যালকনি থেকে লাফ দিয়ে নিচে নেমে নাকের রক্ত মুছতে মুছতে লম্বাটে মুখ বাড়ির কোণ ঘুরে রানাকে জঙ্গলে ঢুকতে দেখেছিল ঠিকই, কিন্তু অপর দুই সঙ্গী তার সঙ্গে যোগ দিতে দশ থেকে বারো সেকেন্ড দেরি করে ফেলে, কারণ ব্যালকনি থেকে লাফ না দিয়ে সিঁড়ি বেয়ে নেমেছে তারা। তাদেরকে নির্দেশ দেওয়ার জন্য ওখানে দাঁড়িয়ে থেকে সময় অপচয় করে লম্বা-মুখও। তারা যখন জঙ্গলে ঢুকল, তখন আর রানার ছোটার শব্দ ওদের কানে পৌঁছাচ্ছে না। ফলে রানা যেদিকে গেছে সেদিকে তারা অল্প কিছু দূর গেল, তারপর সঠিক পথ ছেড়ে বৃথা ঘুরে বেড়াল এদিক ওদিক। এক সময় হাতঘড়ির ওপর চোখ বুলিয়ে খোঁজাখুঁজি বন্ধ করে দিল তাদের লীডার।

'ফেরো।' তখনও ঘোরেনি, চামড়ার হুড তুলে লম্বাটে মুখের দিকে অদ্ভুত এক দৃষ্টিতে তাকাল সে। মুখটা থেকে প্রচুর রঙ মুছে গেছে। তারপর ঘুরে ফিরতি পথ ধরল তারা। প্রহসন ও ফাঁকতালে ভরা দিনটার সর্বশেষ চমক হলো, আর ষাট-সত্তর গজ সোজা এগোলেই রানাকে ঘাসের ভেতর শুয়ে থাকতে দেখতে পেত তারা।

আরও কিছু সময় পার হলো। জঙ্গলে ছায়াগুলো দীর্ঘতর হচ্ছে। তারপর এক সময় গোধূলির ম্লান আলোয় সব কিছু ঝাপসা হয়ে এলো। পোকা মাকড়ের গুঞ্জন নিস্তেজ হয়ে আসছে। একটা ব্ল্যাকবার্ড ডেকে উঠল। আর কোন শব্দ নেই। রানা যদি নির্দিষ্ট সীমা পর্যন্ত কান খাড়া করতে পারত, দূর থেকে ভেসে আসা একটা চিৎকার শুনলেও হয়তো শুনতে পেত, হঠাৎ থামিয়ে দেয়া হলো। এর খানিক পর স্টার্ট নিয়ে চলে গেল একটা গাড়ি। তবে রানা কিছুই শুনল না। ওর জ্ঞান নেই।

*

কামরাটা ছোট। এখানে কী আছে বা এটা কোথায় বোঝবার কোন উপায় নেই। দু'জন কি তিনজন লোক কথা বলছে। কণ্ঠস্বর ভোঁতা, কারণ তাদের মুখ স্বচ্ছ কাপড় দিয়ে ঢাকা—কাপড়, নাকি কুয়াশা? এক লোক খুব কাছে চলে এলো, ওর ওপর ঝুঁকে পড়েছে। আবার ওর চোখ নিয়ে কী যেন করল। 'হুম' করে একটা আওয়াজ বেরুল গলা থেকে। সিধে হয়ে চলে গেল। আবার ফিরে এলো। ওকে চেয়ার থেকে তুলছে নাকি? আরে, জ্যাকেট ধরে টানছে কেন? কী যেন ফুটল হাতে। সামান্য ব্যথা। আবার চেয়ারে বসাল।

'কি বুঝছেন, ডাক্তার?'

'নিঃসন্দেহে বলা যায়, ড্রাগ। ডোজটা কড়া। কী ড্রাগ এখনি বলা কঠিন, তবে হায়াসায়ামিন হতে পারে। আমি যে ইঞ্জেকশনটা দিলাম, স্বাভাবিক হতে সাহায্য করবে ওঁকে।'

'ভদ্রলোক তা হলে ড্রাগ অ্যাডিক্ট?'

'কি জানি। আমার তাতে সন্দেহ আছে। আমাদের একটু ধৈর্য ধরতে হবে। এঁকে আপনারা পেলেন কোত্থেকে?'

'একজন মোটরিস্ট আধ ঘণ্টা হলো পৌঁছে দিয়ে গেছে। বলল, গ্রেটপার্ক-এ ঢোকার মুখে টলতে টলতে হাঁটছিলেন। আমরা প্রথমে ধরে নিই মদ খেয়ে মাতাল হয়ে পড়েছেন।'

'ড্রাগটা যাই হোক, এর প্রতিক্রিয়াও শান্ত মাতালের মত। অনুগত বা আজ্ঞাবহ করবার এরচেয়ে ভাল কোন উপায় আছে বলে আমার অন্তত জানা নেই। বুঝলেন, সার্জেন্ট, এর মধ্যে খারাপ কিছু একটা আছে। পেশেন্টের পরিচয় জানা গেছে?'

'নাম মাসুদ রানা। লন্ডনের বিজনেস অ্যাড্রেস রিজেন্ট পার্কের ওদিকটায়। কী বিজনেস, কার্ডে তা লেখা নেই। ফোন করেছিলাম, উত্তরে বলা হয়েছে ডাক্তার ছাড়া আর কেউ যেন ভদ্রলোকের ধারে-কাছে না আসে। ওরা একজনকে পাঠাচ্ছে। আমাদের ইন্সপেক্টরও তো দেরি করছেন আসতে। এমফোর-এ পাঁচ-সাতটা গাড়ি অ্যাক্সিডেন্ট করেছে, ওখানে গেছেন তিনি।'

'এবার বোধহয় আমরা কিছু জানতে পারব। মিস্টার রানা? মিস্টার রানা, এখানে আপনি সম্পূর্ণ নিরাপদ। আর মাত্র কয়েক মিনিটের মধ্যে সম্পূর্ণ সুস্থ বোধ করবেন। আমি ডাক্তার সারওয়াক। এঁরা সার্জেন্ট হাসলার আর কনেস্টবল পটারম্যান। ওঁরা আপনার নিরাপত্তার দিকটাই শুধু দেখছেন। আপনি একটা পুলিস স্টেশনে রয়েছেন—তবে কোন অপরাধ

করেননি। এখন আপনার শুধু খানিকটা বিশ্রাম দরকার।'

ধীরে ধীরে মুখ তুলল রানা। কারও মুখে কোন কাপড় নেই, অর্থাৎ ওর ঝাপসা দৃষ্টি পরিষ্কার হয়ে গেছে, কানেও এখন ভাল শুনতে পাচ্ছে। ডাক্তারের সাদা পোশাক চিনতে পারছে। চিনতে পারছে তার পিছনে দাঁড়ানো গাঢ় নীল ইউনিফর্ম পরা পুলিস দু'জনকে। এক ধারে পুরানো একটা ডেস্কে টেলিফোন দেখা যাচ্ছে। আরেক দিকের দেয়ালে ওয়াল ম্যাপ ও চার্ট। হ্যাঁ, এটা পুলিস স্টেশনই। কী বলবে গুছিয়ে নিতে চাইল দ্রুত।

'আমি চাই,' ভারী গলায় বলল ও। '...আমি একটা গাড়ি চাই। সঙ্গে চারজন লোক দরকার। সশস্ত্র। যত তাড়াতাড়ি সম্ভব আমার সঙ্গে চলুন।'

'আহা, বেচারি প্রলাপ বকছে!' সার্জেন্টের গলায় সহানুভূতি।

ভুরু কোঁচকালেন ডাক্তার। 'না বোধহয়।' ঝুঁকে রানার কাঁধে হাত রাখলেন। 'আমরা শুনছি, মিস্টার রানা। ধীরে ধীরে, একটু একটু করে সব কথা বলুন আপনি।'

'একজন অবসরপ্রাপ্ত মেজর জেনারেল। বাংলাদেশী, আপনারা তাঁকে চিনবেন না। ব্রিটিশ সিক্রেট সার্ভিসের চীফ তাঁর ঘনিষ্ঠ বন্ধু।' সার্জেন্টকে চমকে উঠতে দেখল রানা। 'লন্ডনের বাইরে তাঁর নিজস্ব এস্টেট আছে–কোয়ার্টারডেকে।' মাথা দ্রুত পরিষ্কার হয়ে আসছে। 'সেই এস্টেটের বাড়িতে ভয়ানক একটা বিপদ ঘটেছে। আমার ধারণা একদল লোক কিডন্যাপ করেছে তাঁকে।'

'বলে যান, প্লীজ, সার,' সার্জেন্টের গলায় সমীহ। রানার কথা শেষ হওয়ার আগেই টেলিফোন টেনে নিয়ে ডায়াল শুরু করেছে।

'ওরা চারজন ছিল। মেজর জেনারেল আর আমাকে একই ইঞ্জেকশন দিয়েছে। কীভাবে পালিয়ে আসি বলতে পারব না।'

'পারার কথাও নয়,' ডাক্তার সারওয়াক বললেন।

পরিস্থিতি বিবেচনা ও বিশ্লেষণ করছে রানা, তারপর আন্দাজ করবার চেষ্টা করল প্রতিপক্ষ এই মুহূর্তে কী করছে। যে উপসংহারে পৌঁছাল সেটা হতবুদ্ধিকর। লাফ দিয়ে চেয়ার ছাড়ল ও। একই সময়ে ক্রেডলে রিসিভারটা নামিয়ে রাখল সার্জেন্ট। 'এস্টেটের নম্বরে কোন রিঙই হচ্ছে না,' বলল সে।

'স্বাভাবিক,' বলল রানা। 'ওটা আমাকে দিন।' পুলিস অপারেটর সাড়া দিতে বলল, নিজের অজান্তে অপর হাতটা শক্ত মুঠোয় পরিণত হলো, 'লন্ডন এয়ারপোর্ট। প্রায়োরিটি। আমি লাইন কেটে দিয়ে অপেক্ষায় থাকছি।'

ওর দিকে একবার তাকিয়ে ছুটে কামরা ছেড়ে বেরিয়ে গেল সার্জেন্ট হাসলার।

রানার বন্ধু, মাইকেল জেফরি, লন্ডন এয়ারপোর্টের সিকিউরিটি অফিসার। সব কথা শুনে রাহাত খান আর চার শত্রু কী রকম দেখতে জানতে চাইছে। ফোনে তাদের চেহারার বর্ণনা দিচ্ছে রানা, এই সময় ইন্সপেক্টর ফিরলেন। এক মিনিট পর তার পিছু নিয়ে অফিসে ঢুকল সোহেল। রানা এজেন্সির লন্ডন শাখা থেকে খবর পেয়ে দেরি করেনি সে, একটা হেলিকপ্টার ভাড়া করে কেন্ট থেকে চলে এসেছে।

কথা শেষ করে রিসিভার নামিয়ে রাখল রানা, বড় করে শ্বাস টেনে পরিস্থিতিটা সোহেলকে ব্যাখ্যা করল। এই সময় ফিরে এলো সার্জেন্ট। তার গোলগাল চেহারা ফ্যাকাসে লাগছে। সরাসরি রানার দিকে তাকাল সে। 'বাড়িটায় একটা পেট্রল কার পৌঁছে গেছে, সার,' বলে ঢোক গিলল। 'ওখান থেকে এইমাত্র রিপোর্ট পেলাম। এত বেশি দেরি হয়ে গেছে যে সশস্ত্র লোক পাঠিয়ে এখন আর কোন লাভ নেই।' ঘাড় ফেরাল সে। 'অবশ্য আপনাকে আমাদের দরকার হবে, ডক্টর সারওয়াক। তবে আপনারও যে কিছু করবার আছে, তা-ও নয়।'

তিন

কোয়ার্টারডেক-এর হলে চিৎ হয়ে পড়ে রয়েছে লম্বা-মুখ। লম্বা হোক আর যাই হোক, খুব বেশি কিছু অবশিষ্ট নেই। মুখের বেশ কিছু অংশ, আর মুখের পিছনে যা কিছু ছিল, দেয়ালের এখানে সেখানে আর মেঝেতে দেখা যাচ্ছে। একটা প্যানেলের ভেতর ল্যুগারের বুলেটটা আধ ইঞ্চি সেঁধিয়ে গেছে।

সাবেক মুক্তিযোদ্ধা ও রাহাত খানের ব্যক্তিগত দেহরক্ষী খাদেম আলিকে দু'বার গুলি করা হয়েছে–একবার বুকে, তারপর নিঃসন্দেহ হওয়ার জন্য ঘাড়ের পিছনে। ধরে নেয়া চলে কে এলো দেখবার জন্য সদর দরজা খুলতেই তাকে খুন করা হয়। তার বেলায় স্মল ক্যালিবারের আগ্নেয়াস্ত্র ব্যবহার করবার কারণ হলো, শত্রুরা চায়নি হলে রক্ত দেখে বাড়িতে ঢোকার মুহূর্তে সাবধান হয়ে যাক রানা। লাশটা সঙ্গে সঙ্গে কিচেনে সরিয়ে ফেলা হয়। তৃতীয় লাশটাও ওখানে পাওয়া গেল।

শান্তা আলি অন্তত জানতেই পারেনি কী ঘটেছে তার। খুনী একই ধরনের হালকা আগ্নেয়াস্ত্র ব্যবহার করেছে। গ্যাসের চুলোয় বা সিঙ্ক-এ কাজ করছিল শান্তা আলি, নিঃশব্দে ভেতরে ঢুকে পয়েন্ট ব্ল্যাঙ্ক রেঞ্জ থেকে তার মাথার পিছনে একটা মাত্র গুলি করা হয়েছে। বাল্যকাল থেকেই পরস্পরের সঙ্গী ছিল ওরা, মৃত্যুর পরও স্বামীর কাছাকাছি পড়ে রয়েছে শান্তা আলি–এত কাছে, খাদেম আলির প্রসারিত হাতের পিছন দিকটা স্ত্রীর কাঁধে ঠেকে রয়েছে। ভঙ্গিটার সাহায্যে যেন অভয় দিয়ে বলতে চাইছে শান্তাকে সে ছেড়ে যায়নি, তার কাছাকাছিই আছে, যেমনটি সারাটা জীবন ধরে ছিল।

ওদের যুদ্ধ, প্রেম আর জীবনের কথা রানার খুব ভাল করে জানা আছে। গুমরে কেঁদে ওঠা আর খেঁকিয়ে ওঠার মাঝামাঝি একটা ভোঁতা শব্দ করল রানা। এই অপরাধ অপ্রয়োজনীয় ছিল। শুধু ঝামেলা এড়াতে মশা-মাছি মারবার মত সহজ ভঙ্গিতে দু'জন আদর্শ ও আত্মত্যাগী মানুষকে সরিয়ে দেয়া হয়েছে। খুন বা মারাত্মক ক্ষতি না করেও ওদেরকে অচল করে রাখা যেত, তাতে শত্রুদের কোন ঝুঁকিও থাকত না। হাত-পা বেঁধে, মুখে কাপড় গুঁজে কিচেনের মেঝেতে ফেলে রাখতে পারত ওরা। এই মৃত্যুর প্রতিশোধ অবশ্যই নেয়া হবে।

'ভাগ্যই বলতে হবে যে আমার কথায় কোয়ার্টারডেকে আসিসনি তুই,' সোহেলকে বলল রানা।

কথা না বলে সোহেল শুধু মাথা ঝাঁকাল। লাশগুলো ডাক্তার আর পুলিস এক্সপার্টদের হাতে ছেড়ে দিয়ে কিচেন থেকে বেরিয়ে এলো ওরা। কী একটা জরুরী কাজে আজ সকালের দিকে ইরাকে গেছেন ব্রিটিশ সিক্রেট সার্ভিসের চীফ মারভিন লংফেলো, তা সত্ত্বেও বিসিএস হেডকোয়ার্টার থেকে মেসেজ পেয়ে এরই মধ্যে দু'বার ফোন করেছেন রানাকে। প্রথমবার রাহাত খানের কিডন্যাপ হওয়ার খবর সম্পর্কে নিশ্চিত হয়েছেন, তারপর সহানুভূতি প্রকাশ করে সম্ভাব্য সব রকম সহযোগিতার আশ্বাস দিয়েছেন। দ্বিতীয়বার ফোন করবার উদ্দেশ্য ছিল এক রকম ক্ষমা প্রার্থনাই। রাহাত খান তাঁর ঘনিষ্ঠ বন্ধুদের অন্যতম। তাঁর এই বিপদে এত দূরে বসে কী সাহায্য করতে পারবেন ঠিক বুঝতে পারছেন না…রানা ওর এজেন্সির মাধ্যমে চেষ্টা করলে তদন্ত বরং খুব দ্রুত এগোবে বলে বিশ্বাস করেন তিনি…তাছাড়া, ব্যাখ্যা করা যায় না এমন সব কারণে অনেক সময় ইচ্ছে থাকলেও উপকার ফিরিয়ে দেয়া কঠিন হয়ে দাঁড়ায়।

রানা পরিষ্কার বুঝল, মারভিন লংফেলোকে যারা নির্দেশ দেন, অর্থাৎ ব্রিটিশ সরকারের একেবারে টপ লেভেল থেকে আভাসে বলে দেয়া হয়েছে, এই কেসটার সঙ্গে ব্রিটিশ সিক্রেট সার্ভিস যেন না জড়ায়।

সহানুভূতি প্রকাশ এবং নিজের অক্ষমতা ব্যাখ্যা করবার জন্য তাঁকে ধন্যবাদ জানিয়ে যোগাযোগ কেটে দিয়েছে রানা।

রাহাত খানের স্টাডিতে চলে এলো ওরা।

খাদেম আলি আর তার স্ত্রীর নিয়তি খোলা একটা বইয়ের মত পড়া যাচ্ছে। বাকি থাকল লম্বা-মুখের হত্যাকাণ্ড।

বছরের এই সময় ফায়ারপ্লেসে কোন আগুন থাকে না, ওটার দুপাশে দুটো কাঠের চেয়ারে মুখোমুখি বসল ওরা। 'রাগের মাথায় ওর বস্ই হয়তো ওকে গুলি করে মেরেছে,' বলল সোহেল। 'এখানে আসার পথে তুই যা বললি, তাতে বোঝা যায় দোতলায় ধস্তাধস্তির সময় লোকটা তেমন কৃতিত্ব দেখাতে পারেনি। তার বসের মনে এ সন্দেহও জেগে থাকতে পারে যে তোকে পালাতে সাহায্য করেছে সে।'

'হঠাৎ রেগে উঠে কিছু করে বসবার লোক তারা নয়।'

'রক্তাক্ত নাক ঝামেলা সৃষ্টি করতে পারে। এরকম ঝামেলা এড়াতে কেউ কাউকে গুলি করে?'

'এয়ারপোর্ট থিওরির সঙ্গে এটা মিলে যাবে,' বলল রানা। 'ওটা শুধু রক্তাক্ত নাক ছিল না, নাকের হাড়ও ভেঙে গিয়েছিল। বস্কে নিয়ে কাস্টমস আর ইমিগ্রেশন পার হওয়া এমনিতেই প্রায় অসম্ভব, সম্ভবত অসুস্থ বলে চালাবার চেষ্টা করবে। অচল একজন রুগীর সঙ্গে নাক ভাঙা লোক থাকলে মানুষের মনে সন্দেহ জাগবেই।'

'তবে তোকে ধরতে না পারায় ওদের অনেক ঝামেলা কমেও গেছে, তাই না? দু'জন লোক অসুস্থ, ইমিগ্রেশনকে এ-কথা বিশ্বাস করানো খুবই কঠিন হত।'

'যেভাবেই ব্যাখ্যা করি, এখানে নিজেদের একজন লোককে মেরে রেখে

যাওয়ার পিছনে নিশ্চয়ই কোন রহস্য আছে–আমাদের জানতে হবে, কী সেই রহস্য। প্রথমেই যে প্রশ্নটা মনে জাগে, নিজেদের লাশ এখানে কেন ফেলে রেখে যাবে? আল্লাহই জানে এটা কত তথ্য উপহার দেবে আমাদের। এরকম ক্ষেত্রে সবাই আশা করে, লাশটা অন্তত তারা লুকিয়ে ফেলবার চেষ্টা করবে।'

'বোধহয় সময় পায়নি,' বলল সোহেল, হাতঘড়ির ওপর চোখ বুলাল। 'এ-ধরনের প্ল্যানে সব সময় বলে দেয়া হয়, প্রতিটি কাজ ঘড়ির কাঁটা ধরে সারতে হবে। আচ্ছা, টেলিফোন মেরামত করতে কতক্ষণ সময় নেবে ওরা? এয়ারপোর্টের সঙ্গে যোগাযোগ থাকা দরকার...'

বাধা দিয়ে রানা বলল, 'প্রায় এক ঘণ্টা আগে পালাবদল ঘটায় জেফরির কাজ অনেক কঠিন হয়ে গেছে। এর আগে যারা ডিউটিতে ছিল তাদেরকে খুঁজে বের করতে হবে ওকে। ওদের লোকবল বেশি নয়, অন্যান্য এয়ারপোর্টে চেহারার বর্ণনা পাঠাতে সময় লাগবে...'

নক করে ভেতরে ঢুকল একজন পুলিস কনেস্টবল। 'ফোন ঠিক হয়ে গেছে, সার। আপনাদের কথামত এয়ারপোর্ট সিকিউরিটিকে খবরটা জানিয়েও দেয়া হয়েছে।'

'ধন্যবাদ।' লোকটা চলে যেতে চেয়ার ছেড়ে পায়চারি শুরু করল সোহেল। 'সব মিলিয়ে আমি হতাশ! চল, বেরিয়ে পড়ি, রানা। বিএসএস সাহায্য করবে না তো বয়েই গেল! তোর এজেন্সির প্রতিটি ইউরোপ শাখাকে আমি সতর্ক করে দিয়েছি। এখানে বসে না থেকে আমাদেরও বেরিয়ে পড়া উচিত।'

'যেখান থেকে যত টেলিফোন আসবে, প্রায় সবই এখানকার নম্বরে। তা ছাড়া, বেরুবার আগে নিশ্চিত হতে হবে এখানে আর কিছু জানবার নেই। ইন্সপেক্টর হারমান অত্যন্ত যোগ্য লোক, কিছু থাকলে তাঁর চোখে ধরা পড়বে। হতাশ হওয়ার কী আছে? সমস্ত বন্দর আর...'

'দেখ, রানা,' আবার হাতঘড়ি দেখল সোহেল, 'এখান থেকে প্রায় চার ঘণ্টা আগে বেরিয়ে গেছে ওরা...'

দম আটকে নিচের ঠোঁটে জোরে কামড় বসাল রানা। 'গড, তুই যদি জানতিস নিজের ভুলের জন্যে...'

'এই, খবরদার, বোকার মত কথা বলবি না। তুই যা করেছিস তার বেশি কেউ কিছু করতে পারত না। নিজেকে সামলে নিয়ে আমার কথা শোন।'

'বল।'

'চার ঘণ্টা। বসকে যদি প্লেনে করে নিয়ে যাওয়ার ইচ্ছে থাকে, এয়ারপোর্টে পৌঁছে প্লেনে চড়তে এক ঘণ্টার বেশি লাগেনি ওদের। তারপর ওরলি, আমস্টারডাম বা মার্সেইতে পৌঁছাতে আরও এক ঘণ্টা। কাস্টমস ও ইমিগ্রেশন পেরুতে ধর আধ ঘণ্টা। গাড়ি করে নিরাপদ আস্তানায় পৌঁছাতে ত্রিশ মিনিট? সব মিলিয়ে তিন ঘণ্টা। আমাদের ওয়ার্নিং চারদিকে ছড়াবার আগেই বসকে নিয়ে লুকিয়ে পড়েছে ওরা। এখন বুঝতে পারছিস কেন আমি হতাশ?'

'হতাশা থেকে কিছু আমরা পাচ্ছি না। তুই আমাকে বল, এই কাজ কারা করতে পারে।'

'তুই বলেছিস লোকগুলো আমেরিকান। মাফিয়া?'

'সিআইএ?' মাথা নিচু করে আছে রানা, লক্ষ করল হাতের আঙুলগুলো কাঁপছে।

'রুশ ইন্টেলিজেন্সও আজকাল আমেরিকান গ্যাঙস্টারদের ব্যবহার করছে।'

'এমনও হতে পারে বসকে হয়তো ব্রিটেনের ভেতরই কোথাও লুকিয়ে রেখেছে। কেন, কী উদ্দেশে, আমি জানি না। সবচেয়ে খারাপটাই ঘটে গেছে, সোহেল। আমরা আমাদের প্রিয় বুড়োকে হারিয়ে ফেলেছি!' বলেই দুই হাতে মুখ ঢাকল রানা।

হলে টেলিফোন বেজে উঠল। দরজার দিকে ছুটল সোহেল। 'আমি দেখছি। তুই বিশ্রাম নে।'

চেয়ারে হেলান দিল রানা, হল থেকে ভেসে আসা সোহেলের কথা অস্পষ্টভাবে শুনতে পাচ্ছে। পুলিসের হাঁটাচলা আর ক্যামেরার শাটার টেপার শব্দ বেসুরো, অবাস্তব লাগছে। তামার অ্যাশট্রেতে বসের ব্রায়ার টোব্যাকো পাইপটা দেখে ওর মনে সন্দেহ জাগল এই কামরাটা এককালে হয়তো মিউজিয়াম ছিল। তারপর আরও অস্বস্তিকর একটা অনুভূতি হলো—এখন যদি চেয়ার ছেড়ে পাথুরে দেয়ালে হাত দেয়, দেয়ালটা ভেতর দিকে দেবে যাবে, ক্যানভাসের মত।

সোহেলের হঠাৎ ফিরে আসা রানার ঘোর কাটিয়ে দিল। বোঝা গেল ড্রাগের প্রভাব এখনও কিছুটা রয়ে গেছে। চোখ তুলতেই লক্ষ করল, বন্ধুর কপাল ও চোয়াল টান টান হয়ে আছে, মুখের রঙ সাদা।

'শোন, রানা। আমার কথা প্রায় ফলে গেছে। বিরাট একটা সান্ত্বনা।' আবার কার্পেটের ওপর পায়চারি শুরু করল সোহেল। 'এয়ার লিংগাস-এর ওয়ানফোরসেভেন-এ ফ্লাইট ধরে ন'টার সময় শ্যানন-এর উদ্দেশে রওনা হয় ওরা। ওই সময় যারা ডিউটিতে ছিল তারা ওদের কথা মনে করতে পারছে। গোটা ব্যাপারটা যেন নাটকের স্ক্রিপ্ট ধরে ঘটানো হয়েছে। এর আগেও চারজন লোক এই একই এয়ারওয়েজের একই সময়ের ফ্লাইট ধরে শ্যাননে গেছে—বোঝাই যায় কাস্টমসকে অভ্যস্ত করিয়ে নেওয়ার জন্য। জানি না যে লোকটাকে এখানে রেখে গেছে তার আর তোর জন্য কী ব্যবস্থা করত ওরা।

'যাই হোক, শ্যাননে ওরা ল্যান্ড করেছে পৌনে দশটার দিকে। মানে...প্রায় আড়াই ঘণ্টা আগে, তুই যখন জঙ্গলের ভেতর দিশেহারা হয়ে ঘুরে বেড়াচ্ছিলি। অর্থাৎ ওরা পালাতে পেরেছে। শ্যাননে নিশ্চয়ই একটা গাড়ি অপেক্ষা করছিল, আল্লাহই জানে সেই গাড়ি কোন প্রত্যন্ত এলাকার ইনলেটে পৌঁছে দেবে ওদেরকে। ওদিকে ওগুলোর সংখ্যা কয়েকশো। ওই এলাকা আমি চিনি, সম্ভবত গোটা পশ্চিম ইউরোপের মধ্যে সবচেয়ে নির্জন। পরিত্যক্তই বলা যায়। ওখান থেকে বোটে করে জাহাজে ওঠা যাবে। চড়া যাবে সাবমেরিনে। সী প্লেনে উঠে কয়েকশো মাইল আটলান্টিক পাড়ি দেয়াও সম্ভব।

'আইরিশ কোস্টগার্ড আর নেভিকে সতর্ক করা হয়েছে। রানা এজেন্সির এজেন্টরা এতক্ষণে চার্টার করা প্লেন নিয়ে শ্যাননের দিকে রওনা হয়ে গেছে। ওঠ, রানা, কয়েক জায়গায় টেলিফোন করতে হবে।'

হল থেকে তিন-চার জায়গায় ফোন করল ওরা। রিসিভার নামিয়ে রাখছে সোহেল, এই সময় ইন্সপেক্টর হারমানকে ভেতরে ঢুকতে দেখা গেল, হাতে একটা ম্যানিলা এনভেলাপ।

'এখানে আমাদের কাজ প্রায় শেষ হয়ে এসেছে, জেন্টলমেন। আপনারা যদি চলে যেতে চান, এই খামটা সঙ্গে রাখুন–যা কিছু জানতে চান, আশা করি সব এতে পাবেন।' সোহেলের বাড়ানো হাতে এনভেলাপটা ধরিয়ে দিল, তারপর না তাকিয়ে ইঙ্গিতে লাশটা দেখাল। 'এ-সব ওর পকেট থেকে পাওয়া গেছে। কিছু যে পাওয়া গেছে, এটাই একটা অবাক কাণ্ড। অপরাধীর পরিচয় গোপন রাখতে চাওয়াটাই স্বাভাবিক। অবশ্য কোন্ কোম্পানির কাপড়চোপড়, জানা যায়নি। কোনও লন্ড্রি ট্যাগও পাওয়া যায়নি। লোকটার যেটুকু অবশিষ্ট আছে তার পরিষ্কার তিনটে ফটোগ্রাফ, সঙ্গে এক সেট ফিঙ্গারপ্রিন্ট। কতটুকু লম্বা, আনুমানিক ওজন। বিশেষ কোন চিহ্ন–নেই। আপনাদের ফাইলে এর ছবি বা তথ্য থাকলে, এ-সব আপনাদের প্রয়োজন হবে না। মিস্টার রানা তাকে খুব ভালভাবে দেখার সুযোগ পেয়েছেন। ওহ্, ডাক্তারের প্রাথমিক রিপোর্টও আছে। একটা ফর্মে সই করতে হবে, সার। কাজ শেষ হয়ে গেলে জিনিসগুলো আবার ফেরত চাইব আমরা।'

ফর্মে সই করল সোহেল। 'ধন্যবাদ, ইন্সপেক্টর। আপনি তো জানেনই যে আন্তর্জাতিক একটা ইনভেস্টিগেটিং এজেন্সি চালাই আমরা, সেটার সবচেয়ে বড় শাখা লন্ডনে। যে মন্ত্রণালয় আমাদেরকে লাইসেন্স দিয়েছে তারা আমাদের অন্যতম উপদেষ্টার কিডন্যাপ হওয়াটাকে ভাল চোখে দেখছে না।'

'যেহেতু তিনি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ ব্যক্তি, একজন সাবেক মেজর জেনারেল...'

'শুধু সেজন্যে নয়, সংশ্লিষ্ট মন্ত্রণালয় মনে করছে এই ঘটনার ফলে ব্রিটিশ সমাজে রটে যাবে আইন-শৃংখলা পরিস্থিতির মারাত্মক অবনতি ঘটেছে।'

'ও। তা হলে?'

'একটা মীটিং ডাকা হয়েছে,' বলল সোহেল। 'সেটা সারারাত ধরেও চলতে পারে বলে আশঙ্কা করছি। যে বিষয়েই কথা হোক, আপনাকে বিব্রত হতে হবে বলে মনে হয় না। তবে সশরীরে উপস্থিত হয়ে আপনি যদি কমপ্লিট পুলিসী রিপোর্টটা পেশ না করেন, কেউ একজন অভিযোগ করে বসতে পারে। আশা করি বুঝতে পারছেন আমি কি বলতে চাইছি।'

'জ্বী, সার, পারছি,' মাথা ঝাঁকিয়ে বললেন ইন্সপেক্টর হারমান। 'মিনিট দুই সময় দিন, প্লিজ। তারপরই আপনাদের হাতে তুলে দেব নিজেকে।'

'আপনাকে আর আমরা ব্যাখ্যা করে বোঝাবার ঝামেলায় যাচ্ছি না যে গোটা ব্যাপারটা পুরোপুরি চেপে রাখতে হবে। টেলিফোন কর্তৃপক্ষকে জানিয়ে দিন আপনার লোকজন এই জায়গা ছেড়ে চলে গেলে ফোন লাইন যেন বিচ্ছিন্ন করে দেয়া হয়। আপনার লোকজন আর আপনি যা করেছেন, সেজন্যে অসংখ্য ধন্যবাদ, মিস্টার হারমান। আমরা আপনার জন্যে বাইরে অপেক্ষা করছি।'

'আমি ছাড়া এই স্টেশনের সব স্টাফ নতুন, সার,' সবিনয়ে বললেন ইসপেক্টর। 'ওরা জানেই না রানা এজেন্সি শুধু স্কটল্যান্ড ইয়ার্ডকে নয়, লোকাল পুলিসকেও কত বছর ধরে কতভাবে সাহায্য করে আসছে। জানলে আরও

তাড়াতাড়ি খবর দিত আমাকে।'

'তবু যথেষ্ট করেছে ওরা,' বলল রানা, এখনও খানিকটা নির্জীব দেখাচ্ছে ওকে।

হল ছেড়ে অন্দরমহলের দিকে চলে গেলেন ইন্সপেক্টর। ওরা উল্টোদিকের দরজার দিকে এগোল। মেঝেতে পড়ে থাকা লাশটার দিকে চোখ পড়ল রানার। যখন জীবিত ছিল তখনকার কথা আলাদা। সকল অর্থেই ওটা এখন স্রেফ একটা আবর্জনা, সরিয়ে ফেলার জন্য ফেলে রাখা হয়েছে, পুরোপুরি তাৎপর্যহীন; এখন আর কোন মূল্য নেই। কিন্তু এখনও প্রায় গোপন হয়ে থাকা যে উদ্দেশ্য লোকটাকে এই বাড়িতে টেনে এনেছিল; সেটাকে ভয় পাচ্ছে রানা, ঘৃণাও করছে–তারপরও যখন চিন্তা করল যে নগণ্য কোন কারণে অকালে চলে যেতে হয়েছে তাকে, তখন করুণ একটা অনুভূতিকে দমিয়ে রাখতে পারল না। এভাবেই কি একদিন মাসুদ রানার পরিসমাপ্তি ঘটবে, মাথায় গুলি বিদ্ধ, নোংরা ও পরিত্যক্ত কাপড়ের একটা স্তূপের মত ফেলে রাখা হবে এক ধারে?

শেষ গ্রীষ্মের মখমল সদৃশ আকাশে ঝাঁকে ঝাঁকে উজ্জ্বল তারা এসব চিন্তা মাথা থেকে বের করে দিল। এই আবহাওয়ায় প্লেন খুব ভাল উড়বে। বসকে ওরা কোথায় নিয়ে যাচ্ছে? আপাতত এটা নিয়ে চিন্তা করে কোন লাভ নেই, কারণ নিরেট কোন তথ্য না পাওয়া পর্যন্ত উপসংহার বা সিদ্ধান্তে পৌঁছানো যাবে না। রাতের বাতাসে সামান্য ঠাণ্ডা আছে। রানা টের পেল ওর খিদে লেগেছে। এটাও মাথা থেকে ঝেড়ে ফেলে দাও। অন্তত লন্ডনে না পৌঁছে কিছু খাওয়ার প্রশ্ন ওঠে না।

দ্রুত পা ফেলে সোহেলকে পিছনে ফেলল রানা, নিজের সিট্রোঁর দিকে এগোচ্ছে। মনে হলো একশো বছর আগে যেখানে পার্ক করেছিল সেখানেই দাঁড়িয়ে রয়েছে গাড়িটা।

পিছন থেকে ওর কাঁধে একটা হাত রাখল সোহেল। 'না, দোস্ত। তুই আমার গাড়িতে উঠছিস। তোর গাড়ি কাল আমি পৌঁছে দেওয়ার ব্যবস্থা করব।'

'ননসেন্স, আমি সম্পূর্ণ সুস্থ।'

'তাছাড়া, আমরা জোর দিয়ে বলতে পারি না তোর গাড়িতে কোন ফাঁদ পাতা নেই বা বোমা রাখা হয়নি।'

'এটাও ননসেন্স, সোহেল। ওরা আমাকে জীবিত আর অক্ষত অবস্থায় ধরতে চেয়েছিল।'

'তখন চেয়েছিল। তুই জানিস, এখন তারা কি চাইছে?'

চার

সংশ্লিষ্ট মন্ত্রণালয়ের মন্ত্রী মহোদয়, একজন 'সার', এক অস্ট্রিয়ান প্রিন্সেস-এর দেয়া ডিনার পার্টিতে ছিলেন; যার অভিজাত বন্ধু-বান্ধব মহলে ঢোকার জন্য দীর্ঘ কয়েক বছর ধরে কাঠখড় পোড়াচ্ছেন ভদ্রলোক। পরিচয় পর্ব মাত্র শুরু হতে

যাচ্ছে, এই সময় ১০ নম্বর ডাউনিং স্ট্রীট থেকে জরুরী টেলিফোন। যিনিই ফোনটা করে থাকুন, প্রথমেই তিনি বলে রাখলেন–তাঁর পরিচয় এবং বক্তব্য দুটোই গোপন রাখতে হবে।

জবাবে মন্ত্রী মহোদয় অনিচ্ছাসত্ত্বেও রাজি হলেন। এরপর ঝাড়া পাঁচ মিনিট ১০ নম্বর ডাউনিং স্ট্রীট-এর বক্তব্য শুনলেন তিনি। পরবর্তী পাঁচ মিনিট কাটালেন প্রিন্সেস-এর কাছ থেকে বিদায় নিতে। ফোন কল পাওয়ার বিশ মিনিটের মাথায় পৌঁছালেন নিজের মন্ত্রণালয়ে। ইতোমধ্যে রাতের বয়স হয়েছে একটা বাইশ মিনিট। তাঁর আগেই নাটকের বাকি কুশীলবরা পৌঁছে গেছেন।

কি ঘটেছে সব তাঁকে সবিস্তারে জানানো হলো। তাঁর প্রতিক্রিয়া হলো ক্রোধ মেশানো অবিশ্বাস, পুরানো ওক টেবিলের চারপাশে বসা কর্মকর্তাদের দিকে এমন ভাবে তাকাচ্ছেন, তাঁরা সবাই যেন চিড়িয়াখানার জন্তু: তাঁর মন্ত্রণালয়ে স্থায়ী আন্ডার-সেক্রেটারি, স্কটল্যান্ড ইয়ার্ডের অ্যাসিস্ট্যান্ট কমিশনার সিসিল হবস্, মাসুদ রানা নামে একজন কালা আদমি–কথার চাবুক মেরে যার চামড়া ছেলার দায়িত্ব দেয়া হয়েছে তাঁকে–মাসুদ রানার সহকর্মী হিসেবে আরেক কালা আদমি ও উইন্ডসর থেকে আসা একজন পুলিস ইন্সপেক্টর।

'তো, ভদ্রমহোদয়গণ–বলিহারি!' তাঁর ভারী গলা গমগম করে উঠল। 'একে যদি তামাশা না বলি তো কাকে বলব! আপনাদের জ্ঞাতার্থে জানাচ্ছি, ব্যাপারটা প্রধানমন্ত্রীর কানেও তুলতে হবে আমাকে। মেজর জেনারেল রাহাত খান! ব্রিটেনের সমরনায়কদের ঘনিষ্ঠ বন্ধু, রাজনীতিকদের প্রাণপ্রিয় সুহৃদ! চিকিৎসা করতে এসে নিজের বাড়ি থেকে কিডন্যাপ হয়ে গেলেন? এ লজ্জা আমরা রাখব কোথায়!'

সোহেল কথা বলছে হাতঘড়ির ওপর চোখ রেখে, 'আপনাদের প্রাইম মিনিস্টার তো এই মুহূর্তে হিথরো থেকে প্লেনে উঠছেন। প্রেসিডেন্ট বুশ ডেকেছেন, সকালে দু'জন ব্রেকফাস্ট খাবেন হোয়াইট হাউসে। মিস্টার মিনিসটার, যা বলবার বা করবার, তাঁকে ছাড়াই করতে হবে আপনার।'

'বলব তো বটেই! আর কী করব সে-ও আমার মনই জানে! প্রথম কথা, ইনফরমেশন হিসেবে ধরা যায় এমন কিছুই আপনাদের কাছে নেই। অদ্ভুত!' রানার দিকে তাকালেন মন্ত্রী। 'যে লোকটাকে আপনি গুলিবিদ্ধ অবস্থায় পেয়েছেন তার কথাই ধরুন। চাকরটার কথা বলছি না, আল কায়দার সদস্য বা তালেবান গুপ্তঘাতকটার কথা বলছি। লোকটা সম্পর্কে আপনারা শুধু বলতে পারছেন একটা বুলেট খুলি উড়িয়ে দেয়ায় তার মৃত্যু হয়েছে। এর নাম কি তদন্ত? এই কাণ্ডজ্ঞান নিয়ে আপনারা একটা এজেন্সি চালান?'

'লোকটা আমেরিকান, শ্বেতাঙ্গ,' বলল সোহেল। 'আল কায়দার সদস্য বা তালেবান গুপ্তঘাতক হওয়ার কোন সম্ভাবনাই নেই।'

'আমি রানা এজেন্সির ডিরেক্টরকে প্রশ্ন করতে চাই, আপনারও কি এই মত, মিস্টার রানা?' মন্ত্রীর গলা চড়ছে।

মাথা ঝাঁকাল রানা। 'হ্যাঁ। কিছু যদি মনে না করেন, আপনি বেফাঁস কথাবার্তা বলছেন।'

'লাশের গায়ের রঙ সাদা, ওটা মেকআপ কিনা পরীক্ষা করা হয়েছে কি?' মন্ত্রীর কণ্ঠে ঝাঁঝ। 'আল কায়দার কিছু সদস্যকে ব্রিটেনের বিভিন্ন এলাকায় গ্রেফতার করা হয়েছে, যাদেরকে প্রথমে শ্বেতাঙ্গ বলে মনে করা হয়েছিল। পরে চামড়ায় আঙুল ঘষে প্রমাণ করা হয়েছে যে গায়ে সাদা রঙ মেখে শ্বেতাঙ্গ সেজেছিল তারা। এক্ষেত্রে সেরকম কিছু ঘটেছে কিনা তা আমরা বুঝব কীভাবে?'

'তোর আর ওই লোকটার গায়ের রঙ হুবহু একই রকম, নিজেরটা ঘষে দেখ রঙ ওঠে কিনা,' বলল রানা, 'তাহলেই জানতে পারবি।'

মন্ত্রী রুষ্ট হলেন। 'যে ভাষা আমরা কেউ জানি না সে ভাষায় বিড় বিড় করা অভদ্রতা...'

সোহেল তাড়াতাড়ি বলল, 'মিস্টার রানা বলছেন, আমেরিকার পররাষ্ট্রমন্ত্রী মিস্টার ব্লেয়ার লন্ডনে থাকলে ভাল হত...'

'এই যার জ্ঞানের পরিধি, সে তার বসকে বাঁচাবে কীভাবে!' মন্ত্রী মহোদয়ের বিষম খাওয়ার অবস্থা। 'মিস্টার টনি ব্লেয়ার গ্রেট ব্রিটেনের প্রধানমন্ত্রী, আমেরিকার পররাষ্ট্র মন্ত্রীর নাম কলিন পাওয়েল...'

'কিন্তু ইরাক দখল করবার আগে থেকেই লন্ডনের অনেক দৈনিকে বারবার মিস্টার ব্লেয়ারকে মার্কিন পররাষ্ট্রমন্ত্রী বলে উল্লেখ করা হয়েছে। এমন কি একটা দৈনিকের কার্টুনে দেখানো হয়েছিল প্রেসিডেন্ট বুশের প্রিয় একটা কুকুরের মুখ অবিকল মিস্টার ব্লেয়ারের মত। তাতে কুকুরটাকে প্রেসিডেন্ট বুশ বলছেন, "টনি", আটলান্টিকের এপারেই থেকে যাও তুমি, কলিন পাওয়েলের জায়গায় তোমাকে বসিয়ে দিই।' কুকুরটা মনিবের পা চাটছিল আর বলছিল, "পদের লোভ না করেই পদলেহন আমার স্বভাব, হুজুর।" এ-সব তো সাধারণ লোকজনও জানে। আপনি মন্ত্রী, আপনিও নিশ্চয় জানেন।'

রাগ সামলে নেওয়ার জন্য কয়েক সেকেন্ড সময় নিলেন মন্ত্রী।

'ব্রিটেনে গণতন্ত্র আছে, একজন কার্টুনিস্ট যা খুশি আঁকতে পারে বা তার তৈরি চরিত্রকে দিয়ে যা খুশি বলাতে পারে। আমরা এখানে কার্টুনিস্ট বা তার চরিত্র নিয়ে আলাপ করতে বসিনি। বসেছি মিস্টার মাসুদ রানাকে ইন্টারোগেট করতে।'

'হোয়াট?' সোহেল স্তম্ভিত।

'আপনার উপস্থিতিতে মিস্টার খান কিডন্যাপ হয়েছেন, মিস্টার রানা। আপনার এই ব্যর্থতাকে আমরা অত্যন্ত গুরুত্বের সঙ্গে নিচ্ছি। আগামী আটচল্লিশ ঘণ্টার মধ্যে জানতে পারবেন রানা এজেন্সির লাইসেন্স বাতিল করা হয়েছে...'

'সার!' এতক্ষণে কথা বললেন স্কটল্যান্ড ইয়ার্ডের অ্যাসিস্ট্যান্ট কমিশনার সিসিল হবস্। 'মিস্টার রানা বা তাঁর এজেন্সির সম্পর্কে আপনার কাছে বোধহয় প্রয়োজনীয় তথ্য ইত্যাদি নেই, তাই একটা ভুল বোঝাবুঝির ঘটনা ঘটছে...'

'আপনি চুপ করুন তো!' ধমকে উঠলেন মন্ত্রী। 'কোথাও কোন ভুল বোঝাবুঝির ঘটনা ঘটছে না। মিস্টার রানার ব্যর্থতা অক্ষমনীয়, আপনাকে আমি নির্দেশ দিচ্ছি–অ্যারেস্ট হিম!'

অকস্মাৎ ঠাণ্ডা ও নীরব হয়ে গেল কনফারেন্স রূম। পিন-পতন নিস্তব্ধতা নেমে এসেছে। স্কটল্যান্ড ইয়ার্ডের অ্যাসিস্ট্যান্ট কমিশনার আমতা আমতা করে বললেন, 'আপনি যখন অর্ডার দিচ্ছেন, মিস্টার রানাকে অবশ্যই আমি অ্যারেস্ট করব। তবে, সার, মীটিংটা আমরা আগে শেষ করি?' জবাবের অপেক্ষায় না থেকে তিনি তাঁর বক্তব্য বলে যাচ্ছেন, 'লাশটার গায়ে কোন রঙ নেই, থাকলে যে ডাক্তাররা পরীক্ষা করেছেন তাঁরা ধরতে পারতেন। এই লোকের ক্রিমিন্যাল রেকর্ডও পাওয়া যাবে না বলে আমার ধারণা–তা পাওয়ার সম্ভাবনা থাকলে কিডন্যাপাররা নিজেদের সর্বনাশ করবার জন্য লাশটা ওখানে ফেলে রেখে যেত না।'

'আমি আপনার সঙ্গে একমত,' বলল সোহেল।

'মুক্তিপণও তো চাওয়া হয়নি, তাই না?' জেনেও না জানার ভান করছেন মন্ত্রী।

'না, সার,' এই প্রথম মুখ খুললেন ইন্সপেক্টর হারমান। মন্ত্রীর অযৌক্তিক হম্বিতম্বি দেখে সবার মত তিনিও হকচকিয়ে গেছেন। 'তবে আমার দু'একটা কথা আছে, যদি অনুমতি পাই...'

'বলুন, ইন্সপেক্টর, বলে ফেলুন।' চেয়ারে হেলান দিয়ে উদার ভঙ্গিতে হাত নাড়লেন মন্ত্রী। 'মোস্ট ওয়েলকাম। তবে মিস্টার রানার হয়ে কোন সুপারিশ করবেন না, প্লিজ। কিডন্যাপারদের সহযোগিতা করার অভিযোগে আপনি তাঁকে গ্রেফতার করেছেন, এটাই আমি দেখতে চাই। অপরাধটা যেহেতু আপনার এলাকায় ঘটেছে।'

'আমি মিস্টার রানা সম্পর্কে এখনি আপনাকে কিছু বলতে চাইছি না, সার। এর আগে আমরা সবাই যে কাগজটা দেখেছি সেটার কথা বলছি। যেটায় নাম আর সংখ্যা আছে।'

'অ।'

'কাগজটা আমরা লাশের মানিব্যাগ থেকে পেয়েছি, মোচড়ানো অবস্থায় এক কোণে পড়েছিল। সাইফার এক্সপার্টরা এর একটা কপি নিয়ে কাজ করছে ঠিকই, কিন্তু তাতে লেখালেখি এত সামান্য যে সময়ের অপচয়ই সার হবে বলে আমার ধারণা। তারচেয়ে আমরা বরং আরেকবার চোখ বুলাতে পারি। এ-কথা এজন্যে বলছি, আমরা কি সংখ্যাগুলোকে একবারও টেলিফোনের নম্বর হিসেবে বিবেচনা করেছি?'

মাথা নাড়ল সোহেল। 'ওটার মধ্যে কিছু আছে বলে মনে হয় না, ইন্সপেক্টর হারমান।' হাতের উল্টোপিঠ দিয়ে চোখ রগড়াল। 'ক্রিস্টিয়ানা নরওয়েতে হয়ে যায় ক্রিস্টিয়ানিয়া। আর "VASSO" উত্তর-পুব ফ্রান্সে হয়ে যেতে পারে "VASSY"। আর প্যারিস কোথায় তা তো আমরা সবাই জানি। খোঁজ নিতে একজন সাধারণ মানুষের দশ মিনিটও লাগবে না যে সংখ্যাগুলো এই তিন জায়গার একটা টেলিফোন এক্সচেঞ্জেরও নয়। একান্তই যদি ওগুলো টেলিফোন নম্বর হয়ে থাকে, সংখ্যাগুলো কোড–যা ভাঙার কোন পদ্ধতি আমাদের জানা নেই।'

'ম্যাপ রেফারেন্স হতে পারে কি?' প্রশ্ন করলেন আন্ডার-সেক্রেটারি।

মাথা নাড়ল সোহেল। 'সংখ্যার সমষ্টি মেলে না।'

'আসলে, সার,' ইন্সপেক্টর হতাশ হতে রাজি নন, নিজের কথা বলবেনই, 'আমি ঠিক তা বোঝাতে চাইছি না। যে শব্দটা আমরা উল্লেখ করিনি সেটার কথা ধরুন–অ্যান্টিগোনে। এটার অর্থ কী?'

'গ্রিক নাটক,' বলল সোহেল। 'সোফোক্লিস, তাই না? আল্লাহ্ই বলতে পারবে কীসের কোড ওয়ার্ড।'

'হ্যাঁ, কোড ওয়ার্ড হওয়ার সম্ভাবনা আছে, সার। কিন্তু অ্যান্টিগোনে শুধু একটা গ্রিক প্লে নয়, এটা একটা গ্রিক নামও। এক মহিলার নাম। আজও ওদিকে এই নামের চল আছে কিনা আমি জানি না, তবে এ-ধরনের ক্লাসিকাল অনেক নাম আমার জানা আছে। এবার ক্রিস্টিয়ানা। এটাও একটা মেয়ের নাম মনে হয় না–ক্রিস্টাইন আর ক্রিস্টিনার মত? ক্রিস্টিয়ানা একটা গ্রিক নাম হতে পারে। এবং প্যারিস, আমরা সবাই জানি, আরেকটা গ্রিক নাম।'

অকস্মাৎ লাফ দিয়ে চেয়ার ছাড়ল সোহেল, টেলিফোনের দিকে ছুটছে। সেটা কনফারেন্স টেবিলের মাথায়, যেখানে হাড়গিলে চেহারা নিয়ে মন্ত্রী মহোদয় বসে আছেন। 'কিন্তু VASSO-এর ব্যাপারটা বুঝছি না…'

'আপনার মতলবটা কী, ইন্সপেক্টর?' শকুনের মত গলা লম্বা করে জানতে চাইলেন মন্ত্রী। 'অপ্রাসঙ্গিক বিষয় টেনে এনে আপনি মূল সমস্যা থেকে আমার দৃষ্টি অন্য দিকে ঘুরিয়ে দিতে চাইছেন? মিস্টার রানাকে অ্যারেস্ট আপনার করতেই হবে…'

'আমরা আমাদের পেশা আর দায়িত্ব নিয়েই কথা বলছি, সার। যার পকেট থেকে কাগজটা পাওয়া গেছে সে গ্রিসে যাচ্ছিল। তার কাছে কারও ফোন নম্বরও ছিল, নারীসঙ্গের প্রয়োজন হলে যাতে ব্যবস্থা করতে পারে। এই ফোন নম্বরগুলো কোন অজ্ঞাত এক্সচেঞ্জের। তবে ধরে নিতে হবে খুব বড় কোন এক্সচেঞ্জের। হ্যাঁ, এথেন্সেরও হতে পারে। অন্তত এটাই আমাদেরকে বোঝাতে চাওয়া হয়েছে, সার।'

'আপনি আবারও আসল প্রসঙ্গ এড়িয়ে যাচ্ছেন, ইন্সপেক্টর,' প্রায় খেঁকিয়ে উঠলেন 'সার'। 'আমি আপনাকে বলেছি মিস্টার রানাকে অ্যারেস্ট করতে হবে! অথচ আপনি আমাকে শেখাচ্ছেন প্যারিস একজনের নাম…'

'সত্যি সার, নামই; ট্রয়-এর হেলেনকে অপহরণ করেছিলেন তিনি। এই ব্যক্তিই ট্রোজান ওঅর শুরু করেছিলেন। তবে আপনি যদি আরেকবার তাকান…' লাইন টানা সস্তাদরের কাগজের টুকরোটা বাড়িয়ে ধরলেন ইন্সপেক্টর হারমান।

ছুঁই কি না ছুঁই এরকম ভাব নিয়ে মস্ত একটা হাঁচি দিলেন 'সার'। কাগজটা ইন্সপেক্টরের হাত থেকে উড়াল দিতে ছোঁ দিয়ে ধরেও ফেললেন। 'এর মধ্যে দেখবার কী আছে?' আড়চোখে লক্ষ করলেন, ক্রেডল সহ ফোনটা নিয়ে বেশ খানিক দূরে সরে গেছে সোহেল।

'প্যারিস-এর ঠিক সরাসরি ওপরে তাকান, সার…একদমই পরিষ্কার নয়, কিন্তু আমার যেন মনে হচ্ছে– "ইফ সাপ্লাইজ ফেইল" বা "ফল"। যদি

অ্যান্টিগোনে আর বাকি দু'জন না থাকে, কিংবা ওদেরকে তার হয়তো পছন্দ হলো না বা অন্য কিছু, তা হলে প্যারিস তার একটা ব্যবস্থা করতে পারবে।'

'হুম।' চোখ থেকে খুলে চশমার ডাঁটি চিবাচ্ছেন মন্ত্রী। তাঁর দৃষ্টি দ্রুত একবার সোহেলের দিকে ছুটে গেল। তারপর গালে হাত দিয়ে বসে থাকা অন্য জগতের বাসিন্দা রানাকেও একবার দেখে নিল। 'কি যেন বললেন? আমাদেরকে নাকি কিছু বোঝাতে চাওয়া হচ্ছে?'

'জ্বী, সার...'

'সবটুকু না বুঝলে হয় না?' এটুকু প্রকাশ্যে বললেন, মনে মনে আওড়ালেন, 'শালা গর্দভ!' তারপর আবার প্রকাশ্যে, তবে নিচু গলায় বললেন, 'চেপে যান।'

ইন্সপেক্টর নিজের বিশ্লেষণে মুগ্ধ, মন্ত্রীর কথার অর্থ বোঝবার কোন গরজই অনুভব করছেন না। 'আমার দৃষ্টিতে, সার, এটা রোপণ করা হয়েছে। বলতে চাইছি–টোপ। আর যদি নির্ভেজাল হয়, তিন-তিনটে গাফলতির কারণে বা দূরদৃষ্টির অভাবে এটা আমাদের হাতে এসেছে–লাশ সরানো হয়নি, পকেটগুলো খালি করা হয়নি, পকেট এমনকি সার্চও করা হয়নি।'

'অর্থাৎ বিভ্রান্ত করাই ছিল উদ্দেশ্য?'

'না, সার, বরং ঠিক উল্টো। এটা সোজাসুজি গ্রিসের দিকে অঙ্গুলি নির্দেশ–যথেষ্ট পরিষ্কার, আবার খুব বেশি পরিষ্কারও নয়।'

টেলিফোনে আলাপ সেরে কনফারেন্স টেবিলে ফিরে এলো সোহেল। যন্ত্রটা যথাস্থানে রেখে নিজের চেয়ারে বসল, ইন্সপেক্টরের দিকে সমীহভরা দৃষ্টিতে তাকিয়ে আছে। 'চারটেই আধুনিক গ্রিক ফার্স্ট নেম হিসেবে ব্যবহার করা হয়, গ্রিক দূতাবাসের কালচারাল অ্যাটাশে অ্যালেকজান্ডার মাকারিয়স অন্তত তাই বললেন। আর সংখ্যার সমষ্টিগুলো এথেন্স, সালোনিকা বা অন্য আরও বড় দুটো শহরের টেলিফোন নম্বর হতে পারে।'

'গোটা ব্যাপারটা এখন এমনকি স্কটল্যান্ড ইয়ার্ডও সামলাতে পারবে না, উইন্ডসর পুলিস তো নয়ই,' উল্লাস চেপে রাখতে না পেরে চেয়ার ছেড়ে প্রায় দাঁড়িয়ে পড়লেন মন্ত্রী। 'এই কেসের তদন্ত যেহেতু বিদেশে হবে, এর দায়িত্ব নেবে ব্রিটিশ জাতির গর্ব জেমস বন্ড–ব্রিটিশ সিক্রেট সার্ভিসের এজেন্ট, জিরো-জিরো-সেভেন।'

মিনিট পনেরো আগে শেষবার কথা বলে মাথায় হাত দিয়ে বসে আছে রানা, নড়াচড়া করছে না দেখে মনে হতে পারে আধো ঘুমের মধ্যে রয়েছে। আসলে তা নয়। সবার সব কথাই শুনছে ও, মগজটাকেও বিশ্লেষণের বিরতিহীন কাজ দিয়ে খাটিয়ে মারছে। টেবিলে হাত নামিয়ে মন্ত্রীর দিকে তাকাল ও। 'বিএসএস-এর চীফ আমাকে ইরাক থেকে ফোন করেছিলেন। তিনি এই কেস সম্পর্কে আগ্রহী নন। বলেছেন, রানা এজেন্সি যেন কারও ওপর ভরসা না করে।'

'কে? কার কথা বলছেন?' খেঁকিয়ে উঠলেন মন্ত্রী।

'বিএসএস চীফ।'

'বিএসএস মানে? ব্রিটিশ সিক্রেট সার্ভিস?' ধমকের সুর একটু যেন কম চড়া।

'হ্যাঁ।'

‘চীফ···মারভিন লংফেলো? আপনি তাঁকে চেনেন? পরিচয় আছে?’

মাথা ঝাঁকাল রানা। ‘হ্যাঁ।’

‘কি বলছেন উনি?’ পালা করে স্কটল্যান্ড ইয়ার্ডের অ্যাসিস্ট্যান্ট কমিশনার, আন্ডার সেক্রেটারি আর ইন্সপেক্টরের দিকে তাকালেন। ‘ওঁর কথা কি সত্যি বলে ধরে নেব আমরা?’

‘নিলেই ভাল,’ বললেন স্কটল্যান্ড ইয়ার্ডের কর্মকর্তা। ‘কারণ মিস্টার রানা যে-টুকু বলছেন, তারচেয়ে অনেক বেশি তাৎপর্যপূর্ণ যে-টুকু বলছেন না।’

‘তারমানে?’

‘মিস্টার রানা ব্রিটিশ সিক্রেট সার্ভিসের একজন অনারারি অ্যাডভাইজার।’

মন্ত্রী চেয়ার ছাড়লেন। উল্লাসে লাফাননি। পরাজিত, বিভ্রান্ত, বিহ্বল এবং সন্ত্রস্ত দেখাচ্ছে। তবে গলার আওয়াজ আগের চেয়েও কর্কশ। ‘মীটিং এখানেই শেষ করা হলো। সংশ্লিষ্ট সবাইকে নির্দেশ দিচ্ছি, মিস্টার রানাকে সব রকম সাহায্য করবেন।’ ঘুরে দাঁড়িয়ে কনফারেন্স রূম ছেড়ে বেরিয়ে যাচ্ছেন। তাঁর পিছু নিলেন আন্ডার সেক্রেটারি।

মন্ত্রী বিদায় নেওয়ার পর কামরার ভেতর বিব্রতকর একটা নীরবতা নেমে এলো। তবে কয়েক সেকেন্ড পরই খুক করে কেশে অস্বস্তির ভাবটা কাটিয়ে উঠতে সাহায্য করল সোহেল। তারপর রানাকে বলতে শোনা গেল, ‘ইন্সপেক্টর হারমান ঠিক বলেছেন। এটা একটা টোপই। নিজেদের প্ল্যানে আমাকে জড়াবার প্রচণ্ড ইচ্ছে ছিল ওদের। বোঝা যাচ্ছে সে ইচ্ছেটা এখনও প্রবল। ছেঁড়া একটুকরো কাগজে অস্পষ্টভাবে লেখা কয়েকটা নাম আর সংখ্যা এলোমেলোভাবে সাজানোর উদ্দেশ্য হলো ওদের পিছু নিতে আমাকে প্ররোচিত করা। পিছু আমি নেবও। নিতেই হবে আমাকে।’

ধীরে ধীরে মাথা ঝাঁকাল সোহেল, সমর্থন করল রানার সিদ্ধান্ত। ‘কোত্থেকে শুরু করবি?’

‘যে-কোন জায়গা থেকে শুরু করা যায়,’ বলল রানা। ‘ধর এথেন্স থেকেই করলাম। কিছু আসে যায় না, কারণ ওদেরকে আমার খুঁজে বের করতে হবে না। ওরাই আমাকে খুঁজে নেবে।’

পাঁচ

ড্রাকোনিসি দ্বীপটা গ্রিসের দক্ষিণ-পুব আর তুরস্কের দক্ষিণ-পশ্চিমে মাঝামাঝি জায়গায়; আরও পরিষ্কার করে বললে–তিনটে বড় দ্বীপ ন্যাক্সস, আয়ওস আর প্যারস যে ত্রিভুজ তৈরি করেছে, সেটার ঠিক মাঝ বরাবর। আরও দূর প্রতিবেশী, ত্রিশ মাইল দক্ষিণ-পশ্চিমের সানটোরিনি-র মত ড্রাকোনিসিও অগ্নিগর্ভা। প্রাগৈতিহাসিক যুগে বিলুপ্ত সুবিশাল একটা আগ্নেয়গিরির গামলা আকৃতির মুখ-গহ্বরের অবশিষ্ট অংশ এটা। প্রাচীন কালে ঘন ঘন অগ্নি উদ্গিরণের ফলে দ্বীপটা

এবড়োখেবড়ো একটা চেহারা পেয়েছে, সঙ্গে আছে অর্ধবৃত্ত আকৃতির বেঢপ পাথুরে শিরদাঁড়া বা ঢাল, কোথাও কোথাও বারোশো ফুট পর্যন্ত উঁচু। আকাশ থেকে তাকালে বেহেড কোন মাতালের হাতে বাগিয়ে ধরা কাস্তের ফলা বলে মনে হবে ড্রাকোনিসিকে। ফলাটার ডগা ভেঙে যাওয়ায় উত্তর প্রান্তে দ্বীপের মূল শরীর আর নামবিহীন একটা আইলিট বা খুদে দ্বীপের মাঝখানে একশো গজ লম্বা অগভীর ঈজিয়ান সাগর পাওয়া যাবে। আইলিটে কেউ বসবাস করে না, তবে জেলেদের কয়েকটা কটেজ ছাড়াও ওখানে একটা বাড়ি আছে। একেবারে শেষ মাথায় লম্বা ও নিচু পাথুরে কাঠামো, ধবধবে সাদা রঙ করা, পাম আর ক্যাকটাসের ভিড়ে প্রায় দেখাই যায় না। বাড়ির মালিক পাইরাউস-এর একজন ইয়ট বিল্ডার, গরমের দিনে বিদেশী ভিজিটরদের ভাড়া দেয়।

চলতি গ্রীষ্মে যে দুই ব্যক্তি বাড়িটার দখল পেয়েছে পাসপোর্টে তাদেরকে পাকিস্তানী বলে উল্লেখ করা হয়েছে; রাশভারী প্রকৃতির মানুষ, কথা বলতে অনিচ্ছুক, গায়ের চামড়া বলে দেয় সূর্যের সংস্পর্শে খুব একটা আসা হয় না। আচরণেও খানিকটা আড়ষ্ট ভাব লক্ষণীয়। ম্লান ও আনাড়ি লাগে রঙচঙে বেদিং সুটে, মাঝে মধ্যে দেখা যায় ছোট্ট প্রাইভেট অ্যাঙ্কারিজ-এর ওপর ক্যানভাস চেয়ারে হাত পা মেলে দিয়ে পড়ে আছে, কিংবা হয়তো নিচে নেমে এসে থমথমে চেহারা নিয়ে দু'চার মিনিট সাঁতার কাটছে। অ্যাঙ্কারিজ এখন পর্যন্ত খালিই। কারও আসা-যাওয়া চোখে পড়ে না। মানুষ দু'জনকেও বেশিরভাগ সময় দেখতে পাওয়া যায় না। ভাবসাব দেখে মনে হয় কিছু একটা করবার আগে সময় পার করছে তারা।

তাদের আসল পরিচয়, জাতীয়তা এবং উদ্দেশ্য খুব ভাল করেই জানে সিআইএ-এর অন্যতম কর্মকর্তা কর্নেল আব্রাহাম ময়নিহান। দ্বীপের মূল অংশে ছোট একটা বাড়ির জানালার সামনে বসে আছে সে। আইলিট-এর দুই ব্যক্তি তার দৃষ্টিপথে পড়ে না। তুলনায় এই ছোট বাড়িটায় পৌঁছানো অনেক বেশি কঠিন। আইলিটে তারা কোথায় আছে বা কী করছে দেখতে হলেও বাইরে বেরুতে হবে তাকে, জঙ্গলে ঢাকা পাহাড় বেয়ে সী-লেভেল থেকে প্রায় আড়াইশো ফুট ওপরে উঠে আরেক ঢালের নিচে তাকাতে হবে, তারপর দেখা মিলবে জলের বিস্তৃতি আর প্রায় এক কিলোমিটার দীর্ঘ আইলিট। তবে কাল রাতে জলপথে এখানে পৌঁছানোর পর এখন পর্যন্ত একবারও বাইরে বের হয়নি কর্নেল ময়নিহান। ছ'ফুট এক ইঞ্চি লম্বা সে, গায়ের রঙ ফর্সা না বলে লাল বলাই ভাল, চেহারায় নগ্ন মার্কিনি বৈশিষ্ট্য অতিমাত্রায় স্পষ্ট। সেজন্যেই তার এই সাবধানতা।

কাঠের শক্ত চেয়ারে বসে আছে কর্নেল, জানালার বাইরে ধীরে ধীরে নামছে অন্ধকার। অবসর সময়ে একা থাকলে বই নিয়ে বসে সে, তবে আজ রাতে প্রায় ধ্যানমগ্ন হয়ে ভাবছে আর উপলব্ধি করবার চেষ্টা করছে সামনে কী ঘটতে চলেছে। দু'বার দুটো সিগারেট ধরাল, একবারও ধোঁয়া না গিলে ঠোঁটের ফাঁকে ধরে রেখে পুড়ে যেতে দিল।

ল্যাঙলি, সিআইএ হেডকোয়ার্টার-এর যে ইন্টারোগেশন সেল গত এক যুগ ধরে ইরাকী স্পাই, তালেবান আর আল কায়দা বন্দিদের ইন্টারোগেট করছে

সেটার চীফ ছিল কর্নেল ময়নিহান। শোনা যায় তার নির্যাতনে একশোরও বেশি বন্দি বিনা বিচারে খুন হয়ে গেছে ওই কুখ্যাত সেলে। যারা মারা গেছে তাদের মধ্যে মুসলিম বিশ্বের লোকজনই বেশি, তবে বাংলাদেশের কোন লোক নেই। ময়নিহানের বয়স পঞ্চাশ হলেও, দেখলে মনে হয় বড়জোর পঁয়ত্রিশ। তার অ্যামবিশন হলো, সিআইএ চীফ হিসেবে অবসর নেওয়ার পর কোন এক স্টেট-এর গভর্নর, তারপর দেশের প্রেসিডেন্ট পদে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করা। সেজন্যেই বিশ্ব রাজনীতির ওপর প্রচুর পড়াশোনা করতে হয় তাকে। অন্ধ মার্কিনি দেশপ্রেমে উদ্বুদ্ধ সে; একমাত্র সুপারপাওয়ার হওয়ার দম্ভে আচ্ছন্ন দৃষ্টিতে দুনিয়াটাকে দেখতে অভ্যস্ত। কালোদের প্রাপ্য স্রেফ ঘৃণা–তবে অনুগত কালোদের কিছুটা করুণা করা যেতে পারে; যাদের বর্ণ পীত তাদেরকে বিশ্বাস কোরো না, আমেরিকাকে চ্যালেঞ্জ করবার জন্য গোপনে প্রস্তুতি নিচ্ছে ওরা; মুসলমানদের দাবিয়ে রাখতে হবে, ওরা অসভ্য, উগ্র আর মূর্খ; ভারতকে ঠেকাও, ওরা দ্রুত উন্নতি করছে। তার ব্যাখ্যা বিশ্লেষণ অনুসারে একমাত্র সুপারপাওয়ার হিসেবে টিকে থাকবার জন্য আমেরিকার সামনে একটাই পথ খোলা আছে–প্রিভেনটিভ ওঅর; যে শত্রু হয়ে দাঁড়াতে পারে, আক্রমণ করে তার প্রতিরক্ষা ব্যবস্থা গুঁড়িয়ে দাও। সিআইএ-তে একই সঙ্গে বিভিন্ন পদে দায়িত্ব পালন করবার সময় কর্তৃপক্ষের কাছে যে-সব নীতি-নির্ধারণী ও বিশ্লেষণধর্মী রিপোর্ট সে জমা দিয়েছে, সে-সবগুলোরই সারমর্ম হলো এই। তারই ফলশ্রুতিতে বর্তমান সিআইএ চীফ আমেরিকার অতি জরুরী ও গুরুত্বপূর্ণ স্বার্থ রক্ষার জন্য একটা অ্যাসাইনমেন্ট দিয়ে এখানে পাঠিয়েছেন কর্নেলকে। তাকে নির্বাচিত করবার পিছনে আরও একটা বড় কারণ হলো, এসপিওনাজ জগতে যে দুটি প্রতিষ্ঠানকে উজ্জ্বল নক্ষত্র বলা হয় সেই বিসিআই এবং রানা এজেন্সির ফাইলে কর্নেল ময়নিহান সম্পর্কে কোন তথ্য নেই। তবে ময়নিহান এই দুই সংস্থা সম্পর্কে প্রায় সব কিছুই জানে।

অন্ধকার ঘরে তার চোখ দুটো ঝিক করে একবার যেন জ্বলে উঠল। ব্যক্তিগতভাবে নিজের যোগ্য প্রতিদ্বন্দ্বী বলে মনে করে, এমন একজনের সঙ্গে আজ তার মোলাকাত হতে যাচ্ছে। মাসুদ রানা, ইউ আর ওয়েলকাম!

ঠিক এই সময় নক হলো দরজায়। কর্নেল ময়নিহান বলল, 'ইয়েস, প্লিজ কাম ইন।'

সদ্য খোলা দরজা ঘরের ভেতর আলোর একটা টানেল তৈরি করল। সেই আলোয় এসে দাঁড়াল এক নারীমূর্তি। একটু খসখসে গলায় জানতে চাইল, 'আলো জ্বালব, কর্নেল, সার?'

'দাঁড়াও, আগে শাটারগুলো বন্ধ করে নাও···হ্যাঁ, ঠিক আছে।'

ক্রিস্টাল ঝাড়বাতির উজ্জ্বল আলোয় উদ্ভাসিত হয়ে উঠল বিলাসবহুল সুসজ্জিত লিভিংরূম, দামি সোফা, দামি কার্পেট। তবে পাশের ঘরটা ঠিক এর উল্টো। সেখানে একটা চেয়ার আর টেবিল ছাড়া যা কিছু আছে সবই মানুষকে নির্যাতন করবার জন্য তৈরি।

সাবলিমা হেলেনের বয়স তেইশ, গ্রিসের নাগরিক। আঠারো বছর বয়েস থেকে সিআইএ-র ট্রেনিং পাচ্ছে, পার্টটাইম অপারেটর হিসেবে কিছু কিছু দায়িত্বও

তাকে দেয়া হয়। আঁটসাঁট লাল স্কার্ট আর ইন করা সাদা শার্ট পরেছে আজ, শার্টের ওপর সাদামাঠা জ্যাকেট, পায়ে এমব্রয়ডারি করা লেদার স্লিপার। ব্যস, আর কিছু না–বেশি কাপড় পরলে এই অক্ষাংশে, চমৎকার সেপ্টেম্বর রাতে, এমনকি খোলা সাগর মাত্র বিশ গজ দূরে হলেও, ভ্যাপসা গরম আর স্যাতসেঁতে লাগবে।

হেলেনের গড়নটা একহারা হলেও নিতম্ব আর বুক বৃত্তাকার ও সমৃদ্ধ। কোমর খুবই সরু। মাথার চুল কেটে ঘণ্টার আকৃতি দেয়া হয়েছে, তবে স্বভাবতই ঘণ্টার একটা দিক নেই, সেখানে রয়েছে তীক্ষ্ণ নাক আর আয়ত চোখ নিয়ে তার উন্মোচিত মুখ।

দোরগোড়ায় দাঁড়িয়ে থাকল হেলেন, জানে বেশি আগ্রহ দেখালে বস্ বিরক্ত হতে পারে। তবে নিজেকে তার হাতে সঁপে দেওয়ার সুযোগ আছে কিনা পরীক্ষা করতেই এই মুহূর্তে এখানে তার আসা। কী দায়িত্ব পালন করতে হবে, এই প্রশ্নের জবাবে কর্নেল তাকে বলেছে, 'লোকজনকে খুশি রাখবে, খেয়াল রাখবে তারা কী চায়।' 'লোকজন' বলতে কর্নেল নিজেকেও বুঝিয়েছে কিনা, সেটা তার জানতে হবে না?

'ইয়েস?'

'না, ভাবলাম আপনি কিছু খেতে চান কিনা।' কাছ থেকে শুনলে হেলেনের কণ্ঠস্বর পুরষালি আর কর্কশ লাগে কানে।

মাথার পিছনে হাত বেঁধে চেয়ারে হেলান দিল কর্নেল ময়নিহান। 'নো থ্যাঙ্ক ইউ। এখনি নয়। আমরা বরং বন্ধুদের জন্যে আরও একটু অপেক্ষা করি, কেমন? এসে পড়বে।' হাত নামিয়ে ধীরে ধীরে চেয়ার ছাড়ল সে। 'বাকি সবাই কোথায়?'

হেলেনের পিছু নিয়ে লিভিং রূম থেকে বেরিয়ে এলো কর্নেল ময়নিহান, পাথুরে লম্বা করিডর ধরে হেঁটে এসে ঢুকল মেইন সিটিং রূমে। এটার সিলিং অত্যন্ত উঁচু, দুই সেট ঝাড়বাতি ঝুলছে। সমস্ত ফার্নিচার অলিভ-উড দিয়ে তৈরি, এই দ্বীপেই তৈরি করা হয়েছে। মেঝেতে পারশিয়ান কার্পেট। দেয়াল সমৃদ্ধ করা হয়েছে সমঝদার মহলে বহুল আলোচিত অ্যাবস্ট্র্যাক্ট আর্ট দিয়ে সাজিয়ে। খোলা দরজার বাইরে সরু টেরেস, সেখানে কয়েকটা ফোল্ডিং চেয়ার আর একটা টেবিল রয়েছে। আরও সামনে সাগর ছাড়া কিছু নেই–শান্ত ও নিস্তরঙ্গ, উঠতি পূর্ণচন্দ্র এত বেশি উজ্জ্বল করে রেখেছে, যেন একাধারে অপরিমেয় তরল আবার সেই সঙ্গে অসম্ভব অগভীর, এক অণু পরিমাণ পাতলা পানির একটা চাদর আকাশের কিনারা পর্যন্ত বিস্তৃত। অদৃশ্য খুদে তরঙ্গ নুড়ি পাথরের রাজ্যে ঢুকে অস্পষ্ট কলকল-ছলছল আওয়াজ করছে।

দরজার পাশে, ছায়ার ভেতর দাঁড়িয়ে বাইরে তাকিয়ে থাকল কর্নেল ময়নিহান। সাগর তাকে চিরকাল মুগ্ধ করে। তবে সে হচ্ছে সেই জাতের পুরুষ, যে প্রতিটি জিনিসে নিজের স্বার্থ আছে কিনা খোঁজ নিতে পছন্দ করে। এই মুহূর্তে তার মনে হলো, দুনিয়ার বুকে গ্রাস করবার সবচেয়ে বেশি ক্ষমতা রয়েছে সাগর বা সমুদ্রের। আগুনের চেয়েও সাগরের খিদে বেশি। যত লোক আগুনে পুড়ে বা ভূমিকম্পে মারা যায়, সাগর তারচেয়ে অনেক অনেক বেশি মানুষকে গিলে ফেলে।

সাগরের সবচেয়ে প্রিয় খাদ্য জেলে। আর ভারী কোন জিনিস যদি একবার ডোবে, সাগর কোন দিন সহজে সেটা আর ফিরিয়ে দেয় না। দরজার দিকে পিছন ফিরল কর্নেল ময়নিহান।

ডিভানে হাত-পা ছড়িয়ে শুয়ে থাকা মেয়েটা চোখ মেলে তাকাল। হেলেনের মতই লম্বা সে, তবে চোখ দুটো নীলচে, কণ্ঠস্বর নরম হলেও কাঠামোয় পুরুষালি একটা ভাব আছে। কার্লা ইটালিয়ান মেয়ে, তবে গ্রিসের পাসপোর্ট আছে তার। বয়স ছাব্বিশ, সাত বছর হলো ছোটখাট কাজ করছে সিআইএ-র হয়ে। কর্নেল ময়নিহানকে সে বিশেষ পছন্দ করে না, তবে ভয় পায়।

কর্নেল এ-সব যেন লক্ষ করে না। সে হাসিমুখেই বলল, 'সন্ধেটা দারুণ। তোমাকেও কিন্তু দামি পুতুলের মত লাগছে।'

কালো প্যান্ট আর সাদা জ্যাকেট পরেছে কার্লা। 'একঘেয়েমি খুন করছে আমাকে,' অভিযোগের সুরে বলল সে, সরু পা দুটো সরিয়ে নিল হেলেন যাতে বসতে পারে ডিভানে। 'এখানে কী করছি আমরা, কর্নেল, সার?'

'তোমাদের মূল কাজ, আগেই বলেছি, আমাদের ছোট্ট পার্টিকে এই রকম একটা ধারণা দেয়া যে আমরা কয়েকজন বন্ধু এখানে ছুটি কাটাতে এসেছি। এটা তেমন ইন্টারেস্টিং কিছু নয়। তবে আজ রাতে তোমাদের দায়িত্বের পরিধি একটু বাড়বে। কিছুক্ষণের মধ্যে কয়েকজন লোক আসবে, তোমরা নিজেদেরকে তাদের হাতে তুলে দেবে। আমার ধারণা, এতে তোমাদের জন্যে প্রচুর উত্তেজনার খোরাক আছে।'

'কারা তারা?' ডিভানে উঠে বসল কার্লা, হেলেন আর তার কাঁধ পরস্পরের সঙ্গে ঘষা খেলো। 'ক'জন?'

'সব মিলিয়ে ছ'জন। তাদের মধ্যে চারজন যুক্তরাষ্ট্র, তথা গোটা বিশ্বের স্বার্থ রক্ষার কাজে পাঠানো অত্যন্ত বিপজ্জনক একটা মিশন থেকে ফিরছে। তোমাদের কাজ নিজেদের সবটুকু ঢেলে দিয়ে তাদের মনোরঞ্জনের ব্যবস্থা করা।'

মেয়ে দুটো পরস্পরের দিকে তাকাল। কার্লা শ্রাগ করল। হেলেন চোখে ঘুম ঘুম ভাব এনে হাসল, তারপর একটা বাদামী হাত রাখল কার্লার কোমরে।

'তো এবার...ওহ্, একেবারে ঠিক সময়ে, গেরো। এত ভাল সার্ভিস আমরা কোথায় পাব!'

বাড়ির চার নম্বর লোক, বুলেট আকৃতির মাথা নিয়ে শক্ত-সমর্থ একজন রাশিয়ান, ট্রেতে পানীয় নিয়ে ভেতরে ঢুকছে। একে তো কম বেতন, তার ওপর চাকরিতে উন্নতির সম্ভাবনা নেই, এ-কথা ভেবে আফগানিস্তানে পাঠানো রুশ সেনাবাহিনী থেকে পাকিস্তানে পালায় ভ্লাদিমির গেরোস্কি, তারপর সরাসরি মার্কিন দূতাবাসে পৌঁছে রাজনৈতিক আশ্রয় প্রার্থনা করে। নতুন মনিবরা তাকে যদিও খানিকটা ভোঁতা, তবে অনুগত বলে মনে করে; তার বিশেষ যোগ্যতা, ভয়ানক নিষ্ঠুর। এসব গুণের সঙ্গে চামড়াটা সাদা হওয়ায় সব-কাজেরই ওস্তাদ হিসেবে কর্নেল ময়নিহানের গ্রুপে টিকে গেছে। একটা গোল টেবিলে ট্রেটা নামিয়ে রেখে ছোট করে ছাঁটা চুল সহ মাথাটা মেয়েদের দিকে সামান্য কাত করল সে।

ঠোঁটে প্রশ্রয়দানের হাসি নিয়ে কর্নেল ময়নিহান কার্লাকে ভদকা আর হেলেনকে বিয়ার নিতে দেখছে। মাথা নেড়ে জানাল, সে কিছু নেবে না। ইঙ্গিতে

গেরোকে বলল, তুমি যা খুশি নিতে পারো।

পকেটে হাত ভরে ঘুরল ময়নিহান, খোলা দরজার দিকে পা বাড়াল। হঠাৎ থামল সে। এক মুহূর্ত দাঁড়িয়ে থাকল যেন একটা অটল মূর্তি, তারপর হাতঘড়ি দেখল। ঘাড় ফিরিয়ে তীক্ষ্ণকণ্ঠে বলল, 'গেরো। আলো। সবগুলো।'

বিয়ারের ক্যানটা নামিয়ে রাখল গেরো, মাত্র এক ঢোক গিলেছে। 'সব?'

'সব। যা গোপন করা যায় না সেটাকে আসলে বেশি করে দেখানো উচিত। আমাদের ছোট্ট হাউজ-পার্টি আগমনের এটা হবে নীরব অথচ আলোকিত ঘোষণা।'

বাড়ির ওপর দিকে, পাহাড়ী ঢালের মাথার ঠিক নিচে, আইলিট অর্থাৎ খুদে দ্বীপটার সেই দুই লোক একটা বেঁটে ডুমুর গাছের তলায় শুয়ে রয়েছে, হঠাৎ দেখতে পেল টেরেস আর অ্যাঙ্কারিজ অকস্মাৎ উজ্জ্বল আলোয় উদ্ভাসিত হয়ে উঠল। ধীর গতিতে আসা মোটর-বোটটা দেখল তারা। এক চুল না নড়ে রশি ছোঁড়া আর বাঁধাও দেখল। তীরে তিনজন লোক নামল। হাস্যমুখর অভ্যর্থনার অস্পষ্ট আওয়াজ ভেসে এলো। তিনজনের মধ্যে বোট থেকে নামতে একজনের খানিকটা সাহায্য দরকার হলো। বাকি দু'জন ছুটল বাড়ি থেকে বেরিয়ে আসা দুই তরুণীর বাড়িয়ে দেয়া বাহুর ভেতর ঢোকার জন্য। চাকর লোকটা কয়েকটা সুটকেস সংগ্রহ করল। তারপর হৈ-চৈ করতে করতে বাড়ির ভেতর ঢুকে পড়ল সবাই। বোট ঘুরে গেল পশ্চিমে, কোন সন্দেহ নেই আইলিটের তীর ধরে পাবলিক অ্যাঙ্কারিজের দিকে যাচ্ছে। ভ্রাকোনিসি দ্বীপের ভেতরের বাঁকটার প্রায় মাঝখানে সেটা।

ওদিকে, পাহাড়ী ঢালে, লোক দু'জন পরস্পরের দিকে তাকাল। একজন তার সঙ্গীকে দু'হাতের তালু দেখাল। সিধে হয়ে আবার তারা কষ্টকর ও নিষ্ফল টহল শুরু করল। আজ রাতে এরকম আরও দশটা বাড়ি চেক করতে হবে তাদের।

বাড়ির ভেতর সিটিংরূমে বসে, নবাগত লোক তিনজনকে দেখছে কর্নেল ময়নিহান, কোন কথা বলছে না।

সোনালি চুল, যে ঘণ্টা ত্রিশেক আগে সানিংডেল থেকে কোয়ার্টারডেক পর্যন্ত অনুসরণ করেছিল রানাকে, সে-ই প্রথম মুখ খুলল। 'রানা,' বলে শুরু করল ঠিকই, কিন্তু গলা অসম্ভব শুকিয়ে যাওয়ায় কাশতে হলো একবার। 'রানা আমাদের হাত থেকে ফসকে বেরিয়ে পালিয়ে গেছে–ওখানেই, ইংল্যান্ডে।'

মাথা ঝাঁকাল কর্নেল ময়নিহান, ভাব ও আবেগবর্জিত অবয়ব।

'তবে ভুল শুধরে নেওয়ার ব্যবস্থা করা হয়েছে। আশা করা যায় চব্বিশ ঘণ্টার মধ্যে আমরা তাকে হাতে পাব,' আবার বলল লোকটা, অনেকটা রিহার্সেল দেওয়ার ভঙ্গিতে।

আবার মাথা ঝাঁকাল কর্নেল।

'এইচএনসি–সিক্সটিন ভালভাবে কাজ করে শুধু যদি ইন্ট্রা-ভিনাস ইনজেক্ট করা যায়,' বিষণ্ন চেহারার দ্বিতীয় লোকটা বলল। 'লোকটা এত বেশি ধস্তাধস্তি করছিল, কোন রকমে পেশীতে সুঁই ঢুকিয়ে মুহূর্তের মধ্যে যা পারা গেছে ইনজেক্ট করেছি, অর্থাৎ...'

কর্নেলের কব্জি থেকে একটা হাত সামান্য একটু উঁচু হলো, সঙ্গে সঙ্গে থেমে গেল লোকটা।

'পালাবার আগে ডোল-এর মুখ এমনভাবে ড্যামেজ করে দেয়, মেরামত করা সম্ভব ছিল না,' সোনালি চুল শুকনো গলায় বলে যাচ্ছে। 'তাই ডোলকে স্পটেই শেষ করে এসেছি। এরপর সব কিছু প্ল্যান ধরে সারা হয়েছে। এয়ারপোর্টে ডাবল ডাইভারশনারি ট্যাকটিকস্ খুব কাজ দিয়েছে...'

আবার কর্নেলের হাত সামান্য উঁচু হলো; এটা সম্ভবত একটা সংকেত–ঠিক থামতে বলছে না, প্রসঙ্গ বদলাতে বা রিপোর্ট সংক্ষিপ্ত করতে বলছে।

'ব্যারির মাথা থেকে ব্রিলিয়্যান্ট একটা আইডিয়া বেরোয়, ক্লু-ও বলা যেতে পারে–ডোলের পকেটে রেখে আসা হয়েছে। ওর ধারণা, টোপটা গিলবেই গিলবে রানা, এবং বসের খোঁজে এথেন্সে তাকে আসতেই হবে। বিশদ যা কিছু জানতে চান সব এর ভেতর আছে,' দ্রুত বলল সোনালি চুল, যেন কর্নেলের আরেকটা সংকেতকে দেরি করিয়ে দিতে চাইছে। বসের হাতে একটা সীল করা এনভেলাপ ধরিয়ে দিল সে। 'ইতোমধ্যে ব্যারি নিজেও পৌঁছে গেছে এথেন্সে। ওখানে আমাদের এজেন্টদের সঙ্গে যোগাযোগ হবে তার। কোন কারণে মাসুদ রানা যদি না আসে, ব্যারি বিসিআই-এর অন্য কোন নামকরা এজেন্টকে কিডন্যাপ করে এই দ্বীপে নিয়ে আসার ব্যবস্থা করবে। ব্যারির ধারণা, তাতেও আমরা এই অপারেশন থেকে যা চাই তা পেতে কোন সমস্যা হবে না।'

আধ মিনিট চুপচাপ বসে থাকল কর্নেল ময়নিহান, হাতের এনভেলাপ দিয়ে হাঁটুতে মৃদু বাড়ি মারছে। ঘামে ভিজে যাচ্ছে মুখ দুটো, অপ্রতিভ ও আড়ষ্ট একটা ভঙ্গিতে তার সামনে দাঁড়িয়ে রয়েছে লোক দু'জন। কার্লা বসে আছে ডিভানে, চোরাচোখে লক্ষ করছে কর্নেলকে। তার পাশে বসে পালা করে লোক দু'জনের দিকে তাকাচ্ছে হেলেন।

অবশেষে মুখ তুলল ময়নিহান। ঠোঁট দু'ফাঁক হয়ে গেল নিঃশব্দ হাসিতে। টান-টান উত্তেজনায় ঢিল পড়ল, কেউ একজন দ্রুত দম ফেলল।

সোনালি চুলের দিকে তাকাল কর্নেল। 'কথা হলো, ম্যাকার্থি, ভাগ্য তোমাদের সঙ্গে সত্যি বেঈমানী করেছে। আর এ-ও আমি বুঝতে পারছি যে ক্ষতিটাকে লাভে পরিণত করবার চেষ্টাও তোমরা কম করছ না।' ময়নিহান নিষ্ঠুর মানুষ, দয়ামায়া বলতে তার ভেতর কিছুই নেই, তবে নিজের লোকদের বেলায় একটা পর্যায় পর্যন্ত যুক্তি মানতে আর ধৈর্য ধরতে রাজি আছে সে। 'জানি এখন তোমরা বিশ্রাম নিতে চাইবে,' বলল সে, কথা এখনও শেষ হয়নি। 'সমস্ত দিক নিয়ে আলোচনা হবে সকালে। যার যা খুশি পান করো তোমরা। কী খেতে চাও বললেই রান্নার ব্যবস্থা করবে গেরো। এই মেয়ে দুটোর নাম কার্লা আর হেলেন। এদের ওপর নির্দেশ আছে রাতদিন যখন চাও তোমাদেরকে খুশি রাখবে। ওহ্, ভাল কথা...'

কোন রকম ব্যস্ততা না দেখিয়ে দাঁড়াল কর্নেল ময়নিহান, নবাগতদের তৃতীয় ব্যক্তির সামনে এসে থামল। একটা চেয়ারে নেতিয়ে আছেন তিনি।

'গুড ইভনিং, জেনারেল। আমি সিআইএ-র ইউরোপ শাখার অ্যাসিস্ট্যান্ট

ডিরেক্টর ময়নিহান। কেমন বোধ করছেন, সার?'

রাহাত খান মাথা তুললেন। তাঁর ঘোলা চোখে বুদ্ধির ধার খানিকটা ফিরে এসেছে। কণ্ঠস্বরে রয়েল বেঙ্গল টাইগারের গুড়্গুড় ভাব চাপা থাকল না। 'তোমাদের কোন প্রশ্নেরই জবাব আমি দেব না। আমার বলবার কথা শুধু একটাই—আবার প্রমাণ করেছ, একমাত্র সুপারপাওয়ার হয়েও তোমরা সত্যিই আসলে নির্বোধ ও কাপুরুষ।'

'বুড়ো বয়সে প্রলাপ বকা স্বাভাবিক, আমি কিছু মনে করছি না। আরে খট্টাস, এখানে তোমাকে ইন্টারোগেট করবার জন্যে আনা হয়নি। তবে কোন প্রশ্ন দেখা দিলে তার জবাব আমরা ঠিকই তোমার কাছ থেকে আদায় করে নেব।' কর্নেল ময়নিহানকে এই প্রথম একটু হিংস্র দেখাল। 'এবার, লেম্যান। যান, আপনার রোগীকে নিয়ে গিয়ে শুইয়ে দিন। কিছু একটা বেঁধাবেন, রাতে ঘুমটা যাতে ভাল হয়। কোথায় শোয়াবেন গেরো আপনাকে দেখিয়ে দেবে।'

মাথা ঝাঁকাল ডাক্তার, গেরোর সাহায্যে রাহাত খানকে নিয়ে সিটিং রুম থেকে বেরিয়ে গেল।

গ্লাসভর্তি ভদকা নিয়ে ডিভানের মুখোমুখি একটা চেয়ারে বসল ম্যাকার্থি। মেয়ে দুটোর আপাদমস্তক এমন খুঁটিয়ে পরীক্ষা করছে সে, এটা যেন গরু-ছাগলের হাট। অবশেষে কার্লার দিকে আঙুল তাক করল। 'কর্নেল বলেছেন যে-কোন সময়,' ফিসফিস করল সে। 'তাহলে এখনই নয় কেন?'

কার্লা ঘাড় ফিরিয়ে হেলেনের দিকে তাকাল। দু'জনে ত্রিশ সেকেন্ডের মত কথা বলল—কখনও ইটালিয়ান ভাষায়, কখনও গ্রিক ভাষায়। এক সময় কাঁধ ঝাঁকাল কার্লা, তারপর সম্মতি জানিয়ে মাথা ঝাঁকাল।

হেলেন ম্যাকার্থির দিকে একদৃষ্টে তাকিয়ে আছে। 'আমি চাই, আমাকেও নাও তুমি। ওই লোকটা পচা। ওর হাত পাখির মত, দৃষ্টি দেখে সন্দেহ হয় ভেতরের সব দেখতে পাচ্ছে—হাড়, মাংস, নাড়ি, রক্ত। কোন সমস্যা নেই, আমাকে নাও। এরকম আগেও আমরা করেছি। তোমার খারাপ লাগবে না।'

'আমার তো পোয়াবারো!' ঢক ঢক করে গ্লাসটা খালি করল সে, দাঁত বের করে হাসল। 'পথ দেখাও, প্রাণসখীরা।'

একা হওয়ার পর টেরেসে বেরিয়ে এলো কর্নেল ময়নিহান, ঈজিয়ান সাগরের দিকে থুথু ফেলল যত জোরে পারা যায়।

ছয়

কিছু একটা ঘটবার অপেক্ষায় এথেন্সের হোটেল ইপিরাস ইন্টারন্যাশনালের বার-এ বসে রয়েছে মাসুদ রানা।

এর আর কোন বিকল্প পাওয়া যায়নি, তৈরি করা যায়নি অনুসরণযোগ্য কোন পলিসি। বিসিআই হেডকোয়ার্টার ঢাকা, ঢাকার পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয়, রানা এজেন্সির

লন্ডন শাখা আর রানার উপস্থিতিতে রানা এজেন্সির এথেন্স শাখার সঙ্গে টেলিকনফারেন্স হয়েছে ঘণ্টার পর ঘণ্টা। আলোচনার ফল হিসেবে যা বেরিয়েছে, ভাল কোন শব্দের অভাবে সেটাকে প্ল্যান বলে চালানো হচ্ছে। পয়েন্টগুলো একটা কাগজে লেখা হয়েছিল, সেটা ছিঁড়ে ফেলা হলেও রানার সব মনে আছে।

এক। খুব ভাল হয় যারা কিডন্যাপ করবার চেষ্টা করেছিল তাদেরকে রানা যদি খুঁজে বের করতে পারে। নিজে ধরা না পড়ে শত্রুদের অনুসরণ করা গেলে তাদের ঘাঁটি বা আস্তানার সন্ধান মিলতে পারে। এতে মেজর জেনারেলকে উদ্ধার করবার উজ্জ্বল সম্ভাবনা দেখা দেবে।

দুই। এটা বাস্তবধর্মী প্রস্তাবনা নয়, কাজেই বাতিল করা যেতে পারে। এমআরনাইনের পক্ষে আগেভাগে শত্রু-এজেন্টদের চিনতে পারা সম্ভব নয়। তা ছাড়া কোয়ার্টারডেকে তারা যে দক্ষতা দেখিয়েছে, তাদের কাউকে আটক করা প্রায় অসম্ভব প্রতিপন্ন হতে পারে।

তিন। কাজেই এমআরনাইনকে স্বেচ্ছায় বন্দি হয়ে আত্মরক্ষার জন্য এইসব সেফগার্ডের ওপর নির্ভর করতে হবে:

ক) রানা এজেন্সির এথেন্স শাখার অবাঙালী অপারেটররা এমআরনাইনকে সারাক্ষণ চোখে চোখে রাখবে। একই সঙ্গে কিডন্যাপিং পার্টির তৎপরতা সম্পর্কে অনুসন্ধান চালাবে এই প্রস্তুতি নিয়ে যে সুযোগ পেলেই প্রবল শক্তিতে যেন ঝটিকা হামলা চালানো যায়।

খ) এমআরনাইনের পোশাক-পরিচ্ছদে একটা হোমিং-ট্র্যান্সমিটার ফিট করতে হবে।

গ) আত্মরক্ষা ও পলায়নের জন্য পরিচ্ছদের সঙ্গে আরও কিছু ডিভাইস থাকবে।

ঘ) বিসিআই এজেন্টরা বিপুল ফায়ারপাওয়ার আর হেলিকপ্টার গানশিপ নিয়ে ইউরোপের বিভিন্ন আন্ডারগ্রাউন্ডে অপেক্ষা করবে। ফায়ারপাওয়ার বলতে বাজুকা, মর্টার, রকেট লঞ্চার, গ্রেনেড লঞ্চার আর ব্ল্যাকমার্কেট থেকে সংগ্রহ করা নাপাম বোমা ও স্কাড মিসাইল-এর সর্বশেষ উন্নত সংস্করণ পর্যন্ত থাকবে।

হোটেলে পৌঁছে একটা প্যাকেটের ভেতর খুদে ট্র্যান্সমিটার সহ বাকি সব ইকুইপমেন্ট পেয়েছে রানা। ওর এক পাটি জুতোর গোড়ালিতে বিসিআই টেকনিক্যাল এক্সপার্টদের তৈরি করা কমপার্টমেন্টের ভেতর ট্র্যান্সমিটারটা ঢুকিয়ে নিয়েছে ও। ডান পাটি জুতোর গোড়ালিতে ঠাঁই পেয়েছে মিনিয়েচার পিক-লক। একজোড়া টাংস্টান স্টীল-এর হ্যাকসঅ ব্লেড পাওয়া যাবে চারকোল-গ্রীন মোহেয়ার সুটের ল্যাপেল-এ। এ-সব খুদে ইকুইপমেন্ট প্রতি বছর আরও সফিসটিকেট হলেও, এগুলোর সম্ভাব্য লুকানোর জায়গা খুব একটা বদলাচ্ছে না। যে-ধরনের প্রফেশনাল দক্ষ লোকজন কোয়ার্টারডেকে অপারেশন চালিয়েছে তাদের চোখকে ফাঁকি দেয়া সহজ হবে না। গম্ভীর বাস্তব পরিস্থিতি অনুধাবন করে রানা সিদ্ধান্তে পৌঁছাল, অন্যান্য অ্যাসাইনমেন্টে যে-সব অদৃশ্য হাতিয়ারের ওপর নির্ভর করতে হয়েছে ওকে এই অ্যাসাইনমেন্টেও তাই করতে হবে। সেগুলো ওর ভেতর লুকানো আছে, ব্যক্তিগত অস্ত্র, স্পর্শ করা যায় না–উপস্থিত বুদ্ধি,

বিচক্ষণতা, সাহস আর শক্তি। সামনে এগুলোরই কঠিন পরীক্ষা হবে। বাকি সব কিছু অনিশ্চিত।

বারে খুব ভিড়। খুব হৈ-চৈ। স্রোতের মত আসা-যাওয়া করছে লোকজন। চারদিকে চোখ বুলাল রানা। কৌতূহল হচ্ছে, এজেন্সির অপারেটরদের দেখতে পাওয়া যায় কিনা। ওদের কাজ ওকে চোখে চোখে রাখা। সোহেলের নির্দেশে বিশেষ করে এই কাজটা এমন সব লোককে দেয়া হয়েছে, শত্রুপক্ষের হাতে একজন ধরা পড়ে নির্যাতিত হলেও সে সংশ্লিষ্ট বাকি কারও পরিচয় বা চেহারার বর্ণনা ফাঁস করতে পারবে না।

বারের লোকজন বেশিরভাগই ব্যবসায়ী ও পেশাজীবী নারী-পুরুষ–বিভিন্ন দ্বীপ থেকে আসা জাহাজ মালিক, এথেনিয়ান ব্যাংকার, সালোনিকার রাজনীতিক; ইস্তাম্বুল, সোফিয়া বা বুখারেস্ট থেকে আসা লোকজন, যাদেরকে দেখামাত্র বিশেষ কোন শ্রেণীতে ফেলা যায় না; আরও আছে পাঁচমেশালি ট্যুরিস্ট। সবাই খুব পরিপাটি। চেহারা-সুরতে আর পোশাকে-আশাকে সমীহ পাওয়ার মত ব্যক্তিত্বসম্পন্ন।

রানা ইপিরাস ইন্টারন্যাশনালে উঠেছে হোটেলটার সাজসজ্জায় প্রাচীন জাঁকজমকের সঙ্গে আধুনিকতার ছোঁয়া থাকায়। হোটেল বিল্ডিঙের সামনেটা আয়না দিয়ে মোড়া, যেন পারদের প্রপাত। সারি সারি পিলারগুলো সবুজ মার্বেল। বহুরঙা নকশাসমৃদ্ধ ট্যাপিসট্রি। দরজার মাথায় অরিজিনাল শিল্পকর্মের নিখুঁত একটা প্রতিচিত্র–মোটাতাজা, চতুরদর্শন একটা ঘোড়ায় চড়ে ব্যাবিলনে প্রবেশ করছেন অ্যালেকজান্ডার দ্য গ্রেট, অনুচরবৃন্দের সামনের সারিতে সম্মানিত যে ব্যক্তিটিকে দেখা যাচ্ছে, পোশাক-পরিচ্ছদ একটু আলুথালু হয়ে আছে, কোন ম্যাসেডোনিয়ান প্রিন্স না হয়ে ক্লিওপেট্রা হওয়ার সম্ভাবনাই বেশি। এ-সবই রানার পছন্দ, পছন্দ ফরাসী স্টাইলে সাজানো এই বারটাও।

রাত এখন দশটা, সৌখিন এথেন্সবাসীরা এ-সময়ই সিদ্ধান্ত নেয় কোথায় তারা ডিনার খাবে। রানার খুব খিদে লাগছে। মাউন্ট হাইমেটাস-এর নিচে ছোট্ট এয়ারপোর্টে আজ বিকেলে ভ্যাপসা গরম আর গাদাগাদি ভিড়ের মধ্যে নামার পর এত ক্লান্তি বোধ হচ্ছিল যে খেতে বসতে মন চায়নি। হোটেল ইপিরাসের সাততলার সুইটে পৌঁছে শাওয়ার সেরে পাঁচ ঘণ্টা টানা ঘুম দিয়েছে। ঘুম ভাঙার পর রুম সার্ভিসে ফোন করেছিল, ব্যালকনিতে বসে প্রাচীন অ্যাক্রোপলিস বা নগরদুর্গ আর সাগর দেখতে দেখতে চুমুক দিয়েছে ব্ল্যাক কফির কাপে।

ইতোমধ্যে শত্রুপক্ষ নিশ্চয়ই জেনেছে যে রানা এথেন্সে। রানার নিজের প্ল্যানও চূড়ান্ত করা হয়েছে, ওর লোকজন যেখানে যার থাকবার কথা সবাই সেখানে পজিশন নিয়েছে। এবার উঠতে হয় ওকে। ওয়েটারকে ইশারা করল ও। প্রায় সঙ্গে সঙ্গে অন্য এক লোকও হাতছানি দিল ওয়েটারের উদ্দেশে। রানার দিকে খানিকটা পিছন ফিরে বসেছে সে, দূরত্ব বেশি নয়, আড়চোখে তাকালে রানার প্রতিটি নড়াচড়া তার দেখতে পাওয়ার কথা। রানা আর তার, দু'জনের সংকেতই বলতে চাইছে–বিল আনো। বারে যত খদ্দের আছে তাদের মধ্যে সবচেয়ে আত্মভোলা টাইপের মানুষ সে। মাঝবয়েসী, মাথায় উষ্কখুষ্ক ঝাঁকড়া চুল। মুখে

খোঁচা খোঁচা দাড়ি, সুটটা দামি হলেও ভাঁজ নষ্ট হয়ে গেছে—যেন একজন বিজ্ঞানী বা দর্শনের অধ্যাপক। সে একা নয়, টেবিলে আরও তিনজন মানুষ রয়েছে। মহিলা দু'জন ফ্যাশন দুরস্ত নয় মোটেও, মোটাসোটা গৃহিণী; সঙ্গীটি প্রায় তারই হুবহু নকল। রানা এজেন্সির এথেন্স শাখার প্রধান জিসানুল হক ইচ্ছে করলেই এ-ধরনের স্থানীয় গ্রিক লোকজনকে কাজে লাগাতে পারে। গাঢ় রঙের সুট পরা মাসলম্যান তার দু'চোখের বিষ। ইন্টারেস্টিং একটা ব্যাপার হতো···

বিল এলো রানার। মানিব্যাগের জন্য পকেটে হাত ভরতে যাচ্ছে, আরেকদিকের ছোট একটা টেবিলে অকস্মাৎ কিছু নড়ে ওঠায় তাকাল। চওড়া গোঁফঅলা এক দশাসই লোক, চেহারা দেখে বোঝা যায় তুরকি, পাশে বসা তরুণীর কনুইয়ের ওপরটা চেপে ধরে নিজের দিকে টেনে এনেছে, কানে মুখ ঠেকিয়ে দাঁতে দাঁত পিষে নিচু গলায় হুমকি বা ধমক দিচ্ছে। মেয়েটাকে দেখামাত্র থতমত খেতে হবে, এতই সুন্দরী। চুল তো নয়, যেন সোনালি ঢল নেমেছে পিঠ বেয়ে। এদিকে এই চুলেরই সবচেয়ে বেশি কদর। দীর্ঘ, ক্ষীণ দেহে উথলানো যৌবন, কার সাধ্য একবার তাকালে চোখ ফেরায়। এই মুহূর্তে তুরকির ভারী মাথা আর বিক্ষুব্ধ মুখের সামনে থেকে গায়ের জোর খাটিয়ে সরে যাওয়ার চেষ্টা করছে, চেষ্টা করছে কনুইয়ের ওপর থেকে হাতটা ছাড়াতে, চোখ দুটো বিস্ময় ও ভয়ে বিস্ফারিত। দু'জনের দৃষ্টিই রানার ওপর পড়ল, কারণ মাত্র কয়েক গজ দূরে ও, সবচেয়ে কাছে একমাত্র নিঃসঙ্গ পুরুষ।

'প্লিজ!' ইংরেজিতে বলছে মেয়েটা; গলা চড়ায়নি, তবে কণ্ঠে জরুরী তাগাদা। 'প্লিজ, কিছু একটা করো!'

মাপ নেয়া ও হিসেব কষার কাজটা দ্রুতই সারল রানা। বিল মিটিয়ে দিয়ে দিব্যি বেরিয়ে যেতে পারে ও। লোকটা বাড়াবাড়ি করলে যথাযোগ্য ব্যবস্থা নিয়ে পরিস্থিতি ভালই সামাল দেবে ওয়েটাররা। কিন্তু ইন্সটিঙ্কট বা ষষ্ঠইন্দ্রিয় বলছে, ওর চারপাশে এই মুহূর্তে সামাজিক যে-সব নাটকীয়তা ঘটে যাচ্ছে তার মধ্যে প্রাসঙ্গিক কিছু একটা আছে। তা ছাড়া, বিপদে পড়া সুন্দরীকে উদ্ধার করবার সুযোগ কবে কোন্ বীরপুঙ্গব হাতছাড়া করেছে! আর, ওর হারাবার আছেটা কী? রানা সিদ্ধান্ত নিয়ে ফেলল।

'ওটা একটু পরে নিয়ে এসো, প্লিজ,' ওয়েটারকে বলল ও, হেঁটে এসে বসল তুরকির পাশের চেয়ারটায়। 'কি ব্যাপার বলো তো?'

'ও আমাকে বিরক্ত করছে,' বলল মেয়েটা; চেহারায় ভয় যেমন আছে, তেমনি রাগও। 'অশ্লীল, নোংরা সব কথা বলছে। তোমার পায়ে পড়ি, এই উপদ্রব থেকে বাঁচাও আমাকে।'

অল্প কয়েকটা, তবে বাছাই করা গ্রিক শব্দ ব্যবহার করল রানা। লোকটার দিকে ঝুঁকল ও, দেখল চোখে ঘৃণা নিয়ে ওকে দেখছে সে। শব্দগুলো উচ্চারণ করল ভীতিকর সুরে, 'Fiye apo tho, malaka !'

এটা একটা প্রচলিত অপমানকর গ্রিক উক্তি, মেয়েটিকে তুরকি যা বলছে তারচেয়ে কম অশ্লীল না-ও হতে পারে। শুধু কথায় চিঁড়ে হয়তো ভিজবে না, তাই চেহারায় দৃঢ় প্রত্যয় এনে লোকটার একটা হাত চেপে ধরল রানা। এই মুহূর্তে

একটু বিরতি চলছে, পরস্পরের দিকে তাকিয়ে আছে দু'জন পুরুষ। লোকটার হাতে মুঠোর চাপ বাড়াল রানা, প্রায় আনমনে খেয়াল করল দেখে যতটা মনে হয় তার চেয়ে অনেক বেশি শক্ত তার পেশী। তারপর তুরকি শান্ত ভঙ্গিতে ছেড়ে দিল মেয়েটিকে, অপেক্ষা করল কখন নিজের হাত মুক্ত হয়, চেয়ার ছেড়ে সিধে হলো, নেড়েচেড়ে ঠিক করল জ্যাকেটটা, কোন দিকে না তাকিয়ে হেঁটে বেরিয়ে গেল বার থেকে। তার এই বেরিয়ে যাওয়া সেই চারজনের দৃষ্টি এড়াল না, আগেই যাদের ওপর রানার চোখ পড়েছিল।

'ধন্যবাদ,' চমৎকার আমেরিকান ইংরেজিতে বলল মেয়েটি। 'তোমাকে ঝামেলায় ফেলবার জন্যে সত্যি খুব দুঃখিত। পাবলিক ডিসটার্ব্যান্স এড়িয়ে আর কিছু আমার করবার ছিল না। তুমি ওকে খুব ভাল ভাবে সামলেছ।' হঠাৎ উৎফুল্ল দেখাল তাকে, হাসল; ভয় আর বিস্ময়ের ধাক্কা একটু যেন তাড়াতাড়িই কাটিয়ে উঠছে। 'মনে হলো, এ-সব তোমার প্র্যাকটিস করা আছে।'

'আমরা কিছু নিই?' জিজ্ঞেস করল রানা, হাত তুলল একটা। 'হ্যাঁ, জাত-পাত নির্বিচারে বিপদে পড়া সুন্দরী মেয়ে দেখলেই আমি ঝাঁপিয়ে পড়ি। বিশেষ করে বিপদটা যদি কোন তুরকির তরফ থেকে আসে।'

'ধন্যবাদ। পিমাস রাহমানি আসলে তুরকি নয়, তবে ভাব ধরে। ও আসলে আলবেনিয়ান। এমন অশ্লীল লোক জীবনে তুমি দেখোনি। পরিবারের লোকজন ওর দিকে ঠেলে দিচ্ছে আমাকে—এখানে তার বেশ বড়সড় একটা কার্পেট তৈরির কারখানা আছে। আজকের এই ঘটনার পর বাবার সঙ্গে কথা বলবে মা, তারপর আর ওদিকে আমাকে ঠেলা হবে না। তুমি বিবাহিত?'

হাসল রানা। 'না। মাঝেমধ্যে ভাবি ওই কাজটা কোনদিনই করব না। কী নেবে তুমি?'

'উজু আর বরফ,' বলল মেয়েটি, চোখ তুলে ওয়েটারের দিকে তাকাল। 'ভেজাল দেয়া চলবে না।'

'ইয়েস, ম্যাডাম। আর আপনি, স্যার?'

'একই, প্রচুর বরফ।'

'তুমি উজু চেন?' রানার দিকে নতুন দৃষ্টিতে তাকাল মেয়েটা। 'গ্রিস সম্পর্কে ভাল ধারণা আছে তোমার?'

'গ্রিস সম্পর্কে খুব কমই জানি আমি, তবে যতটুকু জানি খুব ভালবাসি। উজু চিনি বৈকি, স্পিরিটটায় মৌরির গন্ধ আছে।'

'ভাল লাগল। আমি আমিনা আথিয়ানা।'

'আমার নাম মাসুদ রানা। তুমি যে তখন সাহায্য চাইলে, বুঝলে কীভাবে আমি ইংরেজি জানি?'

আমিনা হেসে উঠল। 'প্রায় সবাই জানে। বিশেষ করে ভারতীয়রা খুব কমই আছে ইংরেজি জানে না।'

'ভুল করলে। আমি ভারতীয় নই। খাঁটি বাঙালী।'

'সেটা কী জিনিস?'

'জাত। তবে রাষ্ট্রীয় পরিচয় আলাদা—বাংলাদেশী।'

'তারমানে তুমি বাংলাদেশ থেকে আসছ?'
'হ্যাঁ।'
'আগে বলবে তো! ভারত আর বাংলাদেশ পাশাপাশি, আমি জানি। তা এথেন্সে তুমি কী করছ? কাজে এসেছ, নাকি ফুর্তি করতে?'
'কাজে, তবে আশা করছি কিছু আনন্দ করার সুযোগও পাব।'
আমিনা আথিয়ানা রানার আমন্ত্রণসূচক দৃষ্টি কোন রকম প্রতিক্রিয়া ছাড়াই মুহূর্তের জন্য প্রতিহত করল, তারপর খুঁতখুঁতে দৃষ্টিতে ঘোলা পানীয় ভর্তি একজোড়া টাম্বলার-এর দিকে তাকাল—ঘোলা ভাবটা সাদাটে মোচড় খেয়ে বরফ থেকে বাইরের দিকে উঠে আসছে তরল ধোঁয়ার মত। টাম্বলার দুটো ওঁদের সামনে সাবধানে নামিয়ে রাখল ওয়েটার। রানা এই সুযোগে গ্রিক দেবীর উদ্ভিন্ন যৌবন আর অপরূপ দেহ-সৌষ্ঠব আবিষ্কার করছে আমিনা আথিয়ানার একহারা অথচ পুরুষ্টু শরীরে। এরকম ক্লাসিকাল চেহারা প্রাচীন মুদ্রার সঙ্গে তুলনা করা যায়, দুটোই দুষ্প্রাপ্য এবং মহামূল্যবান। আমিনার গায়ের রঙ বর্ণনা করা সত্যি খুব কঠিন। সাদা, জলপাই-সবুজ আর গোলাপির মিশ্রণ। কানের দুলে বৃত্তাকার চাঁদগুলো যেন পেটানো সোনা।
সন্দেহ নেই যে তার এই অসাধারণ রূপ আর পরিস্থিতির সঙ্গে দ্রুত নিজেকে মানিয়ে নেওয়ার ক্ষমতার জন্যই শত্রুপক্ষ তাকে বেছে নিয়েছে। গত পাঁচ মিনিটের ঘটনার পিছনে যে তারাই আছে, এ-ব্যাপারেও রানার মনে কোন সন্দেহ নেই। মেয়েটির হালকা মেজাজ, আত্মবিশ্বাস, উষ্ণ আন্তরিকতা—কিছুই তার আসল উদ্দেশ্য গোপন করতে পারেনি; রানার সঙ্গে ঘনিষ্ঠ হতে চেয়েছে সে, চাইবে যে তা-ও বোঝা গেছে নাটকের একেবারে শুরুতে। কিছু শিখিয়ে-পড়িয়ে না দিলে আরও ভাল করত মেয়েটা। তথাকথিত কোন স্পাইমাস্টার বিপদগ্রস্তা নারীর ভূমিকায় অভিনয় করতে বলে প্ল্যানটার বারোটা বাজিয়েছে। রানার দৃষ্টিতে ব্যাপারটায় উৎসাহ পাওয়ার কারণ আছে—প্রতিপক্ষ অলস হয়ে পড়ছে। অলস হওয়া তাদের সাজে, এই চিন্তাটা একপাশে সরিয়ে রাখল ও।
হাতের গ্লাসটা উঁচু করে অনিষ্টকর, দুষ্ট ভঙ্গিতে নিচের ঠোঁটের একটা প্রান্ত মুক্তোদানা অর্থাৎ দাঁত দিয়ে কামড়াল আমিনা। 'জানি এই মুহূর্তে আমার মুখ থেকে কী শুনতে চাইছ তুমি,' বলল সে, হাসিটা তার চোখেও পৌঁছে গেল। 'গ্রিসে কিছু পান করবার সময় "তোমার স্বাস্থ্য" বলাই প্রাচীন রীতি ছিল। আজকাল "চিয়ার্স" বলি, কিংবা বলি, "তোমার দিকে তাকিয়ে"। গ্রিক আর গ্রিক নেই। প্রতি বছর একটু একটু করে নিজস্ব বৈশিষ্ট্য হারাচ্ছে।'
'যেমন তুমি তোমার ধর্মীয় বৈশিষ্ট্য হারাচ্ছ?'
হেসে উঠল আমিনা। 'মদ খাবার কথা বলছ? না পরপুরুষের সামনে বের হচ্ছি?'
'ধরো দুটোই।'
'ধর্ম সম্পর্কে আমার কোন জ্ঞান নেই,' নিরীহ ভঙ্গিতে সরল স্বীকারোক্তি করল আমিনা। 'আমার সমাজ আমাকে এত সময় আর সুযোগ দেয় না যে ধর্মের ভেতর কী আছে জানবার জন্যে মগ্ন হয়ে থাকব মাসের পর মাস বছরের পর

বছর। শুনেছি ধর্ম বিশ্বাস করবার বিষয়, যুক্তি দিয়ে মেলানোর না। যুক্তিবিদ্যায় আমি যেহেতু ভাল নই, ও পথে যাইও না। তবে বিশ্বাস করি। কী বিশ্বাস করি? যেটুকু বিশ্বাস করলে আমার দৃষ্টিতে আমি আমার লাভ আর সুবিধে দেখতে পাই। কী সেটা? আমি যাই করি না কেন, আল্লাহ্ আমাকে মাফ করবেন। হ্যাঁ, ব্যস, এটুকুই। আসলে কী জানো, এটাই সত্যি–আল্লাহর কাজই মাফ করা। শাস্তি দেয়াটা তাঁকে একদমই মানায় না।' এক সেকেন্ডের বিরতি, তারপরই প্রসঙ্গ পরিবর্তন। 'উজো খেতে চেয়ে আমি আসলে ঐতিহ্য বজায় রাখতে চেয়েছি। তুমি আমার সঙ্গে অন্য কোথাও বসে ডিনার খাবে?'

মনে মনে হাসল রানা। অপ্রাসঙ্গিক বিষয় পাওয়ায় খপ্ করে ধরে ফেলেছে মেয়েটা, ভাবছে মাছটাকে গেঁথে ফেলা গেছে। তবে মনের একটা অংশ তিরস্কারও করছে রানাকে। বেল্টের নিচে কিছু রেখে সাধারণ সাবধানতা অবলম্বন করেনি কেন শত্রুপক্ষকে যোগাযোগ করবার সুযোগ দেওয়ার আগে? ব্যাপারটা চাক্ষুষ করতে পারছে ও–এত পরিষ্কার যেন এরইমধ্যে ঘটে গেছে–পথ দেখিয়ে নির্জন, ফাঁকা একটা রাস্তায় নিয়ে গেছে ওকে মেয়েটা; তার লোকজন বৃত্তটা ছোট করে আনছে, বন্দি করে একটা গাড়িতে তোলা হলো, যেখান থেকে এয়ারপোর্টে, তারপর বিশেষ চার্টার করা প্লেনে তুলে...এটুকুই যথেষ্ট খারাপ, ভাবল রানা। বাকিটা কল্পনা করায় ঝুঁকি আছে।

উজো নিতান্তই হালকা পানীয়। অনেকটা ফেনসিডিল-এর মত। 'হ্যাঁ, অবশ্যই তোমার সঙ্গে ডিনার খাব। কিন্তু সেটা হোটেলে নয় কেন? আজ লম্বা জার্নির মধ্যে ছিলাম আমি...'

'এ মা, তুমি জানো না! বাধ্য না হলে কেউ কখনও ইপিরাস ইন্টারন্যাশনালে ডিনার খায় নাকি? এটা ডিনার খাওয়ার একটা জায়গা হলো? আমি তোমাকে এমন জায়গায় নিয়ে যাব যেখানে ওরা নির্ভেজাল গ্রিক খাবার পরিবেশন করে। তোমার ভাল লাগবে।'

'তা হয়তো লাগবে। কিন্তু না লাগলে? দেখো, একটা সত্যি কথা বলি–আমি কিন্তু খালি পেটে রাতে ঘুমাতে যেতে পারি না।'

আমিনার হালকা খয়েরি চোখে সতর্কতার সঙ্গে একটা অস্থির ভাবও ফুটে উঠল। শিকার হাতছাড়া হওয়ার ভয়ে বুক কাঁপছে। তারপরই বিস্ময়ে বিহ্বল হয়ে ওঠার অভিনয় শুরু করল। 'কি বলতে চাও বুঝতে পারলাম না। ভাল সমস্ত হোটেল সারা রাত খোলা থাকে। ওগুলোয় শুধু গ্রিক খাবার পাওয়া যায়, এরকম ভাববারও কোন কারণ নেই।'

'না, মানে...'

'গোটা ইউরোপে আমরা গ্রিকরাই সবচেয়ে অতিথিপরায়ণ জাতি–এটা আমাদের ঐতিহ্যের একটা অবিচ্ছেদ্য অঙ্গ। ভেবো না ট্যুরিস্ট ব্যুরোর মুখস্থ করা বুলি। গেলেই দেখতে পাবে।'

নিয়েই যখন যাচ্ছিস, তো চল!–নিজের ওপর খেপে উঠে ভাবল রানা। অবশ্য যেতে বলবার সঙ্গে সঙ্গে রাজি হয়ে যাওয়াটা ভাল দেখাত না। ওর তরফেও একটু অভিনয় নিশ্চয়ই দরকার আছে। ঘটনার সঙ্গে এগিয়ে যাওয়া ছাড়া

ওর আর করবারও তো কিছু নেই। 'ভুল বুঝো না,' বলল ও। 'আমি আসলে অনেকদিন ইংল্যান্ডে থেকে ওদের নিয়মে অভ্যস্ত হয়ে পড়েছি। ওখানে তাড়াতাড়ি ডিনার খেতে বসলে প্রচুর খেতে হয়, দেরি করে বসলে কম-কিছু না খেলে আরও ভাল। যাই হোক, নিজেকে আমি তোমার হাতে সঁপে দিচ্ছি।'

তিন মিনিট পর আইঅনিক স্তম্ভের মাঝখানে, হোটেলের ধাপে এসে দাঁড়াল ওরা। কনস্টিটিউশন স্ট্রীটে আলোর বন্যা বইছে। এখানে দাঁড়িয়ে অসংখ্য সাইনবোর্ড পড়া যায়। দেখা যায় অনেক দূরের ল্যান্ডমার্ক-বিইএ অফিস, অলিম্পিক এয়ারলাইন্স, এক সারি গাছের ওদিকটায় টিডব্লিউএ, ডানদিকে আমেরিকান এক্সপ্রেস-এর সামনে সশস্ত্র গার্ডদের টহল। অজ্ঞাত পরিচয় সৈন্যদের সমাধিতে আলো বোধহয় ইচ্ছে করেই ম্লান করে রাখা হয়েছে।

ধূসর ইউনিফর্ম পরা পোর্টার হুইসেল বাজিয়ে লাইনের একটা ট্যাক্সিকে সামনে এগোবার সংকেত দিল। ড্রাইভার লোকটা বয়স্ক, মুখে হাসি নেই। পাগড়িটাই পরিচয়-পত্র-শিখ। আমিনার কনুই ধরে ধাপ বেয়ে নেমে এলো রানা। মেয়েটার পেশি দৃঢ়, ত্বক শীতল, স্পর্শে কোমল আরাম।

ড্রাইভারের সঙ্গে গ্রিক ভাষায় কথা বলে নিল আমিনা। ওরা উঠে বসতে ছুটল ট্যাক্সি।

রানাকে এতক্ষণে সময় নিয়ে, খুঁটিয়ে দেখে নিচ্ছে আমিনা। তার মনিবরা তাকে শুধু প্রয়োজনীয় কিছু নির্দেশ দিয়েছে। যতটুকু তাকে করতে হবে, তার বেশি কিছুই জানানো হয়নি। মাসুদ রানা নামে এই বঙ্গসন্তানটিকে প্রথমে গাঁথতে হবে, তারপর সঙ্গে করে নিয়ে যেতে হবে নির্দিষ্ট একটা জায়গায়। অপারেশন-এর পরবর্তী অংশের দায়িত্ব তখন থেকে অন্য লোকদের কাঁধে চাপবে। তারপর ওর কপালে কী ঘটবে সেটা তার মাথা ঘামানোর বিষয় নয়-অফিশিয়ালি। কিন্তু, একটা মেয়ে হিসেবে, প্রশ্নটা নিজেকে না করে পারছে না সে। কী প্রশ্ন? প্রশ্নটা কী তা পরিষ্কার হওয়ার আগে এই মানুষটা সম্পর্কে তার উপলব্ধি পরিষ্কার হওয়াটা জরুরী। সে যেহেতু একটা মেয়ে, কোন পুরুষকে দেখলেই চিনতে পারে সে ভালবাসতে জানে কিনা। যে-কোন নারীর সহজাত গুণ এটা, তবে আমিনা চর্চার মাধ্যমে গুণটাকে আরও ধারাল করে নিয়েছে, ফলে তার ভুল হওয়ার প্রায় কোন সম্ভাবনাই নেই। রানা সম্পর্কে তার ধারণা হলো, এই লোকের ভালবাসা মাটির বুকে যে-কোন মেয়েকে স্বর্গ পাইয়ে দিতে পারে। নিজের চাওয়া-পাওয়া, অর্থাৎ নিজের মনের কথাও খুব ভাল বোঝে আমিনা। সমস্ত বিধি-নিষেধ উপেক্ষা করে তার গোটা অস্তিত্ব উল্লাসে লাফাচ্ছে আর চিৎকার করছে-ওকে চাই! ওকে চাই! প্রশ্নটা হলো, ওকে সে কেন পাবে না?

কর্তব্য আর আদেশ চিরকাল মেনে চলেছে আমিনা। নির্দেশ অমান্য করবার কথা সিরিয়াসলি একবারও ভাবল না সে, ভাবল না ডিনার খাওয়ার পর রানাকে সুযোগ দেবে ওর হোটেলে তাকে নিয়ে যাওয়ার, সুযোগ দেবে তাকে নিয়ে যা খুশি করবার। তবে মনে মনে খুব আশা করল, কারণ আশা করায় কোন দোষ নেই, এরকম ঘটলে সাংঘাতিক ভাল হত। ওই মুখ ঈশ্বর যেন মিষ্টি মিষ্টি প্রেমের কথা বলবার জন্যই সৃষ্টি করেছেন। হাত দুটোও তৈরি করা হয়েছে আদর করবার জন্য,

একজন টরচারার-এর বুটের তলায় থেঁতো হওয়ার জন্য নয়। সম্ভাব্য নির্যাতনের ভয়ানক দৃশ্যগুলো এত স্পষ্টভাবে কল্পনায় ধরা দিচ্ছে, ওদের ট্যাক্সি অ্যাক্রপলিস-এর ঢালে পৌঁছে যাওয়ার পরও বলবার মত একটা কথাও আমিনা খুঁজে পেল না।

পাশে বসে আমিনার নীরবতার কারণ আন্দাজ করল রানা—টেনশান। প্ল্যানের পরবর্তী অধ্যায় সম্ভবত যে-কোন মুহূর্তে শুরু হবে। প্রতিটি মোড়ে নিজেকে তৈরি রাখল রানা—হঠাৎ ক্ষিপ্র হয়ে উঠবে ট্যাক্সির গতি। ডানে বা বাঁয়ের কোন অন্ধকার গলিতে ঢুকে পড়বে ড্রাইভার। থামবার সঙ্গে সঙ্গে পিকআপ টীম ঘিরে ফেলবে গাড়িকে। এ-ধরনের কিছু ঘটতে শুরু করলে ও কী করবে ভাবছিল, হঠাৎ উপলব্ধি করল বাধা দেয়া ওর উদ্দেশ্য নয়। এই অ্যাসাইনমেন্টে ধরা পড়াটাকে বিপজ্জনক মনে করা হচ্ছে না, লক্ষ্য মনে করা হচ্ছে।

তারপর রাস্তা চওড়া হয়ে গেল। পিছিয়ে পড়ল সমস্ত ছায়া। একটা ওপেন-এয়ার রেস্টুরেন্টের আলো পড়ল চোখে, ওপর থেকে নামছে। থামল ড্রাইভার, এঞ্জিন বন্ধ করে চুপচাপ বসে থাকল।

ভাড়া মিটিয়ে দিয়ে রানাও শান্ত স্বাভাবিক আচরণ শুরু করল, যেন ঠিক এরকমটি ঘটবে বলেই আশা করছিল মালদার বিদেশী মক্কেল, স্থানীয় একটা সুন্দরী মেয়ে সঙ্গে নিয়ে বেরিয়েছে আনন্দ-ফুর্তিতে মনটা ভরিয়ে দেওয়ার ব্যাকুলতা নিয়ে। ধাপ বেয়ে রেস্তোরাঁয় উঠবার সময় দু'জনের কাঁধ মুহূর্তের জন্য ঘষা খেলো। আমিনার কোমরে একটা হাত জড়িয়ে ফিসফিস করল রানা, 'ডিনারটা সত্যি আমরা উপভোগ করব। কেউ এতে বাদ সাধতে পারবে না।'

ওর দিকে খানিকটা ঘুরল মেয়েটা, পিঠ ধনুকের মত বাঁকা হলো হয় নার্ভাস হয়ে ওঠার কারণে, নয়তো হঠাৎ কামনার ছুরি বেঁধাটাই দায়ী। এদিকে আলো যথেষ্ট, কামনার সঙ্গে তার চোখে প্রত্যয় আর দৃঢ়তাও দেখতে পেল রানা। রানার হাতের পাঁচটা আঙুল উষ্ণ মুঠোয় পুরে মৃদু চাপ দিল সে। এটাকে অভয়দান বলা যায় না? নাকি আপাতত আত্মসমর্পণ? পরে কী হবে কেউ জানে না?

'না, কেউ না,' বলল আমিনা। 'কারও সাধ্য নেই বাধা দেয়—রানা। আমি এভাবে তোমার নাম ধরছি, তুমি কিছু মনে করছ না তো? তুমিও আমাকে আপন করে ডাকবে, আমিনা বলবে।'

'কিছুই মনে করছি না। আমি খুশি।'

'তাহলে ডাকো আমাকে।'

'আমিনা?'

'ওভাবে নয়। মধুর সুরে। ভারী গলায় মিষ্টি করে। দীর্ঘলয়ে।'

হাসল রানা। 'এটা তোমার অন্যায় আবদার। অনুচিতও।'

'কেন, কেন?' আমিনা হতচকিত।

'কিছু মধুর ডাক শুধু বালিশে ঠেকানো কানের জন্যে আলাদা করে রাখতে হয়,' ফিসিফিস করল রানা, 'আ-আমিনা।'

'দেখো, দেখো! কী সুন্দর, তাই না?'

ধাপগুলোর মাথায় পৌঁছে অ্যাক্রপলিস অথাৎ প্রাচীন গ্রিসের নগরদুর্গের চাতালের দিকে তাকাল ওরা। বিশাল একটা জায়গা জুড়ে পাথরের বিস্তৃতি,

এথেন্সের স্বর্ণযুগে তৈরি অসংখ্য মন্দিরে সাজানো, গোড়ার দিকে হেরোডেস অ্যাটিকাস-এর থিয়েটারের ঝলমলে আলো। সব কিছুকে ম্লান ও নগণ্য করে তুলছে চন্দ্রালোকিত পার্থিনান-এর দৈর্ঘ্য—অ্যাথিনী দেবীর মন্দির; অনেকের মতে দুনিয়ার সবচেয়ে সুন্দর ভবন ওটা।

ওকে মুগ্ধ করবার চেষ্টা দেখে আমিনার প্রতি আকস্মিক একটা সদয় অনুভূতি জাগল রানার মনে। 'এত সুন্দর দৃশ্য জীবনে খুব কমই দেখেছি,' বলল ও।

'তোমার ভাল লাগায় আমি খুশি, কারণ এটাই এখানকার প্রধান আকর্ষণ।' রানার হাত ধরে এগোল আমিনা। 'এখানে প্রায় একই খাবার একটু অন্যভাবে রেঁধে আলাদা পদ বলে বিক্রি করা হয়, দামও অসম্ভব বেশি। তবে কীভাবে অর্ডার দিতে হয় জানা থাকলে তোমাকে ঠকতে হবে না। ব্যাপারটা তুমি আমার হাতে ছেড়ে দেবে?'

'খুশি মনে।'

ওদের টেবিলটা ফেলা হয়েছে পাঁচ-সাতটা ক্যাকটাস বেড-এর মাঝখানে, অ্যাক্রপলিস আর রেস্তোরাঁর সামনের দিকটা এখান থেকে পরিষ্কার দেখতে পাচ্ছে রানা। ওদিক থেকে সেই আত্মভোলা বিজ্ঞানী বা অধ্যাপকের নেতৃত্বে বাকি তিনজনকে ঢুকতে দেখল ও, যাদেরকে জিসানুল হকের লোকজন বলে মনে হয়েছিল ওর। চারজনই তারা গুরুগম্ভীর কোন বিষয় নিয়ে তুমুল আলোচনায় মগ্ন, যেন অন্য কোন দিকে খেয়াল দেওয়ার সময় বা ইচ্ছে কোনটাই তাদের নেই। ওদেরকে দেখেও না দেখবার ভান করল রানা, শুধু সাবধানতা অবলম্বনের জন্য নয়, সঙ্গে করে ওরা অপ্রীতিকর বাস্তবতা ফিরিয়ে আনায়। ফ্যান্টাসি কত বেশি আকর্ষণীয়—যে ফ্যান্টাসি বলে, ওর আর আমিনার কপালে লেখা আছে আজ রাতে পরস্পরকে ভালবাসবে ওরা। ব্যাপারটা কী রকম হতে পারে কল্পনার চোখে দেখতে পাচ্ছে রানা। লো-কাট উত্তেজক ড্রেস সামান্য একটু খুললেই মাখনের মত নরম কাঁধের নগ্ন ত্বক থেকে একটা ঘ্রাণ বেরুবে। এই সময় চার চোখ এক হতেই রানা বুঝতে পারল আমিনা জানে ও কী ভাবছে। জানে এবং সাড়া দিচ্ছে—একটু থেমে, দ্রুত নিঃশ্বাস ফেলে, ছোট্ট একটা ঢোক গিলে। তবে রানার মত সে-ও নিশ্চয়ই সচেতন যে ওরা যা চাইছে সেটা ফ্যান্টাসি হয়েই থেকে যাবে।

নরম, কচি ক্রাইফিশ দিয়ে ডিনার শুরু করল ওরা। ডিমের সাদা, তেল আর ভিনিগার দিয়ে তৈরি সস্, খাবার সময় মুখের ভেতরটা পানিতে ভরে উঠল। সুস্বাদু খাবার, পুব ভূমধ্যসাগরীয় উষ্ণ বাতাস আর চারপাশের শিথিল পরিবেশ সত্যিই উপভোগ করছে রানা। কাছেপিঠে প্রাচীন সভ্যতার নিদর্শন থাকায় জীবনের পাতায় এই আনন্দময় অভিজ্ঞতা স্মরণীয় হয়ে থাকবার সম্ভাবনা রয়েছে। সবচেয়ে বড় বৈশিষ্ট্য হলো, ওর উল্টোদিকে বসা মেয়েটা—আমিনা আথিয়ানা। কে ও? সত্যিই কি ওকে বসের কাছে নিয়ে যেতে পারবে মেয়েটা?

মুখ তুলে হাসল আমিনা। 'পারব।'

রানা কিছু বলতে পারছে না। শুধু তাকিয়ে আছে।

'আমি তোমাকে সুখী করতে পারব,' আবার ফিসফিস করল আমিনা।

'জানি, আমিও জানি,' বিড়বিড় করল রানা।

'কেমন খাচ্ছ? ভাল লাগছে তোমার?'

'দারুণ।'

'বিদেশীরা, মানে যারা ইংল্যান্ড থেকে আসে, তাদের পছন্দ স্টেক, ফ্রেঞ্চফ্রাই, ডিম...'

'আমি ইংল্যান্ডেও থাকি, তবে ইংরেজ নই; ওদের খাবারেও ততটা অভ্যস্ত নই,' বলল রানা।

'হ্যাঁ, জানি–তুমি বাংলাদেশী,' বলল আমিনা। 'বাংলাদেশ পাকিস্তানের অংশ ছিল, তারও আগে ছিল ভারতবর্ষের অংশ। তোমাদের মধ্যে অনেক মিল আছে, বিশেষ করে ভারতের সঙ্গে, তাই না?'

রানা ঠিক বুঝতে পারছে না আলোচনাটা আমিনা কোন দিকে নিয়ে যেতে চাইছে। বসের কিডন্যাপ হওয়ার সঙ্গে উপমহাদেশীয় কোন কানেকশন আছে নাকি? 'তুমিই বলো কী মিল।'

'ইরাকের ওপর মার্কিনিদের অন্যায় জুলুম ভারতের মত বাংলাদেশও সমর্থন করেনি,' বলল আমিনা। 'ঘাড়ে হাত থাকায় পাকিস্তানের অবস্থা ছিল কাহিল, ওদের কথা না বলাই ভাল। তুমি বোধহয় জানো, অনেক কাজেই এখন আর পাকিস্তানকে ডাকা হচ্ছে না।'

'না, আমি অন্ধকারে,' বলল রানা।

তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে অন্তত দশ সেকেন্ড রানাকে দেখল আমিনা। কী খুঁজে পেল সেই বলতে পারবে। সন্তুষ্ট দেখাল তাকে। যেন অতি গোপন একটা তথ্য এখনও গোপন আছে জানতে পেরে ভারী খুশি সে। 'গ্রিসও কিন্তু এই যুদ্ধবাজ আমেরিকানদের ইরাক আক্রমণের বিরুদ্ধে প্রতিবাদ জানিয়েছে, এখানকার বেশিরভাগ মানুষ খ্রিস্টান হওয়া সত্ত্বেও।'

রানা আরও বেশি অন্ধকারে। আমেরিকার ইরাক আক্রমণের সঙ্গে বা ভারত-পাকিস্তান-বাংলাদেশের রাজনৈতিক সম্পর্কের সঙ্গে রাহাত খানকে কিডন্যাপ করবার কী যোগাযোগ? আমিনা আথিয়ানা কি ওর আসল পরিচয় নয়? ও কি তা হলে সিআইএ এজেন্ট নয়?

'যুদ্ধ আসলে কেউ আমরা চাই না–বুশ আর ব্লেয়ার বাদে। যুদ্ধ কোন কিছুরই সমাধান নয়। তবে শক্তির ভারসাম্য অবশ্যই আমাদেরকে চাইতে হবে। সোভিয়েত রাশিয়া নেই বলেই আমেরিকা আজ সাহস করল বিশ্ব জনমতকে উপেক্ষা করে ইরাকের ওপর এভাবে হামলা চালাতে।'

রানার জিজ্ঞেস করতে ইচ্ছে করল, 'তুমি কোন পার্টি, হে?' হাসিটা চেপে রাখতে হলো ওকে। এরকম প্রশ্ন করলে আমিনার এত সুন্দর চেহারা দেখবার মত না-ও থাকতে পারে। এত কিছুর মধ্যে আশার ক্ষীণ একটু আলো দেখতে পাচ্ছে রানা। শত্রুপক্ষ যতই দৃঢ়প্রতিজ্ঞ হোক, অন্তত ওর সামনে বসা শত্রুটি নিজেদের উদ্দেশ্য সাধনে পুরোপুরি বেপরোয়া নয়। মেয়ে বলে নয়, নৈতিকতার স্বার্থেই বোধহয় বেশ কিছুটা নরম। রানা এমন একজনকে পেয়েছে, ভাগ্য অকৃপণভাবে সহায়তা করলে, যাকে শুভাকাঙ্ক্ষী হিসেবে পাওয়া বোধহয় অসম্ভব হবে না।

দ্বিতীয় কোর্স শুরু হতে আমিনা প্রসঙ্গ বদলে গ্রিক শিপিং ম্যাগনেটদের বিচিত্র

সব গল্প শুরু করল, তারপর আবার এক ফাঁকে এই গল্পের ভেতরও ভারতীয় প্রসঙ্গ টেনে আনল। রাষ্ট্রে সাম্প্রদায়িক সরকার ক্ষমতায় থাকলে কী হবে, তাদেরও কী গভীর রাজনৈতিক প্রজ্ঞা, রাষ্ট্রপ্রধান পদটা তুলে দিয়েছে বিজ্ঞানী আবুল কালামকে।

রানা প্রায় নিশ্চিত, এই মেয়ের সঙ্গে উপমহাদেশের গভীর কোন সম্পর্ক আছে।

তারপর হঠাৎ করেই ব্যক্তিগত প্রসঙ্গ চলে এলো। দারুণ স্বাদের টার্কিশ কফিতে চুমুক দিচ্ছে ওরা, আমিনা দ্রুত বলল, 'রানা। তোমাকে কিছু জিজ্ঞেস করতে চাই। এখন সাড়ে এগারোটা বাজে। আজ পূর্ণিমার রাত, অ্যাক্রপলিস আরও অনেকক্ষণ খোলা থাকবে। এখন রওনা হলে সবই দেখতে পাব আমরা। দেখলে এই পূর্ণিমার রাতেই দেখা উচিত তোমার। সে সৌন্দর্য বর্ণনার অতীত। আমি নিজেও আরেকবার দেখতে চাই। আমার অচেনা রাজপুত্র, তোমার সঙ্গে। তুমি আমাকে নিয়ে যাবে, লাভার বয়? তারপর...তোমার যা খুশি তুমি করতে পারবে।'

গড! এত সুন্দরী একটা মেয়ে শুধু কাউকে ফাঁদে ফেলবার জন্য এরকম নির্লজ্জ হতে পারে! উফ্, কী নাটকীয়তা, কী ভাবাবেগ–সবই নির্দিষ্ট একটা পয়েন্টে রানাকে পৌঁছে দিয়ে কেটে পড়বার উদ্দেশ্যে। ফ্যান্টাসিই, হে, ফ্যান্টাসিই! তবে ঘৃণা ও ক্রোধ ভালভাবেই চেপে রাখতে পারল এমআরনাইন। বসকে উদ্ধার করবার অ্যাসাইনমেন্ট না এটা? হাসতে হলো ওকে। বলতে হলো, 'হ্যাঁ, অবশ্যই। আমি তো এর কোন বিকল্প দেখছি না।'

সাত

অ্যাথিনী দেবীর মন্দির দূর থেকেই ভাল দেখায়, প্রচলিত এই কথাটার মধ্যে যথেষ্ট সত্যতা আছে। সতেরো শতাব্দীর প্রায় ভুলে যাওয়া এক যুদ্ধে এখানকার সব কিছু মারাত্মকভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছিল। মেরামতের কাজ প্রথমে জার্মানরা করে, কিন্তু তারা তাদের সুনাম বজায় রাখতে পারেনি। পরে আসে আমেরিকানরা, কিন্তু ঐতিহ্যের কদর তারা কীভাবে বুঝবে, সমস্ত পুরানো নির্মাণ ভেঙে নতুন জিনিস খাড়া করতে চেয়েছিল। ভাগ্যিস গ্রিক আর্কিওলজিস্টরা বাধা দিতে এগিয়ে এসেছিলেন

যাই হোক, পূর্ণচন্দ্রের উজ্জ্বল আলোয় আকাশ ছোঁয়া পাথুরে স্তম্ভগুলোর ফাঁকে ফাঁকে কত কী রহস্যের হাতছানি কাছ থেকেই অনুভব করা যায়। বিশ্বাস হতে চায় না চারপাশের মার্বেল পাথরের ভিড়ে একটা মৃত নগরী লুকিয়ে আছে।

রহস্যের গন্ধ আর বিপদের আশঙ্কা রানাও অনুভব করছে। আমিনাকে পাশে নিয়ে সাউদার্ন আইল ধরে এগোবার সময় কিছু একটা ঘটবার অপেক্ষায় রয়েছে ও। পাথুরে পাহাড় চূড়ায় প্রবল বাতাস বইছে; মানুষজনের উপস্থিতি কোথাও

জোড়ায় জোড়ায়, আবার কেউ বা একা হাঁ করে জোছনা পান করছে। এরা সবাই দেরি করে পৌঁছেছে—ভবঘুরে, প্রেমিক-প্রেমিকা, হাতে কম সময় নিয়ে এথেন্সে আসা ট্যুরিস্ট; সাইটের গেট বন্ধ হওয়ার আগে মিনিট কয়েক দেখে নিচ্ছে। এদের মধ্যে নিশ্চয়ই এমন একটা দল আছে যারা না ট্যুরিস্ট না প্রেমিক-প্রেমিকা। তাদেরকে খুঁজে বের করবার জন্য রানা কোনও শক্তি ব্যয় করল না। সময় হলে তারা নিজেরাই আসবে।

একটু পরেই সময় হলো। আমিনার মুখের ওপর লক্ষ রাখছিল রানা, সেখানে ভাবের পরিবর্তন ঘটতে দেখল। ঘাড় ফিরিয়ে ওর দিকে তাকাল সে। রানা ভাল লাগার অনুভূতিটা ঝেড়ে ফেলতে পারছে না, একই সঙ্গে হতাশাও বোধ করছে।

'রানা,' বলল আমিনা। 'ক্রিসি মু। কিস মি।'

নিজের বাহুর ভেতর টেনে নিল রানা তাকে। সরে এসে তার শরীর ওর শরীরে সেঁটে গেল। তার দৃঢ় ও শুকনো ঠোঁট ওর ঠোঁট জোড়ার সামনে খুলে গেল। আবার যখন বিচ্ছিন্ন হলো, পরস্পরের দিকে অপলক তাকিয়ে থাকল দু'জন।

'ক্ষমা কোরো আমাকে,' বিড়বিড় করল আমিনা।

রানার কাঁধের ওপর দিয়ে আরও সামনে চলে গেল তার দৃষ্টি, কুঁচকে উঠল ভুরু জোড়া। কয়েক মুহূর্তের মধ্যে পৌঁছে গেল তারা দু'জন। দু'জনেই দীর্ঘদেহী—একজন রোগাটে, আরেকজন মোটা। প্রত্যেকে নিজের জ্যাকেটের পকেটে হাত ঢুকিয়ে রেখেছে। রানার দু'পাশে পজিশন নিল তারা। মোটা লোকটা গ্রিক ভাষায় কথা বলল ওর সঙ্গে। ওকে তাদের সঙ্গে যাওয়ার নির্দেশ দিল। তারপর আরও কী যেন বলল, ঠিক শোনা গেল না। আমিনা অপর লোকটাকে দ্রুত কী যেন জিজ্ঞেস করল। এক মুহূর্ত ইতস্তত করে লোকটাও সমান তালে জবাব দিল। আমিনা আথিয়ানা সন্তুষ্টচিত্তে মাথা ঝাঁকাল, এক পা এগিয়ে এলো রানার দিকে, তারপর থুথু ছিটাল ওর মুখে।

ঝাঁকি খাওয়ার সময়টুকুও পায়নি, থুথু অনুসরণ করে এসে পড়ল আমিনার দুই হাত, একের পর এক ঘুসি খেয়ে ঘুরে উঠল রানার মাথা। একই সঙ্গে চলছে গ্রিক ভাষায় অনর্গল গালিগালাজ, তার মধ্যে 'বাংলাদেশী বেঈমান' সবচেয়ে ভদ্রগোছের। শারীরিক ব্যথার কথা বাদ দিলে রানা শুধু বিষণ্নতা অনুভব করছে। একবার চোখে পড়ল, বিব্রত মোটা লোকটার মুখে শব্দহীন অপ্রতিভ হাসি লেগে রয়েছে।

তারপর, হাত এখনও চলছেই, ভাষা বদলে ইংরেজি ধরল আমিনা। কণ্ঠে সেই একই ঝাঁঝ, একই গালিগালাজ, বরং যোগ হলো গালির নতুন নতুন মাত্রা। তবে গলা ফাটানো চিৎকারের ফাঁকে ফিসফিসও করছে সে, বলছে: 'কি বলছি মন দিয়ে শোনো। এই লোকগুলো...শত্রু!' চড়! 'আমরা পালাব। মোটকুটাকে আমি সামলাব। তুমি সামলাবে...' চড়! '...রোগাটাকে।' তারপর '...আমার পিছু নাও।'

থামল আমিনা, হাসতে হাসতে মোটা লোকটার দিকে এগোচ্ছে। স্রেফ বিদ্যুৎ খেলে গেল মেয়েটার শরীরে। অস্ত্র ভাঁজ করা হাঁটু। টার্গেট নরম তুলতুলে ঊরুসন্ধি। থ্যাচ্ করে একটা গা ঘিনঘিনে আওয়াজ। লোকটা যখন কুঁজো হচ্ছে,

গোদের ওপর বিষফোঁড়ার মত তার দুই চোখ লক্ষ্য করে আঙুল চালাল আমিনা। তার প্রতিটি আঙুলের নখ কম করেও আধ ইঞ্চি করে লম্বা। লোকটার কতটুকু সর্বনাশ ঘটল তা পরিমাপ করবার কোন উপায় নেই, কারণ গলা থেকে চিঁচি করে সামান্য আওয়াজ বের করে উপুড় হয়ে পড়ে গেল সে, শরীরটা মোচড় খাচ্ছে।

ইতোমধ্যে লড়াইয়ে জড়িয়ে পড়েছে রানাও। সচেতন কোন ইচ্ছে ছাড়াই দ্বিতীয় লোকটার দিকে এগোল ও। সে-ও হঠাৎ খেয়াল হতে মুখ ফেরাল ওর দিকে, তারপর ধাঁই করে একটা কোপ খেলো ঘাড়ের পাশে। দড়াম করে পড়ে গেল লোকটা, এই সুযোগে খপ্ করে আমিনার একটা হাত ধরে ছুটল রানা।

সোজা গাঢ় ছায়ার ভেতর সেঁধোল ওরা। পশ্চিম প্রান্তের মার্বেল পেভমেন্টে নেমে এসে রাস্তা পার হলো। তারপর পিচ্ছিল ঘাস মাড়িয়ে মাঠ ধরে ছুটল, সামনে ফটক। মাঠের একধারে লাল ও সোনালি রঙে রাঙানো দুটো মাথা এক হয়ে আছে, ওদের পায়ের আওয়াজ পেয়ে বিচ্ছিন্ন হলো—একটা ছেলে আর একটা মেয়ে নয়, দুটোই ছেলে; বিতৃষ্ণা বা বিরক্তি অনুভব করবার সময় পর্যন্ত নেই রানার, কারণ ফটকের দিকে নয়, আমিনা ওকে বাঁ দিকে টেনে নিয়ে যাচ্ছে। কারণ?

ফটকের কাছে আরও শত্রু থাকবার আশঙ্কা। কিন্তু অ্যাক্রপলিস থেকে বেরুবার আর কোন পথ আছে তো? থাকলে, সেখানেও যদি শত্রুরা অপেক্ষা করে?

আরও কোন পথ আছে কিনা রানার মনে পড়ছে না। আশ্চর্য, আমিনা কোথায় নিয়ে যাচ্ছে ওকে! যেখানেই নিয়ে যাক, যেতে আপত্তি করবার কোন কারণ নেই। মেয়েটাকে এখন আর বোধহয় অতটা শত্রু না ভাবলেও চলে।

পিছনে চিৎকার শুনে ছোটার গতি বাড়িয়ে দিতে হলো। আরেক জোড়া স্তম্ভিত শরীরকে পাশ কাটাল ওরা—একটা ছেলে, একটা মেয়ে। বিশ গজ সামনে পাহাড়-প্রাচীরের কিনারা, এত উঁচু যে নিচে লাফ দেয়া সম্ভব নয়, এত ঢালু যে তাড়াহুড়ো করে নামতে গেলে পা হড়কাবার ভয় আছে। তবে তির্যক রেখা তৈরি করে একটা পাথুরে দেয়াল এসে ঠেকেছে পাহাড়-প্রাচীরের গায়ে। ওপর থেকে একই রকম বাঁকা একটা পথ ধরে নিচে নেমে গেছে একগোছা মোটা ইলেকট্রিক তার। তারের গা রাবার বা প্লাস্টিক দিয়ে মোড়া। ঝুলে পড়ল ওরা। প্রথমে রানা, পরে আমিনা। দেয়ালে নেমে দৌড়। সামনে বাধা হয়ে দাঁড়াল কাঁটাতারের বেড়া। সেটাও টপকাল। আমিনাকে সাহায্য করল রানা।

নিচে নেমে চারদিকে চোখ বুলাল আমিনা। কাঁপা কাঁপা হাসি বেরুল গলা থেকে। পাশে দাঁড়ানো রানার গায়ে হেলান দিয়ে এখনও একটু হাঁপাচ্ছে। 'হেরোডেস অ্যাটিকাস-এর থিয়েটার। এইমাত্র শেষ হলো অনুষ্ঠান। আশা করি, সকল অর্থেই।'

রানার দৃষ্টিতে প্রশংসাই প্রশংসা। উদ্দেশ্য যা-ই হোক, মেয়েটা নিজের উপস্থিত বুদ্ধি, ক্ষিপ্রতা, শক্তি আর আত্মবিশ্বাস প্রমাণ করেছে। খুবই মূল্যবান একজন মিত্র বটে। ও বলল, 'বেরুবার বিকল্প পথ আছে, এটা তুমি জানতে।'

'সব দিক বিবেচনা করে প্ল্যান চূড়ান্ত করি আমরা। আমি চোখ বন্ধ করে

তোমাকে অ্যাক্রপলিসের মানচিত্র এঁকে দিতে পারব।'

'সুন্দরীর পরিচয়টা?'

'পরে হয়তো জানাব তোমাকে। এখন তোমার কাজ পথ তৈরি করে এই ভিড় থেকে আমাকে বের করা। রাস্তায় পৌঁছাতে পারলে একটা ট্যাক্সি ধরব। তার আগে প্রমাণ করো কতটা রাফ অ্যান্ড টাফ বাঙালী হতে পারো তুমি।'

পরবর্তী কয়েকটা মিনিট ধাক্কাধাক্কি, গুঁতোগুঁতি, এমনকি ধস্তাধস্তিও করতে হলো। রানা অনুভব করল পিঠ আর বুক বেয়ে ঘাম গড়াচ্ছে। থিয়েটার থেকে বেরুনো জনস্রোত আনন্দ-উল্লাসে মুখর, কারও কোন তাড়া নেই, কনুইয়ের গুঁতো খেয়েও তেমন কিছু মনে করছে না। দু'বার পরস্পরের কাছ থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে পড়ল ওরা। রানা ভাবল, মেয়েটা সটকে পড়েছে। আমিনা ধরে নিল, রানাকে শত্রুরা ধরে নিয়ে গেছে। তবে রাস্তায় ওরা দু'জনে একসঙ্গেই বেরিয়ে এলো। ট্যাক্সি আছে, কিন্তু ড্রাইভাররা লাটসাহেবের মত আচরণ করছে, বলছে কোথাও তারা যাবে না। বাবা অসুস্থ, এয়ারপোর্ট থেকে আনতে যেতে হবে, আমিনার এরকম করুণ শোকগাথা শুনে মাঝবয়েসী এক ড্রাইভারের মনে দয়া হলো।

গাড়ি ছুটছে, রানার কাঁধে মাথা ঠেকাল আমিনা; এত কাঁপছে, রানার ঠোঁটে চুমো খেতে গিয়ে ঠোঁট বারবার স্থানচ্যুত হয়ে গেল। অনেক উত্তেজনা আর বিপদের মধ্যে দিয়ে আসতে হয়েছে তাকে, তারই বিলম্বিত প্রতিক্রিয়া এই কাঁপুনি।

তার গায়ে-মাথায় হাত বুলিয়ে দিল রানা, কথা বলল নরম সুরে।

'থুথু ছিটানোর জন্যে দুঃখিত। যেভাবে খুশি প্রতিশোধ নিয়ো, আমি কিছু মনে করব না।' রানার একটা হাত তুলে নিয়ে নিজের মুখে ঘষছে আমিনা। 'তবে তখন ওটার প্রয়োজন ছিল। তারপর ধরো কী কী বিচ্ছিরি গালি দিলাম। আশা করছিলাম, এত দ্রুত বলছি তুমি কি আর সব বুঝতে পারছ। তুমি নিশ্চয়ই ধরে নাওনি অকথ্য ভাষায় এরকম গালি দেয়াতে আমি অভ্যস্ত?'

'এরকম উপস্থিত বুদ্ধি আর অভিনয় খুব কমই দেখা যায়,' বলল রানা। 'আমি সত্যি মুগ্ধ। লোক দু'জনকে পুরোপুরি বোকা বানিয়ে ছেড়েছ। তবে এখন আমি তোমাকে কয়েকটা প্রশ্ন করব। সে-সব প্রশ্নের উত্তর আমাকে পেতেও হবে, তাই না?'

ওর কাঁধের ওপর মাথা; সেটার ঝাঁকি অনুভব করল রানা।

'আমাকে অ্যাক্রপলিসে নিয়ে যাওয়ার দায়িত্ব ছিল তোমার ওপর। ওখানে তোমাদের দু'জন লোকের হাতে আমাকে তুলে দেওয়ার কথা ছিল। ঠিক?'

চাপা গলায় আমিনা শুরু করল, 'কিন্তু আমি চাইনি...'

'সেটা নিয়ে আমরা পরে কথা বলব। কিন্তু লোকগুলো যখন এলো, দেখে তোমার মনে হলো এরা আসল লোক নয়। এরকম কেন তোমার মনে হলো?'

একটা ঢোক গিলে সিধে হয়ে বসল আমিনা। 'আমরা...ওরা একেবারে কাছে চলে আসবার আগে একটা সংকেত বিনিময়ের ব্যাপার ছিল। ওরা রুমাল দেখাবে, আমি ঘাড় চুলকাব। কিন্তু ওরা রুমাল বের করল না। তাই ওদেরকে আমি বললাম, আমাকে জানানো হয়েছে লুকাস আর ইরিয়াস কাজটা করবে। উত্তরে

ওরা বলল, লুকাস আর ইরিয়াসকে অন্য অ্যাসাইনমেন্টে পাঠানো হয়েছে। কিন্তু লুকাস আর ইরিয়াস আমার বানানো নাম, এই নামে কাউকে আমি চিনিই না। এরপর আমি জুয়া খেলি–ধরে নিই, ওরা ইংরেজি জানে না। জুয়ায় জিতেছি বলেই এখন আমরা এখানে।'

'ধন্যবাদ,' বলল রানা, নিজেকে প্রশ্ন করল, মেয়েটা আমাকে সাহায্য করল, নাকি নিজের অজান্তে উল্টোটা? বসের কাছে পৌঁছানোর জন্য শত্রুদের হাতে ধরা পড়াটাই ছিল ওর লক্ষ্য। সেটা তো ঘটছে না। 'আমিনা, তুমি কার হয়ে কাজ করছ?' নরম সুরে জিজ্ঞেস করল ও। 'বলেছ আমাকে জানাবে।'

শান্ত সুরে আশ্বস্ত করল আমিনা। 'বলেছি–হয়তো। আপাতত কিছুই তোমাকে জানানো যাচ্ছে না। তা ছাড়া, ব্যাপারটা এত বড় যে সবটুকু আমি নিজেও জানি না। ওই লোকগুলো কারা ছিল? ব্যাপারটা ভীতিকর নয়? গত কয়েক ঘণ্টায় গোটা পরিস্থিতি নিশ্চয়ই বদলে গেছে। এমন হতে পারে যে তোমাকে হয়তো আসলে আমরা চাইছিই না। এ-ও বুঝতে পারছি না যে তাই বা কী করে হয়, বিশেষ করে...'

নিজের চিন্তাই আমিনাকে দিশেহারা করে তুলছে।

ইতোমধ্যে অ্যাক্রপলিসের ঘটনা সম্পর্কে রানা একটা ব্যাখ্যা পেয়েছে। আপাতত ঘটনা যেদিকে নিয়ে যায় সেদিকেই এগোতে হবে ওকে, ভরসা রাখতে হবে জিসানুল হকের লোকজনের দক্ষতা আর জুতোয় লুকানো খুদে ট্র্যান্সমিটারটার ওপর। গলাটা শুকিয়ে গেছে, জানতে চাইল, 'তুমি আমাকে কোথায় নিয়ে যাচ্ছ?'

'আমার বসের কাছে। তোমার সঙ্গে তাঁর কথা হওয়া দরকার। না-না, এ আমি জানি যে তোমাকে জোর করে কোথাও আমি নিয়ে যেতে পারব না। ড্রাইভারকে গাড়ি থামাতে বলে নেমে যেতে পারো তুমি। তবে, প্লিজ, তা যেয়ো না। তোমার সঙ্গে কথা হওয়া দরকার। আমার ওপর তোমার বিশ্বাস আছে?'

'এরমধ্যে বিশ্বাস-অবিশ্বাসের কোন প্রশ্ন নেই। তোমার সঙ্গে যেতে হবে আমাকে।'

'এটা আমার বোধগম্য হচ্ছে না। এই অ্যাসাইনমেন্টের বেশির ভাগই দুর্বোধ্য লাগছে।' ঘাড় ফিরিয়ে রানার হাত দুটো মুঠোয় ভরল আমিনা। 'তবে সুখী হওয়ার একটা কারণ আমার আছে। নাহ্, ঠিক সুখী নয়–মিনিট পনেরো আগের চেয়ে কম দুঃখিত, যখন আমি ধরে নিয়েছিলাম তোমাকে আর কোনদিন দেখতে পাব না।'

'তাই বুঝি?'

'ভাগ্যই তো, তাই না, এখনও আমরা একসঙ্গে রয়েছি? জানি, আমাকে বিশ্বাস করবার বা আমার ওপর নির্ভর করবার কোন কারণ নেই তোমার–তবে এটা তুমি সত্যি বিশ্বাস করো, করো না, রানা? এই কথাটা যে: আমি চাই আমরা দু'জন যতদিন পারা যায় একসঙ্গে থাকি?'

'হ্যাঁ।' যা অনুভব ও উপলব্ধি করছে তাই প্রকাশ করছে রানা। 'তোমার এই কথা আমি বিশ্বাস করি, আমিনা।'

পরস্পরকে চুমো খেলো ওরা; শত্রুতা, মারামারি, বেঈমানী আর খুন-

খারাবির যে জগতে ওরা কাজ করে সেটা থেকে এক মুহূর্তের জন্য বেরিয়ে এলো। ঠিক এই সময় স্পীড কমিয়ে দাঁড়িয়ে পড়ল ট্যাক্সি। পরস্পরকে ছেড়ে সরে বসল ওরা। স্বাভাবিক ভঙ্গিতে গাড়ি থেকে নামল দু'জন। ভাড়া মিটিয়ে ড্রাইভারকে বিদায় করল রানা।

জায়গাটা বন্দর নগরী পিরাউস-এর ঢোকার মুখে সরু একটা গলি। ছোট একটা বার দেখা যাচ্ছে, কাউন্টারের ওদিকে নিঃসঙ্গ এক বুড়ো ঝিমাচ্ছে। একটা মুদি দোকান। দেশলাই আকৃতির লম্বা দালানটা সম্ভবত স্কুল। অল্প কয়েকটা বাড়ি, সবই চুনকাম করা। একটা বাড়ি রাস্তা থেকে বেশ খানিক দূরে, মরচে ধরা রেইলিঙের পিছনে। আমিনা খোলবার সময় গেটটা ক্যাঁচক্যাঁচ আওয়াজ করল। তিন পাশের কিনারা পাকা, এরকম একটা উঠান পেরুচ্ছে ওরা। উঠানে কিছু ঝোপ আর আগাছা জন্মেছে। হাড্ডিসার একটা বিড়াল দ্রুত পাশ কাটাল ওদেরকে, লাফ দিয়ে রেইলিং টপকে অদৃশ্য হয়ে গেল। সদর দরজায় থেমে জটিল ঢঙে নক করল আমিনা, হাত বাড়িয়ে রানার একটা কব্জি ধরল।

বোল্ট সরানোর শব্দ। তারপর খুলে গেল দরজা। দরজার ভেতর দাঁড়িয়ে রয়েছে পিমাস রাহমানি। আমিনার ভাষায় সে তুরকি নয়, তবে তুরকির ভাব ধরে; আসলে আলবেনিয়ান।

ওদেরকে দেখামাত্র আতঙ্কে দুর্বোধ্য একটা শব্দ করল সে, কিন্তু পলক ফেলার আগেই পিস্তল বের করে ফেলল। ইঙ্গিতে ভেতরে ঢুকতে বলে দরজাটা বন্ধ করে দিল রাহমানি। রানার ওপর থেকে ভুলেও চোখ সরাচ্ছে না, স্পর্শের সাহায্যে দরজার বোল্ট লাগাল। আমিনা পথ দেখিয়ে চারকোনা একটা হলঘরে নিয়ে এলো রানাকে। হলঘরের মেঝেতে টাইলস্। উল্টোদিকে আরেকটা দরজা দেখা যাচ্ছে। আমিনার পিছু নিয়ে সেটার চৌকাঠে পৌঁছাল রানা।

পুরানো একটা টেবিলে দু'জন লোক বসে আছে। দু'জনই এমন লাফ দিল, ছিটকে পড়ে গেল চেয়ারগুলো। চিৎকার করে একের পর এক প্রশ্ন করছে তারা আমিনাকে। একজনের গলা কাকের মত কর্কশ। তিনজনের বাকযুদ্ধ চলছে, এই ফাঁকে লোকগুলোকে খুঁটিয়ে দেখে নিচ্ছে রানা।

একজনের বয়স হবে ত্রিশ, সুদর্শন, বয়েসের তুলনায় ওজন একটু বেশি—গ্রিক। দ্বিতীয় লোকটার বয়েস চল্লিশ থেকে পঞ্চাশের মধ্যে, গায়ের রঙ ফর্সা হলেও শ্বেতাঙ্গ নয়, মাথার চুল ছোট করে ছাঁটা, গ্রিক ভাষায় কথা বললেও এটা তার মাতৃভাষা নয়—নিঃসন্দেহে উপমহাদেশীয় , সম্ভবত ভারতীয়।

আবার বসের কিডন্যাপিং-এর সঙ্গে সম্ভাব্য উপমহাদেশীয় কানেকশন-এর আলামত দেখতে পাচ্ছে রানা। একবার এই চিন্তাও এলো মাথায়, রাহাত খান কি এই বাড়িতে আছেন?

গ্রিক লোকটা ঠোঁট কামড়ে ধরে ছুটল। বড় একটা ডেস্কে গাদা গাদা কাগজ-পত্র স্তূপ হয়ে রয়েছে, যেখান থেকে ফোনের রিসিভার তুলে দ্রুত ডায়াল করছে। ভারতীয় লোকটা আরও কিছুক্ষণ কথা বলল আমিনার সঙ্গে। লোকটা এখন ঘন ঘন রানার দিকে তাকাচ্ছে। অবশেষে আঙুল ঝাপটে আমিনাকে সরে যেতে বলে ওর দিকে এগিয়ে এলো। তাকে সন্ত্রস্ত দেখাচ্ছে, চোখে-মুখে ক্লান্তির ছাপ।

'সাবধানতা, ভাইসাব,' বলল সে, স্পষ্ট হিন্দীতে। 'আপনার অস্ত্রটা ধীরে ধীরে বের করে আমাকে দিন।'

পাশে রাহমানি রয়েছে, লোকটার কথামত কাজ করল রানা। ডেস্কে রাখবার আগে পেশাদারি দৃষ্টিতে পিস্তলটা ভাল করে একবার দেখে নিল লোকটা।

'আপনি বসুন, মিস্টার রানা,' এবার ইংরেজিতে বলল সে। 'এই, চেয়ারগুলো তুলছ না কেন?'

একটা সোফায়, আমিনার পাশে বসল রানা। ধমক খেয়ে চেয়ার দুটো তুলল রাহমানি।

'আপনার কি ড্রিঙ্ক চলবে?' লোকটা জিজ্ঞেস করল।

'ইয়েস। থ্যাঙ্ক ইউ।'

রাহমানিকে ইঙ্গিত করল লোকটা। 'দুঃখিত, এখানে শুধু উজো আছে। আমরা জানি আপনি মাঝেমধ্যে খুব দামি হুইস্কি খান–পেশাগত কারণে–কিন্তু এখানে আমাদের এনটারটেইনমেন্ট বাজেট খুবই কম।'

উজো ঘোল-এর মত দেখতে, একটা গ্লাসে ঢেলে রানার সামনে ধরল রাহমানি। 'Fiye apo tho, malaka?' হুমকির সুরে বলল সে, গরম চোখ দেখে মনে হলো রানাকে পুড়িয়ে ফেলবে। পর মুহূর্তে খালি হাতটা দিয়ে পিঠ চাপড়ে দিল রানার। 'ব্রাভো! সত্যিকার পুরুষমানুষ তুমি!'

'এবার, মিস্টার রানা।' হাত ঝাপটা দিয়ে রাহমানিকে সরিয়ে দিয়ে টেবিলের কিনারা ধরে সামনের দিকে ঝুঁকল ভারতীয় লোকটা, ভুরু জোড়া কুঁচকে আছে। 'আমার নাম ভগৎসিং আচারিয়া। ও আমার সহকারী, নাম অগাস্টাস। আমাদের হাতে সময় সম্ভবত খুব কম, কাজেই আপনার প্রতি অনুরোধ, বুদ্ধির পরিচয় দিয়ে দ্রুত আমার প্রশ্নের উত্তর দেবেন। আপনি নিশ্চয় বুঝতে পেরেছেন যে আমাদের প্ল্যান ছিল আজ রাতে আপনাকে এখানে ধরে আনা। ধরা হয়নি অথচ আপনি এখানে চলে এসেছেন। কেন?'

'আমার সামনে অন্য কোন বিকল্প ছিল? এটা আপনাকে বুঝতে হবে।'

'বুঝতে চাইছি। কিন্তু পারছি কই? গ্রিসে আসবার পিছনে আপনার উদ্দেশ্য কী?'

রানার চোখে রাগ। 'গুড গড, আপনারাই তো এখানে আমাকে আনিয়েছেন!'

আচারিয়ার চোখে পলক পড়ছে না। তারপর শ্রাগ করল সে। 'এখন বোধহয় এটা জিজ্ঞেস করা বুদ্ধিমানের কাজ হচ্ছে না। আজ রাতে সবই খুব গোলমেলে ঠেকছে। তবে উত্তরটা দিন, প্লিজ। আপনার মতে, কার হুকুমে লোকগুলো আপনাকে ধরতে এসেছিল? ওরা কারা?'

'আমার জানা নেই। সম্ভবত অত্যন্ত শক্তিশালী ফ্রিল্যান্স। যাই হোক, ওদের চেষ্টা সফল হয়নি। এবার আমাকে একটা প্রশ্ন করতে দিন। আপনাদের আরেক বন্দি কোথায়? তিনি কি এখানে?'

'এটা কি...' আচারিয়াকে পরাস্ত দেখাল। 'আপনার কথার মাথা-মুণ্ডু কিছুই আমি বুঝতে পারছি না!'

'তাহলে বলুন কে বুদ্ধির পরিচয় দিচ্ছে না। বেশ, আরেকটা। আমার কাছ

থেকে কী চান আপনারা? এখানে আপনাদের দয়ার ওপর নির্ভর করছে আমার ভবিষ্যৎ। এটুকু অন্তত জানাতেই পারেন আমাকে।'

'পারি,' আচারিয়া বলল। 'হ্যাঁ, পারি বৈকি। আপনাকে অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ বলে বিবেচনা করা হয়েছে। এতটাই গুরুত্বপূর্ণ যে আপনাকে ধরবার প্ল্যানটা আমার হাত থেকে নিয়ে আরেক অফিসারকে দেয়া হয়।'

'ও।'

'ধরে আনবার পরে এই সেফহাউসে দিন তিনেক আপনাকে আটকে রেখে ছেড়ে দেওয়ার কথা। তার আগে জেরা করে জেনে নিতে হবে এথেন্সে আপনি কেন এসেছেন। এ-সব ছিল আমাকে দেয়া নির্দেশ। তবে ব্যক্তিগতভাবে আমার সন্দেহ ছিল দ্বিতীয় কাজটায় কতটুকু সাফল্য আসবে। এসপিওনাজ জগতে এটা সবাই জানে যে আপনাকে দিয়ে কথা বলানো প্রায় অসম্ভব।'

প্রবল একটা উত্তেজনার তোড় চেপে রেখেছে রানা। ও প্রায় নিশ্চিত যে প্রকৃত সত্য দেখতে পাচ্ছে। আচারিয়ার স্পষ্টবাদী ভূমিকা দেখে মনে হচ্ছে না এরকম সংকটময় আর ঘোলাটে সময়ে অযথা মিথ্যেকথা বলবে সে। তার কথা থেকে এটাই বেরিয়ে আসে–সে, রানা, যেভাবেই হোক, এক ষড়যন্ত্র থেকে আরেক ষড়যন্ত্রে জড়িয়ে পড়েছে। অ্যাক্রপলিসের লোকগুলো ছিল প্রথম শত্রুপক্ষ, তারাই রাহাত খান আর রানাকে নিয়ে ভয়ঙ্কর ষড়যন্ত্র করেছে। এর অর্থ দাঁড়ায়, এই ভারতীয় আচারিয়ার সঙ্গে কোন ধরনের চুক্তিতে আসা সম্ভব। তবে সতর্কতায় ঢিল দেয়া চলবে না। কারণ–এখনও পুরোপুরি নিশ্চিত নয় ও। এ-ধরনের নাটকে সবকিছুই অনিশ্চিত থাকে যতক্ষণ দৃশ্যটা মঞ্চস্থ না হয়–মানে আদৌ যদি ততক্ষণ মূল নায়ক বেঁচে থাকে আর কি। গলার স্বর গম্ভীর করে ও বলল, 'আমি আপনার কথা বিশ্বাস করছি। উপমহাদেশীয় বিরোধের কারণে পরস্পরকে কখনও আমরা চরম শত্রু বলে মনে করি, আবার কখনও পরম বন্ধুর মত আলিঙ্গন করি। এই কেসে আমাদের দু'পক্ষের উদ্দেশ্য হয়তো এক নয়, তবে তারচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ বলে মনে হচ্ছে তৃতীয়পক্ষের অশুভ উপস্থিতি। তুচ্ছ স্বার্থ নিয়ে নিজেদের মধ্যে বিরোধ বাধাতে এত ব্যস্ত আমরা, ওই অশুভ তৃতীয় পক্ষের উপস্থিতি সন্দেহই করতে পারিনি। ওরা সম্ভবত আমাদের দু'পক্ষেরই কমন শত্রু। তাই বলি কি, আসুন, আমরা একজোট হই।'

'রাজি।' ভগৎসিং আচারিয়ার রেখা ও ভাঁজবহুল মুখ থেকে টেনশন অনেকটাই দূর হলো। রাহমানির উদ্দেশে আবার সংকেত দিল সে। 'আসুন, ইনফরমেশন ভাগাভাগি করি। অন্তত কিছু ইনফরমেশন। আমি যাদের প্রতিনিধি তারা এই এলাকায় অতীব গুরুত্বপূর্ণ...উম্...ইয়ে...একটা অনুষ্ঠানের আয়োজন করছেন। পরিষ্কার জেনে রাখুন, ব্যাপারটা আপনাদের বিরুদ্ধে কিছু নয়, বরং পক্ষে। এই অনুষ্ঠানের দ্বারা আমরা অনেকেই ভবিষ্যতে উপকৃত হব। আমরা বলতে আমি শুধু উপমহাদেশকে বোঝাচ্ছি না।'

'আপনি আরও ভেঙে বলুন। আমার সামনে থেকে অন্ধকার কাটছে না।'

মাথা নাড়ল আচারিয়া। 'প্রথমেই যেটা বলে নেয়া উচিত ছিল সেটা এখন বলি। গোটা ব্যাপারটা টপ সিক্রেট। আমি ছাব্বিশ বছর এসপিওনাজের সঙ্গে

জড়িত, আমার প্রফেশনাল জীবনে এরচেয়ে টপ সিক্রেট কিছু দেখিনি।' রাহমানির হাত থেকে উজো ভর্তি গ্লাস নিয়ে আড়চোখে সেটার দিকে তাকাল সে। 'গুড লাক।'

'হ্যাঁ, ভাগ্যের সহায়তা খুবই দরকার হবে।'

'তা যা বলেছেন। আমার কাজ হলো ওই অনুষ্ঠানে বা ঘটনায় বাইরের কেউ যাতে বিঘ্ন সৃষ্টি না করে সেটা দেখা। আমাদের অবজারভাররা আপনার আগমন রিপোর্ট করে আমাকে। খবরটা আমি সঙ্গে সঙ্গে আমার ওপরঅলাকে জানাই। নির্দেশ পাই আপনার বিরুদ্ধে মুভ করবার। এথেন্সে আপনার উপস্থিতি, এরকম একটা সময়ে, কাকতালীয় ব্যাপার হতে পারে না। তা ছাড়া, অতীতে এ-ধরনের অনুষ্ঠান পণ্ড করে দেওয়ার রেকর্ড আছে আপনার, তাই না?'

অগাস্টাস ঠকাস করে ফোনের রিসিভার নামিয়ে রেখে দ্রুত এগিয়ে এলো। আচারিয়ার সামনে দাঁড়াল সে। ঘন ঘন হাঁপাচ্ছে, প্রচুর ঘামছে। মুখ থেকে বিস্ফোরিত হয়ে বেরিয়ে এলো মাতৃভাষা গ্রিক। লোকটা এত দ্রুত কথা বলছে, মাত্র দু'একটা শব্দের অর্থ ধরতে পারল রানা। চেহারা দেখে মনে হলো তার বক্তব্য শুনে আচারিয়া আর আমিনা কাতর হয়ে পড়েছে।

আলোচনা শেষ করে অগাস্টাস নতুন নির্দেশ নিয়ে টেলিফোনের কাছে ফিরে গেল, আচারিয়া তাকাল রানার দিকে। তার চোখ-মুখ আগের চেয়ে গম্ভীর। মুখ খোলার আগে সরু ফ্রেমের চশমাটা নাকে ঠিকমত বসিয়ে নিল। 'আমাদের কমন এনিমি চরম নিষ্ঠুরতার পথ বেছে নিয়েছে। যাদের ওপর দায়িত্ব ছিল আপনাকে এখানে নিয়ে আসবে, তারা খুন হয়ে গেছে।'

আমিনা ফোঁস করে একটা দীর্ঘশ্বাস ফেলল।

'এভাবে এজেন্টদের মেরে ফেলবার ঘটনা প্রমাণ করে আমরা যা করতে যাচ্ছি, যে-কোন মূল্যে সেটা ব্যর্থ করবার চেষ্টা চলবে। আরও পরিষ্কার হয়ে যাচ্ছে, আমার আন্ডারে যে ফোর্স ছিল তা হঠাৎ করে অকেজো হয়ে পড়েছে।' ঢক ঢক আওয়াজ করে দুই ঢোকে গ্লাসটা খালি করে ফেলল আচারিয়া। 'আমাদের অর্গানাইজেশনে একজন বিশ্বাসঘাতক আছে। যা ঘটেছে, এর আর অন্য কোন ব্যাখ্যা নেই। এটা আপনার কাছে স্বীকার করতে আমার লজ্জা হচ্ছে, তবে আমরা এখন মিত্র। এই দেখুন কাণ্ড, ভগবান! এতক্ষণে মনে পড়ল। ভাইসাব, আমরা করমর্দন করিনি।'

সোফা ছেড়ে দাঁড়াল রানা। আচারিয়ার হাতটা শক্ত আর শুকনো লাগল।

'যে কর্মকর্তা আপনাকে আটক করবার প্ল্যান তৈরি করেছিলেন, প্রথমে তাঁকেই সন্দেহ করতে হয়।' টেবিলের কিনারা ধরে সামনে ঝুঁকে থাকবার আড়ষ্ট ভঙ্গিটায় আবার ফিরে গেল আচারিয়া। 'এখনি অন্তত দু'জনকে আমি সন্দেহের তালিকা থেকে বাদ দিতে পারি। দু'জনেই এই মুহূর্তে আমাদের সঙ্গে। আপনি এথেন্সে এসেছেন, এই রিপোর্ট পাওয়ার পর থেকে অগাস্টাস আমাকে ছেড়ে কোথাও যায়নি। আর আপনাকে আটক করবার প্ল্যানের ডিটেইলস্ কিছুই মিস আথিয়ানা জানত না। রাহমানিকে আমি যুক্তি দিয়ে তালিকার বাইরে রাখতে না পারলেও, ওকে আমি বিশ্বাস করি।

'এখন আমার করণীয় পরিষ্কার। এই তিনজনকে নিয়ে অন্য এক সেফহাউসে সরে যাব, যেখানকার ঠিকানা একা শুধু আমি জানি। যা করবার ওখান থেকে করতে হবে আমাকে। নয়া দিল্লি রিপ্লেসমেন্ট পাঠাবে, আর এদিকে অগাস্টাস নতুন স্থানীয় হেলপার সংগ্রহ করবে। তবে এ-সবে সময় দরকার। অথচ এটারই অভাব আমাদের। আপনি কি আমাদের সঙ্গী হবেন, মিস্টার রানা, নাকি নিজের লোকজনদের সঙ্গে আলোচনা করে সিদ্ধান্ত নেবেন? তাই যদি হয়, দেওয়ার মত তথ্য থাকলে এখনি দিলে কৃতজ্ঞ বোধ করব আমি।'

রানা কিছু বলবার আগেই বাড়ির গেট ক্যাঁচক্যাঁচ করে উঠল। সম্ভবত ইচ্ছে করেই তেল দেয়া হয় না, আন্দাজ করল রানা। আওয়াজটা স্পষ্ট, সবাই শুনতে পেল। আচারিয়ার মুখ টান টান হলো। রাহমানির দিকে ঘাড় ফিরিয়ে মাথা ঝাঁকাল সে।

রাহমানি দরজার দিকে পা বাড়াল।

নীরব পরিবেশ।

তারপর সদর দরজায় জটিল সাংকেতিক নক হলো, যে-ধরনের নক আমিনাকে করতে শুনেছে রানা। অগাস্টাসের পেশীতে ঢিল পড়ল। কিন্তু বাকি তিনজন এখনও কাঠ হয়ে দাঁড়িয়ে। আচারিয়া তীক্ষ্ণ কণ্ঠে হুকুম করল। রাহমানি নিঃশব্দে, দৃঢ় পায়ে এগোল আবার। হলঘরে আলো কম, সেটা পেরিয়ে সদর দরজার সামনে থামল সে। প্রথমে চেইন সরাল, তারপর কবাট দুটো ইঞ্চি দুয়েক ফাঁক করল। এক সেকেন্ডের মত থেমে কবাট জোড়া আবার বন্ধ করল সে, চেইনও লাগাল। তারপর ঘুরল, হেঁটে ফিরে এলো ভেতরের কামরায়—তবে এবার দৃঢ় পদক্ষেপে নয়, নিঃশব্দেও না।

ওদের কাছে ফিরে এসে রাহমানি আচারিয়ার দিকে তাকাল শুধু বাঁ চোখ দিয়ে। তার ডান চোখের বদলে সেখানে এখন লাল একটা গর্ত, কিনারাগুলো কালো ও গোলাপি। অবশেষে তার শরীর যেন সমস্ত বৈশিষ্ট্য হারাতে শুরু করল, পদার্থ বা বস্তু বলে কিছু থাকছে না, যেন তার মাংস বালিতে পরিণত হয়েছে—আচারিয়ার পায়ের সামনে আছাড় খেয়ে পড়ে গেল।

আট

এখন আর সন্দেহ করবার সময় নেই। আচারিয়া ছুঁড়ে দিতে রানা ওর ওয়ালথার অটোমেটিকটা লুফে নিল। একটা ঘূর্ণির মত আলোর সুইচের দিকে মোচড় খেলো অগাস্টাস—গাঢ় অন্ধকারে ঢাকা পড়ে গেল সব। কেউ একজন—আচারিয়া—এলোমেলো পা ফেলে জানালার দিকে এগোচ্ছে। 'না!' দ্রুত সাবধান করল রানা। 'ওরা এটাই আশা করছে। জানালটা নিশ্চয়ই সামনের দিকে।'

'হ্যাঁ। ধন্যবাদ।'

'পিছন দিক দিয়ে বেরুবার চেষ্টা করাটা বোকামি...'

'হ্যাঁ,' রানার কথা শেষ হওয়ার আগেই জবাব দিল আচারিয়া।

প্রায় অন্ধকার হলঘরে ঢুকল ওরা। আচারিয়া অত্যন্ত সাবধানে দরজার চেইন খুলল।

'আমরা আরও এক মিনিট দেরি করব, ওদের সতর্কতায় একটু হলেও যাতে ঢিল পড়ে। তারপর এভাবে বেরুব–প্রথমে অগাস্টাস, তার পিছু নিয়ে মিস্টার রানা, আমিনা আর আমি। রাস্তার বাঁয়ে ত্রিশ গজ এগোলে একটা গলি পাওয়া যাবে, দু'দিকের পাঁচিলই খুব উঁচু। সবাই ওখানে জড়ো হব।'

গ্রিক ভাষাতেও কিছু বলল আচারিয়া, অগাস্টাস হুঁ-হ্যাঁ করে জবাব দিল। সেকেন্ডগুলো নিঃশব্দে বয়ে যাচ্ছে। রানার হাত ধরে বুকের সঙ্গে চেপে ধরল আমিনা। তার হার্টবিট অনুভব করছে ও–দ্রুত, তবে উন্মত্ত নয়। ও তার নরম আঙুলে শুকনো ঠোঁট বুলাল।

'গুড লাক, মাই ফ্রেন্ডস।' আচারিয়ার আঙুল দরজার নব ঘোরাচ্ছে। রানার মনে হলো অগাস্টাসের কাঁধটা মুহূর্তের জন্যে একবার ছুঁলো সে। পরক্ষণে দরজা খুলে গেল, সবাই ওরা ছুটতে শুরু করেছে।

শত্রুরা গেট খোলা রেখেছে–ওদের জন্য ভাগ্যের বিরাট সহায়তা, শত্রুপক্ষের মস্ত গাফলতি। প্রথম দফা গুলি ছুটল চারজনই ওরা চাঁদের আলো আর ছায়া মেখে পড়ে থাকা রাস্তায় বেরিয়ে আসবার পর। গান মাজল্ ঝলসে উঠল উল্টোদিকের একটা বন্ধ দোকানের দোরগোড়া থেকে। সঙ্গে সঙ্গে অগাস্টাসের গলা থেকে চাপা কান্নার মত একটা আওয়াজ বেরুল, মাথাটা ঝাঁকি খেলো পিছন দিকে, হোঁচট খেতে খেতে কয়েক পা এগিয়ে দড়াম করে সটান পড়ে গেল। অটোমেটিক ধরা হাত ঝট করে ঘুরিয়ে দোরগাড়ার দিকে তিনটে গুলি করল রানা। এত দ্রুত যে মাত্র একটা আওয়াজের মত শোনাল। পাথর দিয়ে বাঁধানো রাস্তায় লেগে দিক্‌বিদিক্ ছিটকে গেল বুলেটগুলো। চট করে একবার বাম দিকে তাকাতে আমিনাকে অলিম্পিক স্প্রিন্টারের মত ছুটতে দেখল রানা, ওর আর আচারিয়ার কাছ থেকে সমান দূরত্ব বজায় রেখে, শত্রুরা যাতে একই সঙ্গে জোড়া টার্গেট পেয়ে না যায়। বুদ্ধিমতী!

রানা আর আমিনার মাঝখানে চড়চড় করে কী যেন ছুটে এলো, হাঁটু সমান ওপর দিয়ে। গান মাজল ঝলসে উঠল আচারিয়া যে গলিটার বর্ণনা দিয়েছে সেদিক থেকে। ডান দিকে সরে এলো রানা, শূন্যে পাক খেয়ে শরীর ঘোরাল। মাটিতে হাঁটু গাড়ল একটা, পরবর্তী ফ্ল্যাশ দেখতে পেয়ে যে গুলিটা করল সেটা সম্ভবত তিন ফুট ব্যবধান রেখে পাশ কাটাল আচারিয়াকে, তারপরই শুনতে পেল চাপা একটা আর্তনাদ। তড়াক করে এক লাফে সিধে হলো আবার, তির্যক রেখা তৈরি করে রাস্তা পেরুচ্ছে, কুঁজো হওয়ার স্বাভাবিক অথচ বিপজ্জনক প্রবণতা দমিয়ে রেখে। মাথা নিচু করলেই গতি কমে যাবে, লক্ষ্যভেদ করবার অনেক বেশি সময় পাবে শত্রু। গলিতে ঢুকল ও, আপাতত বিপদ থেকে মুক্ত। আচারিয়া আর আমিনা আগেই পৌঁছেছে, তাদের সামনে একজন পড়ে আছে।

মনে খুঁতখুঁতে ভাব, ছায়ার ভেতর নয় ও; উঁকি দেওয়ার জন্য সামনে ঝুঁকে

নিজের ডান দিকে তাকাল রানা। দোকানটার দোরগোড়া দেখতে চাইছে। সঙ্গে সঙ্গে গান মাজল্ ঝলসে উঠল, বুলেটটা লাগল রানার মাথা থেকে দু'গজ দূরের পাঁচিলে, তারপর বাতাসে শিস কেটে বেরিয়ে গেল ওর নাকের সামনে দিয়ে। ঝট করে পিছিয়ে এলো ও, তবে গুলিটা ছিল ভয় দেখানোর জন্য করা। আবার যখন উঁকি দিল, নিজের জায়গা ছেড়ে বিশ গজ এগিয়ে গেছে লোকটা, প্রাণপণে দৌড়াচ্ছে। এ-ধরনের টার্গেটের পিছনে বুলেট নষ্ট করবার কোন মানে হয় না।

গোটা অপারেশনে আধ মিনিটও লাগেনি, অথচ চারপাশ এরই মধ্যে জ্যান্ত হয়ে উঠছে: প্রতিটি জানালায় আলো দেখা যাচ্ছে, চারদিক থেকে লোকজনের চিৎকার ভেসে আসছে, দুটো কুকুর ঘেউ ঘেউ করছে অনবরত। সন্দেহ নেই বাড়িটা পিছন দিকটা যারা কাভার দিচ্ছিল এবার তারা সামনের দিকে চলে আসবে। এখানে আর অপেক্ষা করবার মানে হয় না। তবে কেটে পড়বার আগে…

ছুটে পড়ে থাকা অগাস্টাসের পাশে চলে এলো রানা। গ্রিক লোকটা উপুড় হয়ে পড়ে আছে। হাত দুটো সামনের দিকে এমনভাবে বাড়ানো, সে যেন ডাইভ দিচ্ছে। বাম শোল্ডার-ব্লেডের নিচে সস্তা সুতি জ্যাকেট ফুটো হয়ে আছে, ফুটোর চারপাশে জমাট বেঁধে যাচ্ছে রক্ত। চিৎ করল রানা, অসাড় হাত-পা নড়বড় নড়বড় করছে। তার বিস্ফারিত চোখ দুটো আঙুলের আলতো ছোঁয়ায় বন্ধ করে দিল ও। বাড়িটার দিকে দ্রুত একবার তাকিয়ে এক ছুটে গলিতে ফিরে এলো। এখানে দ্বিতীয় লোকটার সামনে থামল, যে অস্ত্রধারীকে ও ফেলে দিয়েছে।

লোকটা এখনও হয়তো পুরোপুরি লাশ হয়ে যায়নি। অদ্ভুত এক আড়ষ্ট, আধ-বসা অবস্থায় স্থির হয়ে আছে, পিঠ ঠেকে আছে গলির পাঁচিলে। ওয়ালথারের বুলেট বুকে যে গভীর ক্ষত সৃষ্টি করেছে সেটার দিকে মন নেই রানার। ওর দৃষ্টি কেড়ে নিয়েছে মুখটা। নিষ্প্রভ চেহারা, খাড়া নাক, চোখের পাতা অস্বাভাবিক বড়—এই মুহূর্তে আধ বোজা, ফলে মনে হচ্ছে চোখ দুটোয় হুড পরানো হয়েছে। কমবেশি ত্রিশ ঘণ্টা আগে এই মুখ কোয়ার্টারডেকে দেখেছে রানা: ওকে যারা ধরতে চেয়েছিল, তাদের লীডার। বস্কে যে মার্কিনিরা কিডন্যাপ করেছে, তাতে বোধহয় খুব একটা সন্দেহ নেই, কারণ এই লোকটা নির্ঘাত আমেরিকান।

সময় কম। সিধে হয়ে সঙ্গী দু'জনের দিকে তাকাল রানা। দৃশ্যটা হতাশায় দুর্বল হয়ে পড়বার জন্য যথেষ্ট। গলির আরেক পাঁচিলে হেলান দিয়ে দাঁড়িয়ে রয়েছে আচারিয়া, ছোট ছোট নিঃশ্বাস ফেলছে। মুখ তুলে রানার দিকে তাকাল সে। কথা বলবার শক্তি কষ্ট করে সঞ্চয় করতে চাইছে, কিন্তু পারছে না।

'আমার ধারণা পিঠে গুলি লেগেছে,' ফিসফিস করল আমিনা। 'দোরগোড়ার লোকটা।'

এখনও কথা বলবার ব্যর্থ চেষ্টা করছে আচারিয়া। কয়েক সেকেন্ড পর বুঝল, সম্ভব নয়। তারপর একটা হাত তুলে পর পর দু'বার রানা আর আমিনাকে, আমিনা আর রানাকে দেখাল—যে-কোন শব্দের চেয়ে ইঙ্গিতটা অনেক বেশি অর্থবহ। তারপর হঠাৎ নিচের ঠোঁট টকটকে লাল হয়ে উঠল। এক সেকেন্ড পর খুলে গেল মুখ, স্রোতের মত রক্ত বেরিয়ে আসছে। চোখ দুটো নিষ্প্রাণ হয়ে গেল, সেই সঙ্গে মারা গেল ইন্ডিয়ান সিক্রেট সার্ভিসের এজেন্ট মেজর ভগৎসিং

আচারিয়া। ঢাকনিবিহীন নর্দমায় ঢলে পড়ছিল লাশটা, খপ করে ধরে ফেলল আমিনা। মৃতদেহ টেনে সরিয়ে আনল সে, তারপর ছেড়ে দিয়ে রানার দিকে তাকাল।

আমিনা কাঁদছে। 'মিস্টার আচারিয়ার শেষ ইচ্ছে ছিল...'

'জানি,' বলল রানা। 'আমরা যেন একসঙ্গে কাজ করি।' ভারতীয় সিক্রেট এজেন্টের সঙ্গে মিনিট পনেরোর বন্ধুত্ব খারাপ লাগেনি রানার। 'এখন আমাদের সামনে আরও অনেক দৌড়াদৌড়ি আছে। তুমি নিরাপদ কোন জায়গা চেনো?'

'এটা কোন সমস্যা নয়। আমার এক বন্ধু আছে, সে আমাদের দেখবে।'

আমিনার বন্ধুর নামটা রানার জানা হলো না। মেয়েটা ব্রুনেট, অর্থাৎ তার মাথার চুল গাঢ় খয়েরি। খুব দামি নাইটড্রেস পরনে। ভোর তিনটের সময় দরজা খুলতে বিরক্ত বোধ করল না দেখে মনে মনে বিস্মিত হলো রানা। ওদের দু'জনের চেহারাই সন্দেহজনক–আমিনার কাপড় কয়েক জায়গায় ছেঁড়া ও কাদা মাখা, রানার হাতের চামড়া ছড়ে গেছে, ট্রাউজারের নিচের দিকে শুকনো কাদা। এ-সবও মেয়েটা বিশেষ খেয়াল করল না। দুই বান্ধবী অবশ্য নিজেদের আঞ্চলিক ভাষায় ফিসফাস করল কিছুক্ষণ। বন্ধু, বলা উচিত বান্ধবী, রানার দিকে ফিরে প্রশ্রয়দানের হাসি হাসল, তারপর বিদায় নিয়ে চলে গেল বেডরুমের দিকে। বেডরুম থেকে একটা ঘুম জড়ানো পুরুষকণ্ঠ কী যেন জিজ্ঞেস করল। তীক্ষ্ণ কণ্ঠে জবাব দিল মেয়েটা, তারপর নারী ও পুরুষকণ্ঠ একযোগে হেসে উঠল।

'ভাগ্যটা ভাল আমাদের,' বলল আমিনা, বান্ধবী আর তার স্বামীর হাসি শুনে নিজেও মুচকি মুচকি হাসছে। 'স্পেয়ার রুমটা খালি আছে। ফ্রিজে ঠাণ্ডা চিকেন আর বিয়ার আছে, যত খুশি খেতে পারব। তুমি যা-যা পাও নিয়ে এসো কিচেন থেকে, আমি এদিকে বিছানা ঠিকঠাক করি।'

ওর কপালে চুমো খেয়ে কিচেনে চলে এলো রানা। ফ্রিজে ঠাণ্ডা চিকেন ছাড়াও ছাগলের দুধ দিয়ে তৈরি পনির আর পাকা টসটসে ডুমুর পেল ও।

খাবারের ট্রে নিয়ে বেডরুমে ঢুকে দেখল, দেয়ালগুলো ব্রোকেডের ভারী পর্দা দিয়ে ঢাকা। তবে রানার চোখ একা আমিনাকেই শুধু দেখতে চাইছে। এরই মধ্যে চাদরের তলায় শরীর ঢেকে ফেলেছে মেয়েটা–বোঝার উপায় নেই চাদরের নিচে তার শরীরে কাপড়চোপড় আছে কিনা।

'শুয়ে পড়েছ যে?' জিজ্ঞেস করল রানা। 'খাবে না?'

'তুমি আমাকে নিজের হাতে খাইয়ে দেবে,' আদুরে গলায় বলল আমিনা। 'তা না হলে আমার মুখে কিছু রুচবে না।'

খাওয়াদাওয়ার পর্ব শেষ করে আলো নেভাল ওরা, তবে সঙ্গে সঙ্গেই যে ঘুমিয়ে পড়ল তা নয়। অবশ্য তারপরের ঘটনা ওরা কাউকে কোনদিন বলবে বলে মনে হয় না।

খুব সকালে ফ্ল্যাটটা থেকে বেরিয়ে এসে প্রাথমিক কাগজগুলো সেরে নিল ওরা। মধু আর মাখন দিয়ে রোলস খেলো মোড়ের একটা কাফেতে বসে, ছয় চাকার প্রকাণ্ড এক হলুদ বাসে চড়ে কনস্টিটিউশন অ্যাভিনিউ-এ পৌঁছাল, স্টাডফু শপিং মলে চরকির মত ঘুরে আমিনার জন্য কিছু কেনাকাটা করা হলো। নজর

রাখা হচ্ছে, এই ভয়ে সে তার নিজের ফ্ল্যাট লাইকিয়ানাও-এ ফিরতে পারবে না। ওখান থেকে হেঁটে রানার হোটেলের দিকে ফিরছে ওরা, সারাটা পথ ভিড়ের ভেতর মিশে থাকল। হোটেলের ওপরও নিশ্চয় নজর রাখা হচ্ছে, তবে এখানে ওরা সন্ধ্যা পর্যন্ত নিরাপদ থাকবে বলে ধরে নেয়া চলে।

শাওয়ার সেরে দ্রুত কাপড় পাল্টাল ওরা। বাদামী মার্বেল বাথরূমে দাড়ি কামাবার পর রানার মনে হলো অবশিষ্ট ক্লান্তিটুকুও দূর হয়ে গেছে। অবশেষে নীল কাউচে বসল আমিনা, রানা বসল বিছানার কিনারায়, শুরু হলো রণকৌশল নিয়ে গুরুগম্ভীর আলোচনা।

'প্রথমে তোমার অবস্থাটা বিবেচনা করা যাক,' শুরু করল রানা। 'তোমার বিপদ এক কথায় মারাত্মক। আচারিয়া বিশ্বাস করতে পারত এমন তিনজনের মধ্যে একমাত্র তুমিই বেঁচে আছ। নিজের অর্গানাইজেশনের সঙ্গে যোগাযোগ করতে যাওয়াটা মোটেও উচিত হবে না তোমার। তার ওপর, কাল রাতে যা ঘটেছে, সেই বিশ্বাসঘাতক চরিত্রটি এবার উঠে পড়ে তোমাকেও খুন করাবার চেষ্টা করবে। হ্যাঁ, ইচ্ছে হলে নিখোঁজ হয়ে যেতে পারো তুমি–সালোনিকা বা অন্য কোথাও পালিয়ে গেলে, অপেক্ষা করলে যতদিন না পরিস্থিতি ঠাণ্ডা হয়। তবে না, তা তুমি করবে না। তাই না?'

ঠোঁটে হাসি, আমিনা বলল, 'না। অন্তত দুটো কারণে।'

'বেশ। তা হলে তোমার সামনে বিকল্প একটাই উপায় রইল, তোমার দলকে আমার দলের সঙ্গে এক করে ফেলা। তুমি আমার অ্যাসিস্ট্যান্ট হতে পারো। রাজি?'

'রাজি।' মাথা ঝাঁকাল আমিনা। 'তবে মনে রাখতে অনুরোধ করছি, আমার আনুগত্য নতুন দিল্লির প্রতিই থাকছে, ইন্ডিয়ান সিক্রেট সার্ভিসের গ্রিক এজেন্ট আমিনা আথিয়ানা নেমকহারাম হতে পারবে না।' একটু থেমে আবার বলল, 'আমি সুযোগ পেলেই নতুন দিল্লির সঙ্গে যোগাযোগ করে কী ঘটেছে জানাব ওদেরকে। ঠিক আছে?'

'হ্যাঁ, ঠিক আছে। তবে তোমাদের এখানকার দূতাবাসের কারও সঙ্গে যোগাযোগ করাটা বুদ্ধিমতীর কাজ হবে না, বিশেষ করে যখন জানো না কাকে তোমার বিশ্বাস করা উচিত নয়। সবচেয়ে ভাল হয় পাবলিক লাইন থেকে টেলিফোন করলে। শুধু ভগৎসিং আচারিয়ার নাম বলবে। অপরপ্রান্তে কী প্রতিক্রিয়া হয় বোঝার পর যা বলতে হয় বলবে। এমনও হতে পারে যে ফোনটা হয়তো সেই লোকই ধরবে, নিজেকে যে শত্রুদের কাছে বিক্রি করে দিয়েছে। তবে কিছু করবারও নেই। তাই না?'

'নেই।'

'গুড। এবার আমার লোকজনের সঙ্গে যোগাযোগ করে একটা রনদিভুর ব্যবস্থা করি।' ফোনের রিসিভার তুলে বিদেশী বইয়ের এক দোকানের নম্বর চাইল রানা। জিসানুল হকের একটা কাভার ওই দোকানটা।

দু'মিনিট পর হোটেলের অপারেটর ফোন করে জানাল, 'এই নম্বরে যোগাযোগ করা যাচ্ছে না।...না, সার, এনগেজড্ নয়, কোন সাড়া নেই।'

রানার হার্টবিট বাড়ছে। নম্বরটা আরেকবার দেখে নিয়ে অপারেটর মেয়েটিকে অনুরোধ করল আবার চেষ্টা করতে। কিছুক্ষণ পর মেয়েটি সেই একই রিপোর্ট করল।

রানা নাছোড়বান্দা। আমিনাকে দিয়ে সার্ভিস ইনকয়ারি-তে খোঁজ নিল। ডিউটিরত এঞ্জিনিয়ার সহানুভূতি জানাল, কিন্তু কোন সাহায্যে এলো না। এই নম্বর সংক্রান্ত কোন রেকর্ডই সে হাতের কাছে খুঁজে পাচ্ছে না। সময় ও সুযোগ পাওয়া মাত্র অবশ্যই ব্যাপারটা সে দেখবে। খুব ভাল হয় পরে যদি আবার তাকে ফোন করা হয়। আচ্ছা, যার নামে ফোন সে তার বিল ঠিকমত পরিশোধ করেছে তো?

নিজেদের মধ্যে কোন কথা হলো না, রানা ও আমিনা তাড়াহুড়ো করে হোটেল থেকে বেরিয়ে এলো।

ঘটনা দেখা গেল খুবই সাদামাঠা, অঙ্কের মত সহজ, কিছুই অবশিষ্ট নেই। দমকল কর্মীরা তাদের কাজ সেরে ফিরে গেছে; দায়িত্ব পালন করছে পুলিস। পুরানো একজন খদ্দের হিসেবে নিজের পরিচয় দিয়ে সহানুভূতি প্রকাশ করল রানা, সেই সূত্রে প্রয়োজনীয় কিছু প্রশ্নের জবাবও সংগ্রহ করল।

দোকান প্রায় অর্ধেকটাই পুড়ে গেছে, তবে একেবারে নিশ্চিহ্ন হয়ে গেছে দোকানের পিছনের ঘরগুলো। পেপারব্যাক, ম্যাপ, অভিধান–সব ছাই হয়ে পানিতে ভাসছে। দমকল কর্মীরা ভাল কাজ দেখিয়েছে, তা না হলে দু'পাশের ট্র্যাভেল এজেন্সি আর কফি শপ বাঁচানো যেত না। না, কীভাবে আগুন লেগেছে তা এখনও জানা যায়নি। তবে সন্দেহ করা হচ্ছে স্রেফ দুর্ঘটনা না-ও হতে পারে। হ্যাঁ, আওয়াজ শোনা গেছে–বোমা হতে পারে। পুলিস এক্সপার্টরা রিপোর্ট দিলে বোঝা যাবে। না, দোকানের মালিক জিসানুল হককে পাওয়া যাচ্ছে না। প্রতিবেশীরা বলছে, দোকানে তাঁর না থাকাটা রহস্যময়। কারণ সাধারণত দোকানের পিছনের বাড়িটায় তিনি রাত কাটাতেন। ছিলেন না, তাই বেঁচে গেছেন। জানা কথা খবরটা শোনা মাত্র ছুটে আসবেন।

অকুস্থল থেকে আমিনাকে নিয়ে সরে আসছে রানা। জিসানুল হক তার দোকানে পুড়ে মরেনি, এর মানে এই নয় যে সে বেঁচে আছে। তবে এখন তাকে খোঁজার জন্য সময় দেয়া সম্ভব নয়। রানা এজেন্সির এথেন্স শাখাকে অত্যন্ত শক্তিশালী একটা হাতিয়ার হিসেবে ব্যবহার করবার কথা ভাবছিল রানা–হাতে পাওয়ার আগেই সেটা ওর কাছ থেকে ছিনিয়ে নেয়া হয়েছে।

হোটেল স্যুইটে ফিরে এসে নিজের চিন্তা-ভাবনা সম্পর্কে আমিনাকে খানিকটা ধারণা দিল রানা। 'ওরা শুধু হককে ধরতে আসেনি। তার রেকর্ড, কনট্যাক্ট-এর তালিকা, পিক-আপ পয়েন্টস, নির্ধারিত সময়, লেটার-বক্সের লোকেশন ইত্যাদি থেকে আমাকে বঞ্চিত করাটাও লক্ষ্য ছিল। এ-সব রাখা হত দোকানের পিছনের ঘরগুলোয়, সেগুলোই পুড়ে একেবারে নিঃশেষ হয়ে গেছে।'

আমিনা ভুরু কুঁচকে আছে। 'না পুড়িয়ে সব তুলে নিয়ে যায়নি কেন? কম দৃষ্টি কাড়া হত। গাদা গাদা ইনফরমেশন কাজেও লাগত।'

'আগুন লাগিয়ে দিয়ে দ্রুত পালিয়ে যাওয়া যায়। চুরি করতে সময় অনেক বেশি লাগে। তা ছাড়া, ওরা জানবে কীভাবে দালানটার কোথায় কী ইনফরমেশন

কীভাবে রাখা হয়েছে? হাতের কাছে যা পেয়েছে রেখে যায়নি, এতেও কোন সন্দেহ নেই। তবে গুরুত্বপূর্ণ কোন ফাইল বা সিডি সহজে পাওয়া যাবে এমন জায়গায় হক রাখবে বলেও আমি বিশ্বাস করি না।'

'তার সহকারীদের পাওয়া যাবে না?'

'তাদের কাজ নয় আমাকে খুঁজে নেয়া?' পাল্টা প্রশ্ন করল রানা, যেন নিজেকেই, তাকিয়ে আছে দেয়ালে। 'তাদের মধ্যে একজন অন্তত জানে আমি কোথায় আছি বা থাকতে পারি। খুন বা কিডন্যাপ করা হলে তো কথাই নেই, না হলেও তার ওপর নিশ্চয়ই নজর রাখা হচ্ছে। সেজন্যেই হয়তো, আমার নিরাপত্তার কথা ভেবে, যোগাযোগ করছে না সে।'

'হতে পারে।'

'কেউ যোগাযোগ করবে, এই আশায় এখানে আমি অপেক্ষা করতে পারি না। কাল রাতে আমাকে কাভার দেওয়ার জন্য হক যাদেরকে দায়িত্ব দিয়েছিল তারা নেই–বাতাসে মিলিয়ে গেছে। কে জানে সব মিলিয়ে কতজন হবে। আচারিয়া যেন কী ভাষা ব্যবহার করেছিল? চরম নিষ্ঠুরতা। তুমি আর আমি এখনও সেই ভয়ানক ঝুঁকির মধ্যেই আছি।'

'আর সেজন্যেই একজোট হয়ে এই শত্রুদের মোকাবিলা করব আমরা।' এগিয়ে এসে কাউচে, রানার পাশে বসল আমিনা। তার চেহারায় আর ভাষায় আশ্চর্য একটা দৃঢ়তা লক্ষ করল রানা। 'শোনো, এখনি আমাদের রওনা হওয়া দরকার। অনেকটা পথ পাড়ি দিতে হবে আমাদের···অথচ মিস্টার আচারিয়া যে ঘটনার কথা বলেছেন সেটা ঘটতে আর মাত্র ষাট ঘণ্টা বাকি আছে–বোধহয় আরও কম, কারণ···'

'এই ঘটনাটা কী?'

'চলো, আগে আমরা বেরিয়ে পড়ি, পথে বলব।'

'আমি যাতে ঢাকায় টেলিফোন করে বলে দেওয়ার সুযোগ না পাই,' নীরস গলায় বলল রানা। 'বুঝেছি।'

'ডার্লিং, আমি জানি সুযোগ পেলে ঢাকাকে তুমি ঠিকই সব জানাবে। সে ঝুঁকি এখনি আমি সত্যি নিতে পারি না। রিযনেবল্ হওয়ার চেষ্টা করো, প্লিজ···গুড। শোনো, আমাদেরকে সাগর ধরে যেতে হবে। প্রায় দুশো কিলোমিটার একশো বিশ মাইলের মত। অন্তত, এর মধ্যে ঘোর-প্যাঁচ নেই–সরল একটা রেখা বলতে পারো। বোট দরকার, সেটা চালাবার জন্যে দরকার একজন লোক। আমি জানি কে সে।'

নয়

লুদিয়ান সিকান্দার মার্সেনারি নয়, তবে এমন একজন যোদ্ধা, যে নিজের রণক্ষেত্র নিজেই বেছে নেয়।

লেবাননী মা ছিল নার্স, আহত গেরিলা যোদ্ধাদের সেবা করত বৈরুতে; বাবা ছিল গ্রিক মুসলমান, নিজের বোট নিয়ে সাগরে মাছ ধরত, সেই মাছ বিক্রি করতে আসত বৈরুতে। দু'জনের দেখা হলো, পরিচয় হলো, প্রেম হলো, এবং সবশেষে বিয়ে হলো। বিয়ের পর বৈরুতেই থেকে গেল ওরা। একটাই ছেলে, সিকান্দার, মা তাকে নিয়েই হাসপাতালে যায়। ধীরে ধীরে বড় হলো সিকান্দার। খুব তাড়াতাড়ি তার মাথায় এই চিন্তাটা ঢুকল—লেখাপড়া শিখে জ্ঞানী হওয়াটা বোকামি, কারণ জ্ঞানী লোকজনই যেখানে সেখানে যুদ্ধ বাধিয়ে দুনিয়াটাকে দোজখখানা বানিয়ে রেখেছে। আহত সৈনিকদের মুখ থেকে অতীত ও বর্তমান যুগের যুদ্ধের গল্প শুনতে শুনতে তার ইচ্ছে জাগল, সে-ও যুদ্ধ করবে। তবে তার যুদ্ধ হবে অন্যায়ের বিরুদ্ধে, ন্যায়ের পক্ষে। যে-সব সৈনিক সুস্থ হয়ে হাসপাতাল ত্যাগ করত তাদের সঙ্গে যুদ্ধ-ক্ষেত্র দেখতে যেত সে। এই আসা-যাওয়া করতে করতে তাদের কাছ থেকে অস্ত্র চালাতে শিখল। তারপর কৈশোর পেরুবার আগেই গেরিলাযুদ্ধের ট্রেনিং নিল।

সিকান্দারের প্রথম রণক্ষেত্র ছিল ইসরায়েল-লেবানন সীমান্ত। আঠারো বছর বয়েসে তার গর্ব ছিল: একুশজন ইহুদিকে খতম করেছি।

আর্জ লুদিয়ান সিকান্দারের বয়স প্রায় ষাট। গত পঁয়তাল্লিশ বছর অসংখ্য রণক্ষেত্রে লড়াই করেছে সে—টাকা বা কোন স্বার্থের বিনিময়ে নয়—এই যুদ্ধ হলো তার অন্যায়ের বিরুদ্ধে প্রতিবাদ জানাবার ভাষা। জিম্বাবুয়েতে কালোদের হয়ে শ্বেতাঙ্গদের বিরুদ্ধে, বসনিয়া-হার্জেগোভিনায় স্লাভ বর্বরদের বিরুদ্ধে, শ্রীলঙ্কায় সিংহলীদের বিরুদ্ধে তামিলদের পক্ষে, ইসরায়েলি দখলদারদের বিরুদ্ধে ফিলিস্তিনিদের পক্ষে, চেচেনদের হয়ে রাশিয়ার বিরুদ্ধে—কোথায় না সে লড়তে গেছে। তবে এই তালিকা ভবিষ্যতে আর দীর্ঘ হবে না। গত বছর মা ও বাবা দু'জনেই এথেন্সে মারা যাওয়ার পর রণক্লান্ত সিকান্দার সিদ্ধান্ত নিয়েছে, যথেষ্ট হয়েছে, আর নয়। সারাটা জীবন যুদ্ধ করবার পর সে উপলব্ধি করেছে: দুনিয়ার সবচেয়ে বড় প্রহসন হলো, একজন সৈনিক আরেকজন সৈনিককে মারছে। কাউকে যদি মারতেই হয়, মারা উচিত যারা যুদ্ধ বাধাচ্ছে—রাজনীতিকদের, ধর্মীয় নেতাদের, সরকারপ্রধানদের। এই উপলব্ধি সিকান্দারকে শান্তি দিতে পারেনি, হতাশ আর দুর্বল করে তুলেছে। তাই বাবার গড়ে তোলা ডকইয়ার্ডের ব্যবসাটাই শেষ জীবনের পেশা হিসেবে বেছে নিয়েছে সে। কোথায় অন্যায় ও জুলুম হচ্ছে জানে সে, খবর রাখে কোথায় কার ওপর কে যুদ্ধ চাপিয়ে দিচ্ছে, কিন্তু নিজেকে ঠাণ্ডা রাখে, শরীরের রক্ত গরম হতে দেয় না।

রানাকে নিয়ে একটা কাফেতে ঢোকার সময় আমিনার বিরতিহীন ধারাবিবরণীতে ছেদ পড়ল, মস্ত একজোড়া গোঁফ আর বাবরি চুল নিয়ে প্রৌঢ় মালিক দ্রুত পা ফেলে এগিয়ে এলো ওদের দিকে। দাঁড়িয়ে পড়ল আমিনা, চেহারায় শ্রদ্ধা ও সমীহের ভাব ফুটল। 'বাবার বন্ধু, ইলিয়াস চাচা,' ফিসফিস করল সে। 'উনিই যদি বলতে পারেন সিকান্দার চাচাকে এখন কোথায় পাওয়া যাবে।' এরপর সে তার ইলিয়াস চাচার সঙ্গে নিজের ভাষায় কুশল বিনিময় করল, সবশেষে জানতে চাইল সিকান্দাব চাচাকে কোথায় পাওয়া যাবে।

ওদেরকে নিয়ে কাফের দোরগোড়ায় চলে এলো ইলিয়াস। হাত তুলে রাস্তার ওপারের জেটি দেখিয়ে দিল। তার কাছ থেকে বিদায় নিয়ে রানার হাত ধরে রাস্তা পেরুল আমিনা, কথার খেই ধরে আবার শুরু করল, 'সিকান্দার চাচা যুদ্ধ-যুদ্ধ করে আর বিয়েই করেননি…'

'তুমি তার সম্পর্কে এতকিছু জানলে কীভাবে?'

'আশ্চর্য, বাবার বন্ধু না উনি–আমি জানব না তো কে জানবে! এমনকি আমার বাবার মত নিরীহ মানুষকেও সিকান্দার চাচা পশ্চিম তীরে নিয়ে গিয়ে ইসরায়েলি সৈন্যদের সঙ্গে যুদ্ধ করিয়েছেন…ওই তো সিকান্দার চাচা, ওদিকে!'

পিরাউস-এর দুটো ইয়ট-বেসিনের বড়টা, পাসালি মানি-র ক্রমশ বাঁকা ওয়াকওয়ে ধরে হাঁটছিল ওরা, দূরপ্রান্তের নিথর পানিতে ছোট বড় কত রকমের জলযান ভাসছে–ফিশিং বোট, বারো ফুটী সেইলিং ডিঙ্গি থেকে শুরু করে অত্যাধুনিক ইয়ট পর্যন্ত। সরাসরি নিচে, ডকইয়ার্ডের সরু বিস্তৃতিতে, বিভিন্ন আকারের বোট মেরামত বা সেগুলোর চেহারা বদলের কাজ চলছে। সামনে তাকিয়ে রানা সাদা শার্ট পরা দীর্ঘদেহী এক বৃদ্ধকে দেখতে পেল, ভীরু চেহারার দু'জন কর্মচারীকে কঠিন সুরে নির্দেশ দিচ্ছে। বয়েস যাই হোক, লোকটাকে এখনও তরুণ বলতে হবে। ধাপ বেয়ে ইয়ার্ডে নামছে আমিনা, রানা নিজের চিন্তাটা প্রকাশ না করে পারল না।

'এত বড় একটা ব্যবসার মালিক কেন তোমাকে সাহায্য করতে যাবেন?'

'কেন, বলিনি, সিকান্দার চাচা ন্যায়-এর পক্ষে?'

'কিন্তু এ-ও বলেছ যে তিনি যুদ্ধ থেকে সরে এসেছেন।'

'হ্যাঁ, এসেছেন। তো কী হলো? আমরা কি তাঁকে যুদ্ধ করতে বলব?'

'যে কাজের জন্যে সাহায্য চাইবে তুমি, তাতে ঝুঁকি নেই?'

'আছে। বোঝাতে পারলে এটুকু ঝুঁকি আমার জন্যে অবশ্যই নেবেন সিকান্দার চাচা। শুধু বাবার বন্ধু নন, আমাকে অত্যন্ত স্নেহও করেন।'

ঘাড় ফিরিয়ে ওদেরকে দেখতে পেল সিকান্দার। লোনা বাতাস আর বহু বছরের রোদ চকচকে বাদামি করে তুলেছে তার ত্বক। আমিনা আগে থেকে না জানালে কাছ থেকে দেখে রানা তার বয়স আন্দাজ করত খুব বেশি হলে পঁয়তাল্লিশ। কান দুটো খুলির সঙ্গে সাঁটা, বাদামি চোখে বিষণ্ন, তীক্ষ্ণ দৃষ্টি, টিয়াপাখির মত বাঁকা নাক। চওড়া চোয়াল যেরকম উঁচু হয়ে আছে, সন্দেহ হয় অত্যন্ত জেদি মানুষ, প্রয়োজনের সময় হিংস্র হয়ে উঠবে।

ওদেরকে কঠিন দৃষ্টিতেই দেখছিল সিকান্দার। তারপর আমিনাকে চিনতে পেরে সাদা দাঁত বের করে ফেলল। হাসিটা উষ্ণ, স্নেহ আর আদর মাখা। আমিনা সরাসরি সামনে দাঁড়িয়ে বুড়োর দু'কাঁধে নিজের হাত দুটো তুলে দিল। 'সিকান্দার চাচা!'

'কি রে, বেটি!' আমিনার মাথায় হাত বুলাল সিকান্দার। 'চাচার কথা এতদিনে মনে পড়ল?' তারপরই তার ধারাল দৃষ্টি রানার দিকে ঘুরে গেল।

'ও মাসুদ রানা, চাচা–আমার এক বাংলাদেশী বন্ধু।'

'হাউ ডু ইউ ডু, মিস্টার রানা।' উষ্ণ মুঠোয় জোর আছে। 'আপনি এই

সময় আসায় আমি খুশি। এখানকার কাজ শেষ করে রাস্তার ওপারে কফি খেতে যাচ্ছিলাম। চলুন, আপনি আমার অতিথি। এই পাঁচ মিনিট…'

আবার কারিগরদের দিকে ফিরে গেল সিকান্দার, কীভাবে কী করতে হবে ভাল করে বুঝিয়ে দিচ্ছে। রানা খেয়াল করল, কাজের মধ্যেও আড়চোখে ওকে বারবার মাপার চেষ্টা করছে লোকটা।

যে বোটকে নিয়ে এত আলোচনা সেটা ফুট বিশেক লম্বা, স্টার্ন অস্বাভাবিক চোখা, বীম যথেষ্ট চওড়া—এককালে সম্ভবত ফিশিং বোট বা লাইফবোট ছিল, আকৃতি বদলে খুদে কেবিন-ক্রুজার বানানোর কাজ চলছে। দুটো বাঙ্ক আর সুপারস্ট্রাকচারের কাঠামো এরই মধ্যে তৈরি করা হয়ে গেছে। রানা আন্দাজ করল, একজন ইয়টম্যানের দৃষ্টিতে জিনিসটাকে বিদঘুটে কিম্ভূতকিমাকার বলে মনে হতে পারে। তবে ভাড়া কম ধরলে ফ্রেঞ্চ আর জার্মান ট্যুরিস্টরা মোটেও অপছন্দ করবে না।

সন্দেহ নেই, মুখে অসন্তোষ প্রকাশ করাটা যথেষ্ট নয় মনে করে বাদামি রঙের বিশাল একটা হাত বাড়িয়ে, যেন মনে হলো কব্জির এক ঝাঁকিতে, বোটের খাড়া কিনারার একটা তক্তা ভেঙে ফেলল সিকান্দার, ওটা যেন ওখানে আঠা লাগানো কাগজ দিয়ে সাঁটা ছিল। অপরাধবোধে আক্রান্ত কারিগর দু'জন মাথা তুলে তাকাতে পারছে না। হতাশ ভঙ্গিতে মাথা নাড়তে নাড়তে ঘুরল সিকান্দার। রানা আর আমিনার উদ্দেশে চোখ মটকাল।

'ওরা শিশু,' বলল সে, ছাগল খেদানোর ভঙ্গিতে হাত ঝাপটে ধাপগুলোর দিকটা দেখাল। 'মানে, শুধু বোকা আর অদক্ষ নয়, এটাও বোঝে না যে কোন কাজ সামান্য একটু ভাল করতে হলেও প্রচণ্ড পরিশ্রম আর সময় দিতে হয়। আমি ওদেরকে বললাম বড় একটা ঢেউ এলে ডেক-হাউজিং ভেঙে পড়বে। উত্তরে ওরা বলল, "তা হয়তো সত্যি, তবে একটু প্রশংসাও করুন, মিস্টার সিকান্দার। চেয়ে দেখুন বাঙ্কগুলো কী রকম মজবুত করে বানিয়েছি আমরা।" বুঝুন অবস্থা! তবে মোটামুটি এই হলো গ্রিসের আসল চেহারা। বলতে দুঃখ হয়, বিশেষ করে গ্রিসের মুসলমানরা যথেষ্ট খাটতে একদম রাজি নয়। তবে এ-সব নীরস বিষয় নিয়ে আপনাকে আমি বিরক্ত করব না। বরং একটা প্রশ্ন করি, যদি অনুমতি দেন।'

'হ্যাঁ, প্লিজ।'

'কেন মনে হচ্ছে আপনার সঙ্গে অনেক মিল আছে আমার?' জানতে চাইল সিকান্দার।

'এইজন্যে যে আমিও একজন যোদ্ধা,' বলল রানা। 'সেনা-বাহিনীতে ছিলাম।'

আমিনার দিকে তাকাল সিকান্দার। 'বুড়ো চাচার কিছুই গোপন রাখোনি, কেমন?' আমিনা জবাবে কিছু বলবার আগে আবার রানার দিকে ফিরে জিজ্ঞেস করল, 'এখানে আপনি বেড়াতে এসেছেন, মিস্টার রানা? ছুটিতে?'

'না।'

রানার গলার গম্ভীর ভাব সিকান্দারের কানে ধরা পড়ল। 'আমিনা, মিস্টার

রানা কোন বিপদে পড়েননি তো?'

'হ্যাঁ, মিস্টার সিকান্দার,' আমিনা নয়, রানাই জবাব দিল, 'আমরা একটা সমস্যায় পড়েই আপনার কাছে এসেছি।'

'আমরা? প্রেম সংক্রান্ত সমস্যা?'

'না। আমি আর আমিনা আন্তর্জাতিক একটা ষড়যন্ত্রের সঙ্গে জড়িয়ে পড়েছি। ব্যাপারটা ভারত আর বাংলাদেশের জন্যে মারাত্মক হুমকি, এটুকু জানা গেছে—অন্তত আমি এটুকুই জানতে পেরেছি। আরও কোন দেশের জন্যে হুমকি কিনা, আমিনা আমাকে বলেনি—হয়তো ও-ও সব তথ্য জানে না। ব্যাপারটা নাটকীয় শোনালে আমি দুঃখিত, তবে...'

'নাটকীয় হোক আর যাই হোক, এ-সব আমি শুনতে আগ্রহী নই,' পরিষ্কার জানিয়ে দিল সিকান্দার। কাফের উল্টোদিকের পেভমেন্টে পাথরের অটল মূর্তিতে পরিণত হয়েছে সে। চোখের দৃষ্টি আর কণ্ঠস্বরে রীতিমত মারমুখো ভাব। 'হাহ্, ভারত বিপদে পড়েছে! তাতে আমার কী? এই ভারতই তো কাশ্মীরীদের স্বাধীনতা আন্দোলন দমন করবার জন্যে ছোট্ট একটা উপত্যকায় সৈন্য মোতায়েন করেছে সাত লাখ। ভারতের অখণ্ডতা রক্ষার নামে নিরীহ কাশ্মীরী মুসলমানদের জীবন নরক করে তুলেছে। প্লিজ, অন্তত ভারতকে সাহায্য করবার কথা আমি শুনতে পর্যন্ত চাই না। আমাকে ক্ষমা করবেন।' ঘুরে ফিরে যেতে উদ্যত হলো সে।

রানা তার পথ আটকাল। 'কিন্তু বিপদটা শুধু ভারতের নয়। এমনকি শুধু বাংলাদেশেরও নয়। আমার ধারণা, গোটা ব্যাপারটার আন্তর্জাতিক একটা তাৎপর্য আছে। তা না হলে মার্কিনিরা এর সঙ্গে জড়াত না...'

আমিনাও এবার শুরু করল, 'সিকান্দার চাচা, বাবা বেঁচে থাকলে আপনি কিন্তু এভাবে না বলতে পারতেন না। তা হলে কি বাবা মারা যাওয়ায় আপনাকেও আমি হারিয়েছি?'

তার কথা শুনে আরও খেপে উঠল বুড়ো। 'স্নেহ করি বলে তুমি আমাকে ব্ল্যাকমেইল করতে পারবে না। ভারতীয় দূতাবাসে তোমার আসা-যাওয়া কখনোই আমি ভাল চোখে দেখিনি। সত্যি কথা বলতে কি, বাংলাদেশী হলেও মেজরকে এখানে নিয়ে আসা উচিত হয়নি তোমার। খুবই বোকামি করেছ। কারণ কোন সাহায্যই আমি করতে পারব না ওঁকে।'

'আপনি একটু শান্ত হয়ে আমার কথাগুলো শুনুন, মিস্টার সিকান্দার,' বলল রানা। 'প্রথম কথা, আমরা একটা অন্যায় ষড়যন্ত্রের শিকার। এরই মধ্যে আমাদের অনেক ক্ষতি হয়ে গেছে। আমরা শুধু জানতে চেষ্টা করছি, এ-সবের পিছনে কারা দায়ী। আমরা যখন পালটা আঘাত হানব তখন আপনার সাহায্য আমাদের হয়তো দরকার হবে না, কিন্তু...'

একটা হাত তুলল সিকান্দার। 'ঠিক আছে। আপনাদের কথা শুনব। কিন্তু আমি কাউকে কোন প্রতিশ্রুতি দিচ্ছি না।'

আর কোন কথা হলো না, কাফেতে ঢুকে এক কোণের একটা টেবিলে বসল ওরা. সারফেসটা মারবেলের। দেয়ালে আয়না থাকায় ছোট্ট জায়গাটাকে বেশ

বড় দেখাচ্ছে। কয়েকটা টেবিলে তুমুল হৈ-হট্টগোলের সঙ্গে ব্যাকগ্যামন আর জিন-রামি খেলা চলছে, সেই সঙ্গে কাপের পর কাপ গলায় ঢালা হচ্ছে জিভ পোড়ানো টার্কিশ কফি। রানার কথা অন্য কেউ শুনতে পাচ্ছে না, কোয়ার্টারডেক থেকে জিসানুল হকের বইয়ের দোকান পর্যন্ত যা যা ঘটেছে সবই সংক্ষেপে বলে গেল সিকান্দারকে। তার তীক্ষ্ণ দৃষ্টি মুহূর্তের জন্যও রানার মুখ থেকে সরল না। রানা থামতে ঝাড়া দু'মিনিট শিথিল ভঙ্গিতে বসে থাকল সে, পা দোলানো বা হাত দিয়ে ড্রাম বাজানোর গ্রিক পুরুষদের অভ্যাসটা পুরোপুরি বিসর্জন দিয়ে। তারপর যখন কথা বলল—শব্দগুলো বাছাই করা, কণ্ঠস্বর ঠাণ্ডা।

'তো এই হলো ব্যাপার। তোমরা চাইছ তোমাদেরকে একটা দ্বীপে নিয়ে যাই আমি। কিন্তু দ্বীপটার নাম আমিনা বলবে না। সেখানে কিছু ঘটবে, ওর ভাষায়—একটা ঘটনা।' সিকান্দারের ভারী গলায় তিরস্কার ও অসন্তোষ, '—যদি একদল শত্রু বাদ না সাধে। এই শত্রুরাই বাংলাদেশী একজন সিকিউরিটি চীফকে কিডন্যাপ করেছে—হয়তো উপমহাদেশের বা এমনকি গোটা এশিয়ার মারাত্মক কোন ক্ষতি করবার উদ্দেশে। তোমরা ওখানে পৌঁছানোর পর সিদ্ধান্ত নেবে এরপর কী করণীয়। এই মুহূর্তে তোমাদের কোন প্ল্যান নেই।

'নাহ, জমজমাট কোন কাহিনী নয়—দুঃখিত। তবে আমি অন্তত দশজন লোকের সঙ্গে তোমাদের পরিচয় করিয়ে দিতে পারব, যারা নিজেদের ইয়ট আর ক্রু ভাড়া দেবে—দ্বীপটায় যাওয়া এতই যদি জরুরী মনে করো। পাবলিক স্টীমারও আছে...'

দ্রুত বাধা দিল রানা। মনে মনে আগেই সিদ্ধান্ত নিয়েছে, দলটা হতে হবে যত ছোট পারা যায়—খুব বেশি হলে তিনজনের। দু'জন আছে, আরেকজন দরকার—সিকান্দারকেই চাই ওর। প্রথম কারণ, তার অভিজ্ঞতা কাজে লাগতে পারে; দ্বিতীয় কারণ, তাকে সব কথা বলা হয়ে গেছে। 'দেখুন,' বলল ও, 'এভাবে কথা বলে আমিনাকে আপনি এড়াতে পারবেন না, সত্যি যদি তার প্রতি আপনার কোন স্নেহ-ভালবাসা থেকে থাকে। আপনি কি ভেবেছেন, আমরা আপনার একটা বোট চুরি করতে এসেছি? ঠিক করে বলুন তো, আপনি এত ভয় পাচ্ছেন কেন?'

'মুখের লাইসেন্সটা এবার ব্যবহার করুন, মিস্টার রানা। আমি কিন্তু সব কিছু একটা সীমা পর্যন্ত...'

এবার তাকে বাধা দিল আমিনা। 'চাচা, শুনুন তা হলে। এটা ফ্যাক্ট—মানে, প্রায় নিশ্চিত হয়েই বলছি। মোসাদ এজেন্ট মেজর আবসালাম ইয়াহুদ জড়িত।'

আমিনার আশা পূরণ হলো। হিংস্র পশুর মত খেঁকিয়ে উঠল সিকান্দার। 'কসাই! পিশাচ! ওকে পেলে জ্যান্ত পোড়াব আমি। আমিনা, সব বলো আমাকে। কীভাবে জেনেছ তুমি?'

'রামাল্লায় ইসরায়েলি বাহিনীর সঙ্গে লড়েছে এমন এক লোক অ্যাক্সিডেন্টালি দেখে ফেলে তাকে। দেখেই চিনতে পারে এই মোসাড এক্সিকিউশনারকে। তারপর খবরটা আমাদের গ্রিক ইন্টেলিজেন্স ব্রাঞ্চে পৌঁছে যায়। আমি কাল জানতে পেরেছি।'

'ব্যস, এইটুকু মাত্র? গ্রিসে তো আসতেই পারে সে, আরও অনেকে যেমন বেড়াতে আসছে। আমি জানতে চাইছি সে কোন কাজ নিয়ে এসেছে কিনা। কাউকে ধরবে কি মারবে? এই দেশের কোন ক্ষতি করবে?'

'দেখো চাচা, দেশ-দেশ কোরো না তো!' হঠাৎ রেগে উঠল আমিনা। 'অন্ধ দেশপ্রেম যে খুব ভাল জিনিস নয়, ইতিহাস এটা বারবার প্রমাণ করেছে, কিন্তু আমরা কেউ ইতিহাসের সেই শিক্ষা গ্রহণ করছি না। হিটলারের উত্তেজনাকর বক্তৃতা শুনে প্রায় সব জার্মানই মনে করত তাকে সমর্থন করাটাই দেশপ্রেম। সেই রকম বুশকে বেশিরভাগ আমেরিকান সমর্থন করল ইরাক আক্রমণের মত চরম অন্যায় একটা কাজ করতে। অন্যায় অন্যায়ই, সেটা আমার দেশ করতে চাইলেও...'

'আমি আমার প্রশ্নের জবাব পাচ্ছি না।' থমথম করছে সিকান্দারের চেহারা।

'সরাসরি হয়তো গ্রিসের কোন ক্ষতি করতে আসেনি সে,' বলল আমিনা। 'তবে যে ঘটনাটা ঘটবে বলে বলছি, সেটার সম্ভাব্য লোকেশন, বোট নিয়ে কোন দিকে যেতে হবে ইত্যাদি সম্পর্কে খোঁজ নিতে দেখা গেছে তাকে। কাল আমি ভেবেছি, ব্যাপারটা কাকতালীয় হতে পারে। গরমের সময় বহু লোকই ওখানে ছুটি কাটাতে যায়। কিন্তু এখন আমার ব্যাপারটাকে কো-ইন্সিডেন্স বলে মনে হচ্ছে না। কারণ হঠাৎ মনে পড়ে গেছে এই লোকের নাম তোমার মুখে বেশ কয়েকবার শুনেছি আমি।'

'হ্যাঁ, ফিলিস্তিনি গেরিলাদের ধরতে পারলে নির্যাতন করে মারে ইয়াহুদ। বিদেশীদের মধ্যে একা বোধহয় আমিই ধরা পড়েছিলাম তার হাতে। পাঁজরের দুটো হাড় ছাড়া আর কিছু ভাঙতে পারেনি আমার। ওদের ক্যাম্প থেকে কীভাবে পালিয়ে আসি, লিখলে সেটা মহাকাব্য হয়ে যাবে। আর বসনিয়ায় সে যা অত্যাচার করেছে, সে-কথা লিখে শেষ করা যাবে না।' এতক্ষণে একটু হাসল সিকান্দার। তারপর বড় করে শ্বাস নিল। 'ঠিক আছে,' রানা ও আমিনার দিকে পালা করে তাকাচ্ছে, 'মাছ তোমাদের টোপ গিলেছে। তোমরা এখন যা বলবে তাই করবে সে। তবে আবার এ-কথা ভেবে বোসো না যে তোমরা যা বলেছ তার সবটুকু আমি হুবহু বিশ্বাস করেছি। আমার সুন্দরী ভাইঝিটি আবসালাম ইয়াহুদ সম্পর্কে মিথ্যে কথাও বলতে পারে। তবে সত্যি কথা বলছে না, তাই-বা বুঝব কীভাবে? চলো দেখি, নরাধমটার কোন ব্যবস্থা করা যায় কিনা।'

রানা ও আমিনা এতটাই স্বস্তি পেল, টেবিলের তলায় পরস্পরের হাত ধরে আনন্দসূচক মৃদু চাপ দিল ওরা।

'আমরা কখন রওনা হব?' তাড়াতাড়ি জানতে চাইল রানা।

'আমি তো দেরি করবার কোন কারণ দেখছি না। অ্যাপড্ নিয়ে যাব আমরা। ডিজেল এঞ্জিন, পঞ্চাশ ফুট, অত্যন্ত শক্ত। সহজে কারও নজরে পড়বে না। বোট চালানোর অভিজ্ঞতা আছে, মিস্টার রানা?'

'খানিকটা।'

'তাহলে কিছুটা সুবিধে হবে। ভাল কথা, এখানে আসবার সময় কেউ

তোমাদের পিছু নিয়ে আসেনি তো?'

'সম্ভাবনা কম,' জবাব দিল আমিনা।

'ব্যাখ্যা করো।'

'ব্রিফকেস আর সুটকেস হোটেলে রেখে শুধু একটা শপিং ব্যাগ নিয়ে বেরিয়েছি আমরা,' ব্যাখ্যাটা রানা করছে। 'হোটেলের বিল মিটিয়েছি টেলিফোনে–চেকটা স্যুইটের কোথায় আছে বলে দিয়েছি রিসেপশনকে। অর্থাৎ আমরা যে হোটেল ত্যাগ করেছি, এটা কারও জানার কথা নয়।'

'ফোনটা পাবলিক বুদ থেকে করেছ?'

'হ্যাঁ। ওই একই বুদ থেকে আমি যখন ঢাকায় ফোন করছিলাম, আমিনা রাস্তার ওপার থেকে নজর রাখছিল আমাকে কেউ লক্ষ করছে কিনা; আর আমিনা যখন ওর লোকজনকে সতর্ক করছিল আমি তখন আড়াল থেকে নজর রাখছিলাম চারদিকে।'

'তাহলে ধরে নিচ্ছি এখানে আসবার পথে পিছনেও আপনাদের চোখ ছিল। ভেরি গুড। এখানে নয়, রাস্তার ওপারের রেস্তোরাঁয় বসে খেয়ে নিন আপনারা। মালিক আমিনাকে চেনে, বিল নেবে আমার কাছ থেকে।' আমিনার দিকে তাকাল সিকান্দার, কথা ও আচরণে হঠাৎ কর্তৃত্বের ভাব চলে এসেছে। 'অ্যাপড় ভাসছে ক্লক-টাওয়ারের পাশে। পানামার ফ্ল্যাগ, দূর থেকেই চিনতে পারবে। পাশে একটা ইয়ট আছে, কোন আমির- উমরাহ্র হবে। খেয়ে নিয়ে সোজা বোটে চলে যাও তোমরা, যতক্ষণ না রওনা হই লুকিয়ে থাকো ওটায়।'

'বোটে কেউ নেই?'

'না। অস্ত্র কি এই একটাই, মিস্টার রানা? ও। ঠিক আছে, সব রেখে যাও আমার কাছে। আমিনা, ওকে নিয়ে এখনি বেরিয়ে পড়ো।'

রেস্তোরাঁয় না বসে দুটো লাঞ্চ প্যাকেট কিনল ওরা, দশ মিনিটের মধ্যে উঠে পড়ল অ্যাপডের আফটারডেকে। ওখান থেকে ছোট্ট সেলুনে। সব কিছু নজর কাড়ার মত ঝকঝকে তকতকে–ধোয়া মেঝে, পালিশ করা জানালা, রয়্যাল-ব্লু পর্দা যেন সদ্য ইস্ত্রি করা। রানা আন্দাজ করল, অ্যাপড় সম্ভবত কাউকে ভাড়া দেওয়ার কথা ছিল।

বোটটা ওরা এক চক্কর ঘুরে দেখে নিল। সরু কম্প্যানিয়নওয়ে স্টারবোর্ড সাইডে কাবার্ড আকৃতির গ্যালিতে নেমে এসেছে। শাওয়ারসহ বাথরুমটা পোর্টসাইডে। গ্যালি থেকে নিচের এঞ্জিনরুমে নামল রানা। তাপ আর তেলের গন্ধে দম নিতে কষ্ট হচ্ছে। মার্সিডিজ এঞ্জিন, সিঙ্গেল-ড্রাইভ, একশো পঁয়ষট্টি ঘোড়া। একদম নতুনই মনে হলো। জায়গা খুব কম হওয়া সত্ত্বেও এঞ্জিনটা বসাবার সময় বুদ্ধি খরচা করায় হাঁটা-চলার মত ফাঁক রাখা সম্ভব হয়েছে। সিকান্দারের প্রতি রানার শ্রদ্ধা আরও একটু বাড়ল।

গ্যালি আর বাথরুমের সামনে প্রতিটিতে ডাবল বাঙ্কসহ এক জোড়া কেবিন। ওগুলোর সামনে আরও দুটো কেবিন, প্রতিটিতে একটা করে বাঙ্ক। ওরা পোর্টসাইডের একটা কেবিন নিল। শপিং ব্যাগে করে খুব কম জিনিস-পত্র নিয়ে এসেছে, আমিনা এক এক করে বের করল সব–অতিরিক্ত আন্ডারঅয়্যার,

রুমাল, দুটো শার্ট, টয়লেট গিয়ার, ওয়ালথারের জন্য আশি রাউন্ড অ্যামিউনিশন। বাদামি-ব্লন্ড চুল কপাল থেকে সরিয়ে ঘুরল আমিনা, পরমুহূর্তে প্রায় ঝাঁপ দিয়ে পড়ল রানার বাড়িয়ে দেয়া দুই বাহুর মাঝখানে।

রানার কাঁধে মুখ, আমিনা ফিসফিস করে বলল, 'যাক, অল্প কিছুক্ষণের জন্য হলেও তোমাকে পেলাম। মনে হচ্ছিল দিনের পর দিন পার হয়ে যাবে, কিন্তু তোমাকে আর আমার পাওয়া হবে না। কাল কী ঘটবে আমি গ্রাহ্য করি না। মরি মরব। কিন্তু আজ? নো, নেভার–আজ কেউ আমার কাছ থেকে তোমাকে কেড়ে নিতে পারবে না। এসো, প্রতিটি মিনিট কাজে লাগাই।'

'দরজা খোলা...'

আমিনার চোখ দুটো রক্তিম হয়ে উঠেছে। নিঃশ্বাস ফেলছে ঘন ঘন। 'থাক খোলা। এখানে আমরা ছাড়া আর কেউ নেই।'

বোটে নেই, তবে বোটের চারপাশে প্রচুর লোকজন আছে, আছে তাদের কর্মব্যস্ততা। মাঝি-মাল্লারা চেঁচামেচি করছে, নোঙরের চেইন তোলার আওয়াজ ভেসে আসছে, গর্জে উঠছে শক্তিশালী এঞ্জিন। এ-সব ওদের কাছে অর্থহীন হয়ে পড়ল। এক সময় ক্লান্ত শরীর নিয়ে বিচ্ছিন্ন হলো ওরা, তারপর ঘুমিয়ে পড়ল।

ডেকে পায়ের আওয়াজ আর লোকজনের গলা শুনে ঘুম ভেঙে গেল রানার। দ্রুত কাপড় পরল ও, নিরাবরণ আমিনার ওপর চোখ। চিৎ হয়ে ঘুমাচ্ছে মেয়েটা, একটা হাঁটু পুরোপুরি আত্মসমর্পণের ভঙ্গিতে ওপরে তোলা। ঝুঁকে তার কপালে একটা চুমো খেলো রানা।

নিজেদের কেবিন ছেড়ে সেলুনের দিকে আসছে ও। সেলুনে ঢুকতেই সিকান্দারকে একা দাঁড়িয়ে থাকতে দেখল, দু'কোমরে হাত, চারপাশে নানা রকম রসদ। লোকজনের কণ্ঠস্বর ডকসাইডের দিকে মিলিয়ে যাচ্ছে। 'আমিনা ঘুমাচ্ছে?'

'হ্যাঁ।'

প্রকাণ্ডদেহী লোকটা রানার দিকে সরাসরি একাধারে বিষণ্ন ও আবেদন ভরা দৃষ্টিতে তাকাল। 'মা-বাবা নেই, তাই বলছি–এমন কিছু করবেন না মনে যাতে কষ্ট পায় মেয়েটা।'

'ধন্যবাদ।' রানা ভেবে পেল না আর কী বলবে।

'আমি ওর অনেক কাজ অনুমোদন করি না,' আবার বলল বুড়ো সিকান্দার। 'এমনও হয়েছে, ওকে দেখলে মুখ ফিরিয়ে নিয়েছি। কিন্তু ও আমার প্রিয় বন্ধুর মেয়ে না? আমার সম্পত্তি আর ব্যবসা ওকেই তো আমি দিয়ে যাব। সেজন্যেই বলছি, দয়া করে ওর মনে কোনও কষ্ট দেবেন না। আল্লাহ না করুন, সেরকম যদি কিছু ঘটে, আমাকে আপনি শত্রু হিসেবে দেখতে পাবেন। বুঝলেন তো?'

'আপনি বলার আগেই বুঝেছি। আমার শত্রু হওয়ার কোন সুযোগ আপনি পাবেন না।'

'ধন্যবাদ। সেক্ষেত্রে আমরা সবাই সুখী হব।' হঠাৎ হাসল সিকান্দার। 'আপনি ভাগ্যবান পুরুষ।'

'কেন?'

'অভিযানে বেরুচ্ছেন, সঙ্গে সুন্দরী আর সাহসিনী এক তরুণী। আমার সময়ে এরকম কাউকে পাইনি আমি।'

'সেজন্যেই বিয়ে করেননি, মনের মত কাউকে না পাওয়ায়?'

'আমি বিয়ে করিনি কথাটা ঠিক নয়, যাকে মনে ধরেছিল সে আমাকে বিয়ে করতে রাজি হয়নি। এ প্রসঙ্গ থাক। আমি এসপিওনাজ জগতে আমিনার ঢুকে পড়ার কথাটা ভাবছিলাম। আমার কাছে ভারী আশ্চর্য লাগে।'

'কারণ?'

'আমিনা মুসলমান মেয়ে। ভারত শুধু হিন্দুদের দেশ নয়– ক্ষমতায় ধর্মান্ধ, উগ্র, সাম্প্রদায়িক দল। ওর বিবেকে বাধল না?'

'আপনার পছন্দ না-ও হতে পারে, তবে আমিনার যুক্তিটা আমি আন্দাজ করতে পারি।'

'এই কাজের পিছনে কোন যুক্তি থাকতে পারে না।'

'পারে। ইরাক আক্রমণের সময় গ্রিক সরকার মার্কিনিদের বিরোধিতা করেনি? ভারত নিন্দা করেনি? প্রতিবাদ করেনি ফ্রান্স, জার্মান, দক্ষিণ আফ্রিকা, চীন, রাশিয়া? এ-সব দেশের সরকারপ্রধান বা সংখ্যাগুরু নাগরিক মুসলমান নয়। এর মানে দাঁড়াল, মানুষকে আসলে অন্যায়ের প্রতিবাদ করতে হয়, সমর্থন আর সহায়তা দিতে হয় আদর্শ ও ন্যায়কে।'

'ঠিক আছে, আপনার সঙ্গে পারব না। কিন্তু কাশ্মীরে ভারত যে অন্যায় করছে এটা তো মিথ্যে নয়?'

রানা তিক্ত একটু হাসল। 'কাশ্মীরীরা নিজেদের স্বাধীন করে নিচ্ছে না কেন? আপনার বা আমার মত যোদ্ধা নিজেদের প্রাণ দিয়ে ওদেরকে স্বাধীন করে দেব, সেই আশায় অপেক্ষা করছে নাকি? আসলে যখন সময় হবে, কেউ ওদেরকে দাবিয়ে রাখতে পারবে না।'

'হুম।' মাথা নিচু করে কী যেন চিন্তা করল সিকান্দার। তারপর বলল, 'এবার কাজের কথা। ফুয়েল আর পানি। দুটোই পুরোপুরি ভরা হয়েছে। খাবারদাবার–পরে। অস্ত্রশস্ত্র–আপনি বরং একবার দেখে নিন। এদিকে।'

টেবিলের দিকে এগিয়ে এলো রানা। অয়েলস্কিন-এর বান্ডিল খুলে একটা বেরেটা এম. থারটিফোর নাইন-এমএম অটোমেটিক আর দু'বাক্স অ্যামিউনিশন, চারটে গ্রেনেড, প্রায় ষাট রাউন্ড বুলেটসহ একটা ব্রিটিশ শর্ট ম্যাগাজিন লী এনফিল্ড রাইফেল বের করল সিকান্দার। অস্ত্রগুলো নতুন নয়, তবে নিয়মিত যত্ন নেয়া হয়। রাইফেলটা তুলে রিয়ার সাইটে চোখ রাখল রানা। 'যেন মনে হচ্ছে হাতের কাছে ছিল সব?' জিজ্ঞেস করল ও।

'যুদ্ধ থেকে সরে এসেছি, তাই বলে হাত খালি করে তো আর বসে থাকা চলে না। এগুলো সব সময় নাগালের মধ্যেই রাখি–রাইফেল আর অটোমেটিক, দুটোই লাইসেন্স করা। এদিকে গুণ্ডাপাণ্ডার কোন অভাব নেই। ব্যবহার করতে হয় না, আড়াল থেকে একটু দেখালেই সালাম দিয়ে কেটে পড়ে।'

কথা বলবার ফাঁকে স্টারবোর্ড সাইডের বেঞ্চ-এর কাঠের ঢাকনি তুলল

সিকান্দার। ভেতর থেকে আরও একটা অয়েলস্কিন প্যাকেজ বের হলো। থমসন এমআই সাব-মেশিন গানটা রানার জন্য একটা চমকই বলতে হবে। বাকিগুলোর মত এটার অবস্থাও খুবই ভাল।

'এটা আমেরিকার তৈরি। বোটেই রাখি। খুব ইচ্ছে হয়েছিল ওদের অস্ত্র দিয়েই ওদেরকে খতম করি ইরাকে। কিন্তু বয়েস আসলে রাজি হয় না। দেখুন আপনাদের কোন কাজে লাগে কিনা।' ইঙ্গিতে অ্যামিউনিশনের স্তূপটা দেখাল। 'কী মনে হয়, ফায়ারপাওয়ার আরও লাগবে?'

একটু ইতস্তত করে রানা বলল, 'ঠিক বলতে পারছি না। এখানে যা দেখছি, ট্যাংক ছাড়া সবই থামাতে পারব। কিন্তু ঠিক কী থামাতে হবে সে-সম্পর্কে আমার কোন ধারণা নেই।'

'ধারণা যখন হবে, আমাকে জানাতে ভুলবেন না।' রানার কাঁধ চাপড়ে আশ্বস্ত করল অভিজ্ঞ যোদ্ধা। 'বাজুকা, গ্রেনেড লঞ্চার থেকে শুরু করে চাই কি স্বল্প পাল্লার মিসাইল পর্যন্ত ব্ল্যাকমার্কেট থেকে কিনে আনতে পারব।'

'ধন্যবাদ। তবে এ-সব আমাদের এখনই দরকার পড়বে না, সরিয়ে রাখাটাই ভাল।'

অস্ত্রগুলো সরানোর কাজ শেষ হয়েছে, এই সময় বাইরের ডেক থেকে হালকা পায়ের আওয়াজ ভেসে এলো। সতেরো কি আঠারো বছর বয়েস, বেশি লম্বা নয়, তবে বয়েসের তুলনায় যথেষ্ট শক্ত-সমর্থ, দরজা পেরিয়ে সেলুনে ঢুকল এক তরুণ। রানার উদ্দেশে গম্ভীর ভঙ্গিতে মাথা ঝাঁকাল ছেলেটা।

'এ হলো আমাদের জুলহাস ডোগো,' বলল সিকান্দার। বোটটা আমরা দু'জনই ম্যানেজ করতে পারব, কিন্তু হুইলে আমাদের একজন রিলিফ দরকার হবে। এই বোট আর এদিকের সাগর খুব ভাল চেনে ডোগো। ব্যস, আর কাউকে আমাদের দরকার নেই। গোলাগুলি শুরু হওয়ার আগে ওর পকেটে কিছু ড্র্যাকমা গুঁজে দিয়ে তীরে কোথাও নামিয়ে দিলেই হবে। ভাল কথা, আর্মস যখন আপনার পছন্দ হয়েছে, গ্যাঙওয়ে তুলে ফেলতে পারি আমরা।'

ডোগোকে নির্দেশ দিল সে। আবার মাথা ঝাঁকিয়ে প্রায় নিঃশব্দ পায়ে সেলুন থেকে বেরিয়ে গেল ডোগো। তারপরই সেলুনে ঢুকল আমিনা।

নীল জিনস আর গাঢ় রঙের ছেলেদের সুতি শার্ট পরেছে সে। রাবার ব্যান্ড দিয়ে সমস্ত চুল মাথার পিছনে আটকানো। দ্রুত চোখ বুলিয়ে সিকান্দার আর রানাকে দেখে নিল একবার। 'এখনও আমরা রওনা হইনি কেন?'

হেসে ফেলল বুড়ো সিকান্দার। 'বেটির কথা শোনো। সেই কখন থেকে তৈরি হয়ে অপেক্ষা করছি। কিন্তু যাবটা কোথায়? সে তো একা শুধু তুমি জানো। এখনও কি আমাদেরকে বিশ্বাস করবার সময় হয়নি?'

'বাধ্য না হলে বলব না,' দৃঢ়কণ্ঠে বলল আমিনা, রানার চোখ দুটোকে সযত্নে এড়িয়ে।

আমিনার এই তথ্য চেপে রাখবার কঠিন পণ একই সঙ্গে অদ্ভুত অথচ প্রশংসনীয় বলে মনে হলো রানার।

চোখ মিটমিট করল আমিনা, মনে মনে একটা সিদ্ধান্তে পৌঁছাল। 'আপাতত

সিক্লেডিস দ্বীপপুঞ্জের দিকে চলো, চাচা। সময় হলে জানাব কোন দ্বীপে যেতে চাই আমি।'

'বেশ। মিস্টার রানা, লেট'স গো।'

পাঁচ মিনিট পর নোংরা লিনেন সুট পরা এক লোক হাঁপাতে হাঁপাতে জেটিতে পৌঁছাল, ক্রমশ ছোট হতে থাকা অ্যাপড্-এর আকৃতিটা ভাল করে দেখল, তারপর ঘুরে কাফের দিকে ছুটল ফোন করবার জন্য।

দশ

'এই এখানে যাচ্ছি আমরা।' আমিনার আঙুল খোলা ম্যাপটার ওপর নেমে এলো। 'ভ্রাকোনিসি।'

তার কাঁধের ওপর দিয়ে তাকিয়ে মাথা ঝাঁকাল সিকান্দার। 'পৌঁছাতে কম করেও চোদ্দ ঘণ্টা লাগবে—অ্যাপড্কে আমি ঘণ্টায় আট নট স্পীডে চালাব, তার বেশি নয়। আবহাওয়া খারাপ হলে সময় আরও বেশি লাগবে।'

'এখন অবশ্য সাগর শান্তই,' বলল রানা।

নীল সাগর প্রায় নিভাঁজ, পিছিয়ে যাচ্ছে। দু'মাইল দূরে, তীরের বড় আকারের চিহ্নগুলো এখনও পরিষ্কার দেখা যাচ্ছে, তবে আসন্ন শারদীয় গোধূলিলগ্নে ওগুলোর রঙ এই মাত্র বদলাতে শুরু করেছে—ছড়ানো-ছিটানো সাদা দালানগুলো চকচকে ভাব হারাচ্ছে, সবুজ গাছের সারি নীলচে হয়ে আসছে, পাহাড়ী ঢালের কালো সারফেস আরও গাঢ় ও গম্ভীর দেখাচ্ছে। এক সারিতে কয়েকটা ডিঙ্গি নিয়ে একটা ফিশিং বোট অ্যাপড্ আর তীরের মাঝখান দিয়ে পাইরিয়াস-এর দিকে চলে যাচ্ছে, ওগুলোর চলার গতি ও ভঙ্গি এত সাবলীল যেন বরফের ওপর দিয়ে ছুটছে।

'এদিকে সাগর সাধারণত শান্তই থাকে,' বলল সিকান্দার। 'তবে নিশ্চিত হওয়ার আগে কেপ সাউনিওন-কে পাশ কাটিয়ে অ্যাটিকার আশ্রয় থেকে বেরুতে দিন বোটকে। ওদিকে একটা বাতাস আছে, আমরা বলি উত্তুরে অভিশাপ, মাঝে মধ্যে সত্যি রাক্ষসী হয়ে ওঠে। তবে তার আগে পর্যন্ত এদিকের পানিতে ভাল সুবিধে পাব আমরা, তরতরিয়ে কীয়া-র দিকে এগোব—কিথনোস আর সেরিফোস-কে পাশ কাটিয়ে দক্ষিণে, সিপনোসকে ঘুরে পুবে। আবহাওয়া এদিকেও গোলমাল করতে পারে, সেক্ষেত্রে শেলটার নিতে হবে অ্যান্টিপ্যারোস বা প্যারোস-এ। আমি যাই, ডোগোকে সব বলে রাখি।'

সিকান্দার চলে গেল। বেঞ্চে বসে হেলান দিল রানা, তীরের দিকে তাকাতে ঝাপসা লাগল সব। এঞ্জিনের শব্দ অস্পষ্ট, বোটে কোন কাঁপুনি নেই। গোটা অস্তিত্ব জুড়ে উদ্বেগ থাকলেও আত্মবিশ্বাস হারায়নি ও। অনেক রহস্যের মীমাংসা করতে হবে, জবাব পেতে হবে বিরাট সব প্রশ্নের, উৎসাহ নিয়ে লড়তে হবে কঠিন লড়াই; তবে ভোরের আলো না ফোটা পর্যন্ত নিরাপত্তা বিঘ্নিত হওয়ার

কোন ভয় নেই। অ্যাকশন শুরু হওয়ার আগের এই ফাঁকা সময়টায় যা কিছু জানবার আছে জেনে নিতে হবে ওকে। গোলাগুলি আর এই শান্ত পরিবেশের মাঝখানের মুহূর্তগুলো খুব মূল্যবান, কারণ কেউ বলতে পারে না বুলেটগুলোকে এ যাত্রায় ও ফাঁকি দিতে পারবে কিনা।

আড়চোখে আমিনা আথিয়ানার দিকে তাকাল ও। তার সৌন্দর্য, দৃঢ়চেতা ভাব, বুদ্ধিমত্তা–সব যেন আরেকবার নতুন করে উপলব্ধি করছে। উন্নত বিশ্বের যে-কোন দেশে এই ক্যালিবারের একটা মেয়ে জার্নালিজম বা এনটারটেইনমেন্ট-এ নিজের জন্য অত্যন্ত উজ্জ্বল একটা ক্যারিয়ার তৈরি করে নিতে পারত। গ্রিসের মত দেশে মুসলমান মেয়ের জন্য সে ধরনের সুযোগ সামান্যই।

ম্যাপটা তুলে নিয়ে কাস্তে আকৃতির দ্বীপটা খুঁজে বের করল রানা। ভ্রাকোনিসি। ম্যাপ রেফারেন্স-এ বলা হয়েছে 'পাথুরে দ্বীপ'। উত্তেজক কিছু নয়। তবে স্থানীয় লোকমুখে শোনা যায়, একসময় দ্বীপটার নাম ছিল থ্রাকোনিসি–মানে হলো, ড্রাগন আইল্যান্ড।

'এই গল্প তুমি কোনও ইতিহাসের বইতে পাবে না,' রানার প্রশ্নের উত্তরে বলল আমিনা।

'তা না পাই, কিন্তু এটা তো সত্যি যে আধুনিক একটা ড্রাগন এই এলাকায় কোন বদ মতলব নিয়ে ঘোরাফেরা করছে। এই ড্রাগনের নাম সিআইএ।'

এই সময় ফিরে এলো সিকান্দার। রানার শেষ দিকের কথাগুলো তার কানে গেছে। থমকে দাঁড়িয়ে পড়ল সে।

'এই কেসটার প্রতিটি স্তরে আমেরিকানদের ছাপ দেখতে পাচ্ছি আমি। অন্যের ব্যাপারে অনধিকার চর্চা, শান্তির সময় প্রযোজ্য এসপিওনাজ জগতের অলিখিত বিধিনিষেধ বা রীতিনীতির প্রতি অশ্রদ্ধা, সবচেয়ে বড় কথা বেপরোয়া ক্ষমতার দম্ভ। আর এখন পরিস্থিতি এমন দাঁড়িয়েছে, আমেরিকা যদি বলে আমাদের গোটা গ্যালাক্সির মালিক তারা, ঈশ্বরের কাছ থেকে চারপাশের নিরানব্বুই কোটি আলোকবর্ষ এলাকা লীজ নিয়েছে, ব্রিটেন লাফ দিয়ে উঠে বলবে, "হ্যাঁ, অবশ্যই, কসম খোদার, আমি সাক্ষী।" তবে আন্দাজে বেশি ঢিল না ছুঁড়ে, এবার কিছু ফ্যাক্ট নিয়ে আলোচনা করা যাক। ঘটনা বা অনুষ্ঠান, যাই হোক, আমিনা আমাদেরকে জানিয়েছে সেটা কোথায় ঘটবে। এখন আমাদের জানতে হবে, ঘটনাটা আসলে কী? ওখানে আসলে কী ঘটতে যাচ্ছে?'

'ঠিক আছে। বলেই ফেলি।' পা দুটো বেঞ্চে তুলে ফেলল আমিনা, হাত দিয়ে হাঁটু দুটো পেঁচিয়ে ধরল।

রানা নড়ছে না, আমিনার ওপর স্থির চোখে পলক নেই।

লুদিয়ান সিকান্দারকে সেলুনের দোরগোড়ায় মর্মরমূর্তি বললেই হয়।

'এটা একটা মীটিং, আর এই মীটিংটার নাম **টপ সিক্রেট**,' এভাবে শুরু করল ইন্ডিয়ান সিক্রেট সার্ভিসের গ্রিস এজেন্ট আমিনা আথিয়ানা। ধীরে ধীরে, প্রচুর সময় নিয়ে, সে যা বলল তার সংক্ষেপ হলোঃ

আমেরিকা ও ব্রিটেন ইরাক আক্রমণের কয়েক হপ্তা পর মালয়েশিয়ার

প্রধানমন্ত্রী মাহাথির মহম্মদ দক্ষিণ ও দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ার বেশ কয়েকটি দেশে গোপন এক বার্তা পাঠান। সেই বার্তায় এই অঞ্চলের ভৌগোলিক, বাণিজ্যিক এবং সামরিক স্বার্থ রক্ষার জন্য ইউরোপিয়ান ইউনিয়নের আদলে একটা জোরাল সংগঠন গড়ে তোলার গুরুত্ব ব্যাখ্যা করা হয়। ব্যাখ্যার সঙ্গে জুড়ে দেয়া প্রস্তাবনায় বলা হয়, এশিয়ার পশ্চাদপদ জনগোষ্ঠীকে নরকতুল্য দারিদ্র্য থেকে মুক্তি দেওয়ার লক্ষ্যে পশ্চিমা মাল্টি ন্যাশনাল কোম্পানিগুলোকে হটিয়ে দিয়ে এশীয় জায়ান্ট কোম্পানিগুলোকে শাখা বিস্তারের সুযোগ দেয়া হবে, গোটা অঞ্চলে একক মুদ্রার প্রচলন করা হবে, একদেশ থেকে আরেকদেশে যেতে শ্রমিকদের কোন ভিসা লাগবে না, যে-কোন সামরিক সংঘাত আলোচনার মাধ্যমে এড়ানো হবে, আমদানি-রপ্তানির মধ্যে ভারসাম্য ফিরিয়ে এনে বাণিজ্যিক ঘাটতিজনিত সমস্যার সমাধান করা হবে, বিদেশী আক্রমণের মুখে একজোট হয়ে রুখে দাঁড়াবে প্রতিটি সদস্য রাষ্ট্র ইত্যাদি।

মাহাথির মহম্মদের এই আহ্বানে সাড়া দেয়নি বেশ কিছু রাষ্ট্র। তাদের মধ্যে অন্যতম হলো পাকিস্তান। পাকিস্তান সরকার জানিয়েছে, মানচিত্রে তাদের অবস্থান দক্ষিণ এশিয়ায় হলেও, আসলে তারা মধ্যপ্রাচ্যের কাছাকাছি রয়েছে, কাজেই সাউথ এশিয়ান ইউনিয়নে যোগ দেওয়ার কোনরকম ইচ্ছে তাদের নেই। প্রস্তাবটা প্রত্যাখ্যান করবার পর থেকে মালয়েশিয়া বা সংশ্লিষ্ট অন্য কোন দেশ পাকিস্তানের সঙ্গে এ-বিষয়ে আর কোন আলোচনা বা যোগাযোগ করেনি, বরং সযত্নে এড়িয়ে গেছে।

পাকিস্তান ছাড়াও আরও কয়েকটা দেশ এই প্রস্তাবে সাড়া দেয়নি, সেগুলো হলো—আফগানিস্তান, বাহরাইন, কুয়েত, জর্জিয়া, জাপান, দক্ষিণ কোরিয়া, ফিলিপাইনস, কাতার ও থাইল্যান্ড। বলাই বাহুল্য যে ইরাক, ইজরায়েল, তাইওয়ান ও তুরস্ক সহ কয়েকটি দেশকে এই সংগঠনে সামিল হওয়ার আমন্ত্রণ জানানো হয়নি।

প্রধানমন্ত্রী মাহাথির মহম্মদের প্রস্তাব নিয়ে ভারত ও চিন সহ আগ্রহী রাষ্ট্রগুলো ইতিমধ্যে দু'বার দুটো গোপন মীটিঙে অংশগ্রহণ করেছে। প্রথম মীটিংটা অনুষ্ঠিত হয়েছে ভিয়েতনামের হো চি মীন শহরে, দ্বিতীয়টা মালয়েশিয়ার রাজধানী কুয়ালালামপুরের উপকণ্ঠে। দুটো মীটিঙেই সংশ্লিষ্ট প্রতিটি দেশের প্রতিনিধিদের সঙ্গে ইন্টেলিজেন্স চীফরাও যোগ দিয়েছিলেন।

এবার হবে মন্ত্রী পর্যায়ের টপ সিক্রেট তৃতীয় মীটিং। এই মীটিঙে সাউথ এশিয়া ইউনিয়ন গঠনের নীতিমালা চূড়ান্ত করা হবে, সেই সঙ্গে খসড়া একটা চুক্তিও অনুমোদন করা হবে।

তবে এবার কিছু ঝামেলা দেখা দিল। বিসিআই চীফ মেজর জেনারেল (অবসরপ্রাপ্ত) রাহাত খান গোপন সূত্রে খবর পেলেন ইতিমধ্যে অনুষ্ঠিত মীটিং দুটির কথা ইউরোপ-আমেরিকার এসপিওনাজ মহলে ফাঁস হয়ে গেছে। সাউথ এশিয়ান ইউনিয়ন গঠনে মালয়েশিয়া যেহেতু প্রধান উদ্যোক্তা, রাহাত খান ব্যক্তিগতভাবে যোগাযোগ করে প্রধানমন্ত্রী মাহাথির মহম্মদকে জানালেন, তৃতীয় অর্থাৎ টপ সিক্রেট মীটিং কোথায় অনুষ্ঠিত হবে তা যেন সংশ্লিষ্ট কোনও দেশের

ইন্টেলিজেন্স জানতে না পারে। এমন কি, তিনি আরও পরামর্শ দিলেন, যে-দেশে মীটিংটা হবে সে দেশের ছাড়া অন্য কোন দেশের ইন্টেলিজেন্স যেন সেখানে উপস্থিত না থাকে। মাহাথির মহম্মদ তাঁর এই পরামর্শ গুরুত্বের সঙ্গে গ্রহণ করেন। মালয়েশিয়ার তরফ থেকে সংশ্লিষ্ট রাষ্ট্রগুলোকে জানিয়ে দেয়া হয় তৃতীয় মীটিঙে আয়োজক দেশ ছাড়া অন্য কোন দেশের স্পাই বা ইন্টেলিজেন্স এজেন্টরা উপস্থিত থাকতে পারবে তো নাই-ই, এমনকি তাদেরকে জানতেও দেয়া চলবে না মীটিংটা কোথায় হচ্ছে।

এই শর্ত সবাই মেনে নেয়। তবে এর ফলে, নিরাপত্তার অজুহাত তুলে, কয়েকটা দেশ টপ সিক্রেট মীটিংটা নিজেদের দেশে অনুষ্ঠানের প্রস্তাব দেয়। এদের মধ্যে অন্যতম হলো ভারত ও চিন। বিষয়টা নিয়ে মতবিরোধ চরম আকার নিতে যাচ্ছে দেখে প্রধানমন্ত্রী মাহাথির মহম্মদ সব দিক চিন্তা করে একটা আপস ফর্মুলা পেশ করেন। তাতে বলা হয়, নিউট্রাল জোন হিসেবে গ্রিসের একটা দ্বীপকে বেছে নেয়া হবে। টপ সিক্রেট মীটিঙের সিকিউরিটির দায়িত্ব এককভাবে থাকবে ভারতের ওপর। এবং ভালয় ভালয় খসড়া চুক্তি অনুমোদন হওয়ার পর, ছ'মাসের মধ্যে, প্রকাশ্য ঘোষণা দিয়ে বিশ্ববাসীকে জানানো হবে সাউথ এশিয়ান ইউনিয়নের শীর্ষ বৈঠকের দিন-ক্ষণ। সেই অনুষ্ঠানটির আয়োজন করবে বেইজিং। শুধু তাই নয়, এশিয়ান ইউনিয়নের সদর দফতরও হবে চীনের সাংহাই প্রদেশে।

এভাবেই সমস্যাগুলোর সমাধান করা হয়। সংশ্লিষ্ট রাষ্ট্রগুলো প্রতিটি বিধিনিষেধ অক্ষরে অক্ষরে পালন করে টপ সিক্রেট মীটিঙে অংশ গ্রহণ করবার প্রস্তুতি নিয়েছে। প্রতিটি দেশ থেকে পররাষ্ট্র মন্ত্রীকে সাহায্য করবার জন্য তাঁর সঙ্গে সম্মেলনে যোগ দেবেন মাত্র দুজন; প্রথমজন সরকারপ্রধানের বিশেষ প্রতিনিধি, দ্বিতীয়জন মনোনীত একজন সচিব। নিশ্ছিদ্র নিরাপত্তা নিশ্চিত করবার জন্য তাঁরাও একেবারে শেষ মুহূর্তে জানবেন মীটিংটা কোথায় অনুষ্ঠিত হতে যাচ্ছে। সিকিউরিটির দায়িত্ব যেহেতু ভারত নিয়েছে, ওদের একাধিক ইন্টেলিজেন্সকে মাঠে নামানো হয়েছে। তারা শুধু আলোচ্য দ্বীপটার নিরাপত্তা বিধান করছে না, প্রতিটি দেশ থেকে প্রতিনিধিদলকে ওখানে নিয়ে যাওয়ার ব্যবস্থাও করেছে। অর্থাৎ মীটিংটা কোথায় বা কবে অনুষ্ঠিত হচ্ছে তা ভারতীয় ইন্টেলিজেন্স সংস্থাগুলো ছাড়া আর কেউ জানে না।

মাঝে একবার বিরতি নিল আমিনা। এই ফাঁকে সিকান্দার রানাকে জিজ্ঞেস করলেন, 'মিস্টার রানা, আপনি কি এ-সব কিছুই জানতেন না?'

মাথা নাড়ল রানা। 'কিভাবে! আমাদের কাজে যার যা জানার প্রয়োজন নেই তাকে সেটা জানানো হয় না। আর আমি কোন্ ছার, এক্ষেত্রে তো আমার বস্‌ই কিছু জানেন না।'

কথা বলবার ফাঁকে রানার মাথার ভেতর অন্য কাজও চলছে। আমিনা যা বলছে তার তাৎপর্য বোঝার চেষ্টা করছে ও, ফুটে ওঠা ছবিটার সঙ্গে নিজের কাছে যে-সব তথ্য আছে সেগুলো মিলিয়ে দেখছে। পরিস্থিতিটা ভয়াবহ লাগছে ওর কাছে।

'তো,' আবার শুরু করল আমিনা, 'আমাদের একটা দ্বীপকেই আদর্শ বলে মনে করা হয়েছে–এক প্রান্তে, অথচ চারপাশে প্রচুর লোকজন আর ট্যুরিস্ট, ফলে হঠাৎ করে বেশ কয়েকজন আগন্তুককে আসতে দেখলে কেউ বিশেষভাবে লক্ষ করবে না। ভ্রাকোনিসিকে বেছে নেওয়ার কারণ হলো, ওটার একদিকে পাথরের ওপর বড় একটা বাড়ি আছে, পৌঁছানো যায় শুধুমাত্র পানিপথ দিয়ে।'

'কোন জায়গাটার কথা বলছ আমি জানি,' বলল সিকান্দার। 'আরেকবার প্রমাণিত হলো, মহামান্য মাহাথির মহম্মদের মস্তিষ্ক নিঃসন্দেহে উর্বর। ওখানে ওদের ওপর সারপ্রাইজ অ্যাটাক এতই কঠিন হবে যে প্রায় অসম্ভবই বলা যায়। আর শত্রু তো ওই সুযোগটাই সব সময় পেতে চায়।'

চিন্তায় সরু হয়ে উঠল রানার চোখ। 'আসুন তার স্ট্র্যাটিজি বিবেচনা করি।'

'হাতে উজোর গ্লাস থাকতে হবে, প্লিজ, মিস্টার রানা।' টেবিল ছেড়ে কম্প্যানিয়নওয়ের পোর্ট সাইডে রাখা আইসবক্সের দিকে হেঁটে এলো। 'উত্তেজনা আনে এমন একটা পানীয় ছাড়া গ্রিসে সব কিছু অচল। কফি হলেও চলে, তবে এখন কফির সময় নয়। আমরা আধুনিক হেলেনিয়ানরা মগজকে সতেজ রাখবার জন্যে কিছু অনিয়ম করি বটে।'

রানা ভাল-মন্দ কোন মন্তব্য না করায় সিকান্দার একা শুধু নিজের জন্য একটা গ্লাসে উজো ঢালল। আমিনা খায় কিনা তার পরিষ্কার ধারণা নেই, তবে জানে যে অন্তত তার সামনে খাবে না। অবশ্য বিব্রতকর অবস্থা এড়াতে আমিনা আগেই গ্যালিতে চলে গেছে।

একটু পরই ধূমায়িত দুই মগ কফি নিয়ে ফিরে এলো সে।

'শত্রুর স্ট্র্যাটিজি হলো,' ধীরে ধীরে বলল রানা, 'ভায়োলেন্সের সাহায্যে কনফারেন্স ভেঙে ফেলা, তা ভাঙতে গিয়ে যত বেশি মানুষকে পারা যায় খুন করা, সেই সঙ্গে গোটা ব্যাপারটাকে এশীয়দের ঘরোয়া বিরোধের হিংস্র ফলাফল বলে প্রচার করা। তাদের এই নৃশংস ষড়যন্ত্রে ভিলেন হিসেবে বাছাই করা হয়েছে আমার বস্ আর আমাকে–দেখানো হবে বাংলাদেশ কাউন্টার ইন্টেলিজেন্সই এই পাইকারী হত্যাকাণ্ডের জন্যে দায়ী। আয়োজনটা এমনভাবে করা হয়েছে, দাবিও করতে পারব না যে কাজটা আমরা করিনি।'

'মানে?' সিকান্দার হাঁ করে তাকিয়ে আছে।

'আমাদের লাশ পাওয়া যাবে, হাতে মারাত্মক অস্ত্র। আমাদের সার্চ করলে কিছু কাগজ-পত্রও পাওয়া যাবে, যেগুলো প্রমাণ করবে আমরা হুকুমের দাস হিসেবে দায়িত্ব পালন করেছি মাত্র। সবাই অবশ্য বুঝবে যে গোটা ব্যাপারটা সাজানো, স্রেফ একটা ষড়যন্ত্র, তবে পশ্চিমা মিডিয়ার কল্যাণে সারা দুনিয়া জুড়ে প্রচার হতে থাকবে মিথ্যেটাই, সত্য মাথাই তুলতে পারবে না। এত বড় একটা ক্রাইম করবার পর বাংলাদেশের অবস্থাটা এবার কল্পনা করা যাক। ব্রিটেন, আমেরিকা, অস্ট্রেলিয়া, দক্ষিণ কোরিয়া, জাপান–এরকম অন্তত ত্রিশটা দেশ থেকে প্রায় পঞ্চাশ লাখ বাঙালীকে ঘাড় ধরে বের করে দেয়া হবে। কী এটা? এটা হলো শাস্তি। পশ্চিমা তেল কোম্পানির শর্ত অনুসারে গ্যাস বিক্রি না করা আর আমেরিকার অন্যায় আবদার ইরাকে মার্কিনদের বদলে খুন হওয়ার জন্য

বাংলাদেশী সৈন্য না পাঠানোর শাস্তি...'

'এক মিনিট, রানা।' সামনের দিকে ঝুঁকে ব্যাকুল দৃষ্টিতে তাকিয়ে আছে আমিনা। 'প্রথমেই ক্ষমা চেয়ে নিচ্ছি। কারণ বিসিআই-এর একটা মেসেজ আড়িপাতা যন্ত্রের সাহায্যে ইন্ডিয়ান ইন্টেলিজেন্স র পিক করেছে। যেভাবেই হোক, আমার কানেও মেসেজটা এসেছে...'

'কিন্তু আমি তো জানি তুমি ইন্ডিয়ান সিক্রেট সার্ভিসে কাজ করো।'

'হ্যাঁ, ঠিকই জানো, তবে সিকিউরিটির মূল দায়িত্ব পালন করছে র।'

'বিসিআই-এর রিপোর্ট আড়ি পেতে শোনার কোন অধিকার ওদের নেই,' প্রতিবাদ করল রানা।

'ওদের হয়ে তোমার কাছে আমি ক্ষমা চেয়ে নিইনি? বাধা দিয়ো না, মেসেজটায় কী আছে শোনো।'

'এ তোমাদের ভারী অন্যায়!' রানা ভাব দেখাল এখনও ব্যাপারটাকে মেনে নিতে পারছে না। তবে মেসেজটা কী তা জানে ও। টেলিফোনে সবই ওকে জানিয়েছে সোহেল।

'মেসেজটা তোমাদের চীফ অ্যাডমিনিস্ট্রেটর মিস্টার সোহেল আহমেদকে পাঠানো হয়েছে, রানা এজেন্সির লন্ডন শাখা থেকে।'

রানা গম্ভীর, মুখে কথা নেই।

'মেসেজে বলা হয়েছে, কনফারেন্স ব্যর্থ করবার প্ল্যানটা আমেরিকাই করেছে, কারণ দক্ষিণ এশিয়ার ইউনিয়ন ভবিষ্যতে ন্যাটোর মত একটা সামরিক সংস্থার জন্ম দিতে পারে বলে ভয় পাচ্ছে তারা, ভয় পাচ্ছে সবাই এক জোট হলে ভারত ও চীন তার প্রতিদ্বন্দ্বী সুপারপাওয়ার হয়ে উঠবে। যার ফলে দুনিয়ার ওপর একছত্র আধিপত্য হারাবে মার্কিন পরাশক্তি। তবে কনফারেন্স ব্যর্থ করা আর পাইকারীভাবে উপস্থিত সবাইকে হত্যা করা, দুটো এক কথা নয়। তোমাদের রিপোর্টে বলা হয়েছে, এর জন্যে ব্রিটেনের প্রধানমন্ত্রী টনি ব্লেয়ার দায়ী।'

'ওটার তো জন্মই হয়েছে আমেরিকার পা চাটার জন্যে!' রানা কিছু বলবার আগে সিকান্দার খেপে উঠল। 'আরে, ইউরোপিয়ান ইউনিয়নের সঙ্গে কেমন বেঈমানী করল দেখলেন না? নিজ মহাদেশের স্বার্থ জলাঞ্জলি দিয়ে আমেরিকার সঙ্গে ইরাক আক্রমণ করে বসল। এই নির্লজ্জ লোকের পক্ষে অসম্ভব বলে কিছু নেই।'

'এক্ষেত্রেও ঠিক তাই ঘটেছে,' বলল আমিনা। 'সাউথ এশিয়ান ইউনিয়নকে নিয়ে মাথাব্যথা আমেরিকার, কিন্তু সেই মাথাব্যথার দাওয়াই তৈরি করে দিচ্ছে ব্লেয়ার মাইন্ড ইট, রিপোর্টে শুধু টনি ব্লেয়ারের কথা বলা হয়েছে, ব্রিটিশ সরকারকে জড়ানো হয়নি।'

'ঢাকার সঙ্গে যোগাযোগ করলে রিপোর্টটা আমিও পাব,' বলল রানা, 'তবে এখনি আমি তোমার মুখে সবটুকু শুনতে চাই।'

'টেলিফোনে শুনেছি, ডিটেইলস্ আমি নিজেও জানি না,' বলল আমিনা। 'তবে এটুকু পরিষ্কার যে কীভাবে কী করতে হবে তার একটা ছক তৈরি করেছে ব্লেয়ারের

নিজস্ব একটা গোপন ইন্টেলিজেন্স সংস্থা। এই সংস্থার এজেন্টরা শুধু ব্লেয়ারের কাছে জবাবদিহি করে থাকে। জেনারেল রাহাত খান আর তোমাকে ভিলেন বানাবার প্ল্যানটা ব্লেয়ারের। তোমরা হবে নিহত ভিলেন—এটা তার স্পষ্ট নির্দেশ।'

এক মিনিট কেউ কথা বলল না। তৈল মর্দন করতে গিয়ে দুনিয়ার বুকে অশান্তি আর যুদ্ধ-বিগ্রহ ডেকে নিয়ে এসেছে এমন ঘৃণ্য রাজনীতিক অতীতে অনেক দেখা গেছে, টনি ব্লেয়ার যেন তাদের সবাইকে লজ্জায় ফেলে দেবে বলে প্রতিজ্ঞা করেছে।

অ্যাপড় তার পথে সাবলীল ভঙ্গিতে ছুটে চলেছে

নিস্তব্ধতা ভাঙল সিকান্দার। 'সব যখন জানা গেছে, ওদের বিষদাঁত ভেঙে দেব আমরা। তবে ডিটেইলস্ জানতে হবে। সিআইএ ঠিক কীভাবে ব্লেয়ারের প্ল্যান সফল করবে। আক্রমণটা কি আকাশ থেকে আসবে? নাকি সাগর থেকে কয়েকটা কামান দেগে খুন করবে সবাইকে?'

'প্লেন নিয়ে আসতে হলে গ্রিসের আকাশসীমা লঙ্ঘন করতে হবে মাথা নাড়ল রানা। 'আমেরিকানরা যে-কোন মূল্যে নিজেদের পরিচয় গোপন রাখতে চাইবে। খুব নিচু দিয়ে হেলিকপ্টার গানশিপ পাঠাতে পারে। তুরস্কে ওদের ঘাঁটি আছে, এয়ারক্রাফট ক্যারিয়ার নিয়ে ক'দিন ধরে সামরিক মহড়াও শুরু করেছে ওরা হেলিকপ্টার গানশিপে মেশিন গান, রকেট লঞ্চার এইসব তো থাকেই। নাপাম বোমাও ছুঁড়তে পারবে। তবে র বা আমরা তৈরি থাকলে ওগুলো ফেলে দেয়া কোন সমস্যা নয়।

'আর কিছু করুক বা না করুক, অবশ্যই ওরা ডাইভারশন ক্রিয়েট করবে। দেখা যাবে এক ঝাঁক হেলিকপ্টার গানশিপ ছুটে আসছে ঠিকই, কিন্তু হামলাটা শুরু হলো আকাশ বা সাগর থেকে নয়, মাটি থেকে। সিকান্দার, জায়গাটা আপনি কতটুকু চেনেন, বলুন তো?'

ভুরু কুঁচকে নিজের পায়ের দিকে তাকাল সিকান্দার। 'মনে করবার চেষ্টা করছি···দ্বীপের শেষ মাথাটা খুবই দুর্গম। কিছু অংশ চাষাবাদের জন্যে কখনোই পরিষ্কার করা হয়নি। চার দিকে ছড়িয়ে আছে বড় বড় বোল্ডার আর ঘন কাঁটা-ঝোপ। হাঁটাচলা করা কঠিন, তবে কাভার হিসেবে ফার্স্ট ক্লাস। কৌশলটা জানা থাকলে আপনি গোটা একটা প্ল্যাটুন ওখানে লুকিয়ে রাখতে পারবেন।'

'আরেক দৃষ্টিতে ব্যাপারটা মোটেও আশাপ্রদ নয়,' বলল আমিনা। 'একটা বাড়ি ভাঙতে হলে স্মল আর্মস বা রাইফেল কোন কাজে আসবে না। হেভি কিছুর দরকার হবে। আমি শুধু মেশিনগান বা গ্রেনেডের কথাও বলছি না। বলছি মিসাইলের কথা। সিআইএ-র কাছে এমন মিসাইল আছে, বহু দূর থেকে ছুঁড়লেও লক্ষ্যভেদ করবে—পাথরের ওই বাড়ি শুধু গুঁড়িয়ে ধুলো হবে না, বাড়ির জায়গায় পঞ্চাশ গজ গভীর গর্তও তৈরি হবে···'

তিক্ত হেসে রানাকে মাথা নাড়তে দেখে চুপ করে গেল আমিনা। 'না। সিআইএ এমনভাবে আক্রমণটা চালাবে, দেখে যাতে মনে হয় এ-ধরনের আক্রমণ চালাবার ক্ষমতা বাংলাদেশের আছে। তা না হলে তো ব্লেয়ারের প্ল্যান কেঁচে যাবে!'

'আরে, তাই তো! তা হলে হেলিকপ্টার গানশিপও বোধহয় বাদ দিতে হয়-অত দূর থেকে বাংলাদেশ ওগুলো এদিকে আনবে কীভাবে! তা হলে কি বাজুকা? লঞ্চার থেকে ছোঁড়া গ্রেনেড আর খুদে রকেট?'

রানা চিন্তিত ও উদ্বিগ্ন। ধীরে ধীরে মাথা নাড়ল। 'জানালায় লাগাতে না পারলে গ্রেনেড বা বাজুকা একটা বাড়ির তেমন কোন ক্ষতি করতে পারবে না। তা ছাড়া খুব কাছ থেকে ছুঁড়তে হয় ওগুলো।'

'তাহলে?'

মাথার চুলে আঙুল চালাল রানা। শুধু উদ্বিগ্ন নয়, উদ্‌ভ্রান্ত দেখাচ্ছে ওকে। 'আমি ভাবছি, বিসিআইকে দিয়ে ওরা ছোট্ট একটা জিনিস চুরি করাবে না তো?'

'ছোট্ট জিনিস···কি?'

'একটা মোবাইল অ্যাটম বোমা? খুদে, ব্রিফকেসে আঁটে? যে-কোন বাঙালী একজন লোককে খুন করে বলল, ওদের অস্ত্রের গুদাম থেকে মিনি এ-বম চুরি করতে এসেছিল দু'জন বিসিআই এজেন্ট, একজন একটা ব্রিফকেস নিয়ে পালিয়েছে, অপর লোকটাকে পালাবার সময় গুলি করে মেরে ফেলা হয়েছে।'

'ও গড! সম্ভব!' আঁতকে উঠল আমিনা। 'তারপর নিজেরা ওই বোমা বাড়িটার ভেতর ফাটিয়ে দিয়ে বলবে বাংলাদেশের কাজ!'

'হ্যাঁ। ওদের সমস্যার এটাই সহজ সমাধান। তবে বোমাটা ডেলিভারি দেওয়ার ঝামেলাটাও সারতে হবে ওদেরকে।'

'এ নিয়ে পরে ভাবা যাবে,' সিকান্দার বলল। 'আগে ওখানে পৌঁছাই আমরা।'

রানার কণ্ঠস্বর আর হাবভাব অকস্মাৎ ঠাণ্ডা হয়ে গেল। এতটাই, যে সতর্ক উদ্বেগের সঙ্গে বারবার ওর দিকে না তাকিয়ে পারছে না আমিনা। আসলে কল্পনায় দেখতে পাওয়া একটা ছবি ওর ভেতরটা ঠাণ্ডা হিম করে তুলেছে-ট্যাকটিকাল অ্যাটমিক ডিভাইস নিয়ে ঘণ্টায় ত্রিশ নট স্পীডে দ্বীপটার বাঁক ঘুরে ছুটে আসছে একটা কেবিন ক্রুজার, যথেষ্ট দূর থেকেই ছুঁড়ে দিল অ্যাকটিভেট করা খুদে পারমাণবিক মারণাস্ত্র, তারপর দিগন্তরেখা আর রনদিভুর দিকে ছুটল ফুল স্পীডে। ওহ্ গড! ফাঁসাতে পারলে বাংলাদেশ চিরকালের জন্য মুখ থুবড়ে পড়বে।

নিজের অস্থিরতা গোপন রাখবার জন্য বেঞ্চ ছেড়ে সেলুনের দরজায় এসে দাঁড়াল রানা, নিজের অজান্তেই জাহাজের নড়াচড়ার সঙ্গে খাপ খাইয়ে নিতে দিল শরীরটাকে। সূক্ষ্ম মাত্রায় হলেও, আবহাওয়ার পরিবর্তন ঘটছে। গাঢ় জলরাশির পিঠ ভেঙে সাদা ফেনা তৈরি হচ্ছে। তীরে এক গুচ্ছ গ্রামের আলো এঁকেবেঁকে ওপর দিকে উঠে গেছে। দিন এখনও পুরোপুরি বিদায় নেয়নি। আকাশে লেগে থাকা ম্লান লালিমার গায়ে বিধ্বস্ত মন্দিরের স্তম্ভগুলো খুঁজে নেয়া যাচ্ছে-সততা ও নৈতিকতার সঙ্গে নিঃসঙ্গতার একটা প্রতিচ্ছবি রানার ভয়গুলোকে তুচ্ছ করে তুলল। এগুলো যারা তৈরি করেছিলেন তাদের এমনকি এ-ধারণাও ছিল না যে এই ধ্বংসাবশেষ কতদিন তাদেরকে আর তাদের ঈশ্বরদের টিকিয়ে রাখবে, তবে ধারণা থাকলেও এগুলো তাঁরা তৈরি করতেন। এটা আসলে মানুষের কাজঃ যা

করণীয় তা করে যাওয়া।

সিকান্দারেরও সেই মত। 'আমাদের এখন কাজে হাত দেওয়ার সময়। আমি বলি, সাপারটা তাড়াতাড়ি খেয়ে ফেলা উচিত। কারণ বাতাস আর সাগর ফোঁস-ফাঁস করবে বলে মনে হচ্ছে।'

আকাশে চোখ রেখে গজ দুয়েক সামনে বাড়ল সে, পিছু নিয়ে আমিনাও। দু'জনেই কেবিনের মাথার ওপর দিয়ে দিগন্তের দিকে তাকাল।

'কেমন বুঝছেন?' পিছন থেকে জানতে চাইল রানা।

'ঘণ্টা দুয়েকের মধ্যে বাতাসের গতি ফোর্স ফাইভ বা সিক্সে দাঁড়াবে। অ্যাপড্ একটু দুলতে পারে। প্লেট স্থির থাকতে থাকতে খেয়ে নেয়াটাই ভাল মনে করি। তারপর তাড়াতাড়ি শুয়ে ঘুম—মানে, তোমাদের জন্যে আর কি। ডোগো আর আমি সময় ভাগ করে নিয়ে হুইলে থাকব। ছ'টার দিকে ভ্রাকোনিসির কাছাকাছি পৌঁছাব আমরা। কোর্স আর ওয়েদার রিপোর্টের ওপর খেয়াল রাখা হবে। তারপর দেখা যাবে স্টোরে কী আছে।'

ডেকের সরু ফালিতে প্রাইভেসী পেয়ে যেতে ঘুরে রানাকে ধরে প্রায় ঝুলে পড়ল আমিনা। তার ঠোঁটে সামান্য লোনা স্বাদ পাওয়া গেল। চোখ বুজে আরও গভীরভাবে চুমো খেতে, অন্য এক মানুষের কাছে আত্মসমর্পণের পুরানো অনুভূতিটা চিনতে পারল রানা, বরাবরের মত স্থায়ী হওয়ার মায়াময় লোভ দেখাল, যেন পরিপূর্ণ তৃপ্তি ও সার্থকতা অর্জনের কষ্টকর অনুসন্ধানের সমাপ্তি এখনি, এই মুহূর্তে ঘটতে যাচ্ছে। তবে যেহেতু জানে মায়া তো মায়াই, আত্মসমর্পণ প্রত্যাহার হতে বাধ্য, ফলে মুহূর্তগুলো হয়ে উঠল আরও মজাদার, আরও উপভোগ্য।

মায়ার অংশটুকু বিপজ্জনকও বটে। মনের ভেতর ঘণ্টা বেজে উঠে অভিজ্ঞ যোদ্ধাকে স্মরণ করিয়ে দিল কর্তব্য-কর্ম ফেলে রাখা হয়েছে, শত্রু আগমনের সম্ভাব্য পথে কোন পাহারা বসানো হয়নি, ইকুইপমেন্টের গুরুত্বপূর্ণ আইটেমগুলো চেক করা হলেও ডাবল-চেক করা হয়নি। এটা খুবই সম্ভব যে চারপাশের তরল অন্ধকারের কোথাও এই মুহূর্তে শত্রু ওর উদ্দেশে ছুরিতে শান দিচ্ছে।

সে-কথা মনে রেখেই একটা ডিফেন্সিভ প্ল্যান তৈরি করল ওরা তিনজন, প্রয়োজনীয় প্রাথমিক প্রস্তুতিও নিয়ে রাখল। এরপর খাওয়া-দাওয়া। কালো জলপাই, তাজা রুটি, সুস্বাদু টমেটো, টুকরো করে কাটা পিঁয়াজ, ছাগলের দুধ দিয়ে তৈরি পনির, চিকেন সুপ, অসম্ভব মিষ্টি ছোট আকারের দানাবিহীন আঙুর।

রাত দশটার দিকে উঠে দাঁড়াল সিকান্দার, আড়মোড়া ভেঙে বলল, 'গুড নাইট, দু'জনকে। এখানে কয়েক ঘণ্টা ঘুমাব আমি। সকালের আগে আর দেখা হচ্ছে না। তবে যদি ঘুম ভাঙাই, মনে রেখো—শব্দ করবে না, মাথা নামিয়ে রাখবে।'

নিজেদের কেবিনে ফিরে এসে ব্যস্ত হয়ে উঠল ওরা। বাতাস আর ঢেউ পিছন থেকে আঘাত করছে, একটা ছন্দ বজায় রেখে উঁচু আর নিচু হচ্ছে অ্যাপড্।

এক সময় ক্লান্ত হলো ওরা। বালিশে মুখ ঠেকিয়ে, এক হাতে আমিনাকে জড়িয়ে ধরে, গভীর ঘুমে তলিয়ে গেল রানা। কিন্তু ঘুমটা ভাঙল এক পলকে, কাঁধে একটা হাত পড়তে যা দেরি। তরুণ গ্রিকের কণ্ঠস্বর ফিসফিস করল কানে, 'আপনারা আসুন! বোট!'

এগারো

ডেক পুরো অন্ধকারে ঢাকা। শুধু স্টার্নে আলোর খানিকটা আভা দেখা যাচ্ছে, সেদিকে হুইল ধরে দাঁড়িয়ে রয়েছে সিকান্দার। অ্যাপডের চারপাশে কোথাও আর কোন আলোর এতটুকু আভাস পর্যন্ত নেই। মেঘে ঢাকা পড়ে গেছে আকাশটা। চাঁদ-তারার চিহ্ন মাত্র নেই বাতাসের গতি আগের চেয়ে আরও একটু বেড়েছে। বোফর্ট স্কেলের দুই কি তিন। গানল্-এর নিচে মাথা নামিয়ে রেখে, ক্রল করে বোটের পিছন দিকে চলে এলো রানা, ডেক হাউজিং-এর কোণটা ঘুরে।

'নাক বরাবর সামনে,' শান্ত কণ্ঠে বলল সিকান্দার। 'মাস্তুলের কাছাকাছি থেকে ভাল করে তাকান।'

সাবধানে সিধে হলো রানা। চোখ দুটো সরু করে রেখেছে। একটা কাঠামোর ছায়া-ছায়া আকৃতি, স্টারবোর্ডের খুদে সবুজ আলো আর পাইলট-হাউসে সাদাটে আলো জ্বলছে শুধু। পাইলট-হাউসটা বোটের মাঝখানে। ওদের বো-র সামনে প্রায় আড়াআড়ি ভঙ্গিতে ভাসছে, সম্ভবত ছয়শো গজ দূরে। দেখে মনে হচ্ছে সচল নয়। কেবিনের ওপর মাস্তুলের অস্পষ্ট আভাস পাচ্ছে রানা। তারপর পাইলট-হাউসে কারও অস্পষ্ট নড়াচড়া ধরা পড়ল চোখে। ব্যস, দেখবার মত আর কিছু নেই।

'প্যারস-এর দিক থেকে এলো ওরা,' বলল সিকান্দার। 'গতি ছিল বিশ নটের মত। তারপর, আমাদের পোর্ট বো-র দিকে এসে গতি হারিয়ে স্থির হয়ে গেল। হয়তো এঞ্জিনে সমস্যা দেখা দিয়েছে, কিংবা ভান করছে।'

'এঞ্জিনে সমস্যা দেখা দেয়াটা মোটেও স্বাভাবিক নয়,' বলল রানা। 'এ-ধরনের ঘটনা খুব কম ঘটে।'

'তবে এদিকে প্রায়ই ঘটে। কিছু বোট মালিক মেইনটেন্যান্স-এর কথা ভুলে যায়। গ্রিকরা এরকমই, যথেষ্ট খাটতে রাজি নয়। সে যাই হোক, বোটটায় যদি সত্যি সমস্যা দেখা দিয়ে থাকে, লোকগুলো মারাত্মক বিপদে পড়তে যাচ্ছে। আবহাওয়ার মতিগতি বিশেষ সুবিধের মনে হচ্ছে না। স্পীড তুলছি না, একটু রয়ে-সয়েই এগোই।'

দুই বোটের দূরত্ব ধীরে ধীরে কমছে। কেউ কথা বলছে না।

রানা ওর বাম দিকে আরও গাঢ় অন্ধকার দেখতে পেল, ভাবল ওটা নিশ্চয় প্যারস দ্বীপ। স্টার বোর্ড বো-র দিকে অস্পষ্ট একটা আকৃতি, আন্দাজ করল

আইওস দ্বীপ হতে পারে। সরাসরি সামনে, অচল বোটটার পরে, বড়সড় আরেকটা আকৃতি–পুব আকাশে ভোরের প্রথম আলো ফুটতে চাইছে, সেই সঙ্গে স্পষ্ট হতে চাইছে ভ্রাকোনিসি।

মধ্যবর্তী দূরত্ব কমে যখন দুশো গজের মত হয়ে এসেছে, কেবিন-ক্রুজার থেকে অস্পষ্ট হাঁক ভেসে এলো। 'সাবধান!'

'কেন? কী ঘটনা?' পাল্টা চিৎকার করে জিজ্ঞেস করল সিকান্দার, থ্রটল পিছিয়ে আনল তাড়াতাড়ি।

হাঁক-ডাক চলছেই। সিকান্দার ভাষান্তর করছে স্থানীয় সুরে উচ্চারিত দুর্বোধ্য গ্রিক।

কেবিন-ক্রুজারের দুটো এঞ্জিনই ওভারহিটিং-এর ফলে বেঁকে বসেছে। বিশ্বাস্য কিনা সে প্রসঙ্গ আলাদা। বলছে, বোটে এমন কেউ নেই যে এঞ্জিন মেরামত করতে পারবে। ওদের হিসেবে আজ চারদিন ধরে উত্তরে বাতাস বইছে, সূর্য ওঠবার পর সেটার তেজ আরও বাড়বে। সিকান্দার তাদের ওই বক্তব্যের সঙ্গে একমত। এঞ্জিন সত্যি নষ্ট হয়ে থাকলে, ওদেরকে অবশ্যই সাহায্য করা দরকার। তা না হলে ঘণ্টা দুয়েকের মধ্যে রীফ-এ লেগে ভাঙাচোরা কাঠ আর লোহার স্তূপে পরিণত হবে বোটটা। 'আমরা যদি এঞ্জিন মেরামত করে দিতে পারি তো ভাল, তা না হলে অনুরোধ করছে টো করে যেন ভ্রাকোনিসিতে পৌঁছে দিই,' বলল সিকান্দার। 'অন্য কোন বোট এদিকে আসতে পারে, আবার না-ও আসতে পারে। আপনি বলুন, মিস্টার রানা, কী করা উচিত।'

রানা ভাবছে। 'এরকম যে ঘটতে পারে, তা আমরা আগেই আলোচনা করেছি। দেখেই ধরে নিয়েছি বোট ভর্তি শত্রু। কিন্তু সত্যি কথা বলছে, এই ক্ষীণ সম্ভাবনাটাও আমরা অগ্রাহ্য করতে পারি না। আমরা যে উদ্দেশ্যেই সাগরে নেমে থাকি, আমাদেরকে নাবিকই বলতে হবে। আর নাবিকদের কিছু দায়িত্ব অবশ্যই পালন করতে হয়। ওদেরকে বলুন, টো করে নিয়ে যাব আমরা।'

'আমরা তৈরি,' চিৎকার করে সিদ্ধান্তটা জানিয়ে দিল সিকান্দার, তারপর গলা নামাল। 'এই নিন, মিস্টার রানা, আপনার পার্সেল। আল্লাহ ভরসা, আশা করি ঠিকমতই মুড়েছি আমরা।'

বিশ সেকেন্ডের মধ্যে সরু রশিটা কোমরে জড়িয়ে নিল রানা, ওটায় আটকানো রয়েছে প্লাস্টিক মোড়া ছোট একটা প্যাকেট। অ্যাপড্-এর লকারে এটা-সেটা অনেক কিছু আছে, তার মধ্যে এই মুহূর্তে রানার কাজে লাগছে একজোড়া ফ্লিপার আর পানির তলায় মাছ মারবার উপযোগী একটা হান্টিংনাইফ। এ-ধরনের অ্যাডভেঞ্চারে সাধারণত অত্যন্ত দামি ও আধুনিক ডিভাইস ব্যবহার করে ও। আজ ওকে সাহস আর কৌশলের ওপরই নির্ভর করতে হবে বেশি।

রানা তৈরি। হুইলের দিক থেকে ফিরল সিকান্দার, কথা বলল নিচু গলায়। 'এদিক থেকে আমাদের ভয় শুধু গুঁতো খাওয়ার। ওদের আর আমাদের মিলিত স্পীডের কারণে চেষ্টা করলেও এড়াতে পারব না। এবার যান আপনি, সঙ্গে

ওপরঅলা আছেন। গুড লাক, মিস্টার রানা।'

এক সেকেন্ডের জন্য পরস্পরের হাত আঁকড়ে ধরল ওরা। রেইল-এর ওপর দিয়ে একটা পা ঝুলিয়ে দিল রানা, তারপর অদৃশ্য পানিতে নেমে গেল নিঃশব্দে। ঠাণ্ডা লাগলেও, পানি আসলে বছরের এই সময়ে হিমশীতল নয়। আগামী কয়েক মুহূর্ত মারাত্মক কিছুর সামনে ওকে পড়তে হবে না, শুধু পরীক্ষা দিতে হবে অবস্থান আর সময়-বোধের। নিশ্চিত থাকতে হবে ওর আর সন্দেহভাজন শত্রুপক্ষের মাঝখানে সারাক্ষণ যেন অ্যাপডের আকৃতিটা থাকে। এ-কথা কল্পনা করে মনে মনে হাসবার সময় পাওয়া গেল—ধারণাটা হয়তো নেহাতই কমিকতুল্য একটা ভুল, আসলে হয়তো কেবিন-ক্রুজারের লোকগুলো ডাচ ব্যবসায়ী বা সুইডিশ শিক্ষক, ছুটি কাটাতে এসেছে। এইসময় অ্যাপডের এঞ্জিনের রেভ বেড়ে গেল, বো স্টারবোর্ডের দিকে ঘুরে যাচ্ছে, ফলে নিজের পজিশনে ঠিক রাখতে বুক-সাঁতার দিতে হচ্ছে রানাকে।

স্থির একটা বোট থেকে ছুঁড়ে দেয়া লাইন এক হাতে ধরে বেঁধে ফেলা সহজ কাজ নয়। তবু কাজটা সিকান্দারকেই করতে হবে। তিনজনই ওরা একমত হয়েছে, জুলহাস ডোগোকে এর মধ্যে জড়ানো হবে না, কারণ এটা তার কোন ব্যাপার নয়—বিপদ না কাটা পর্যন্ত বোটের নিচে লুকিয়ে থাকবে সে। আর নিজের পোস্ট ছেড়ে আমিনার নড়বার কোন উপায় নেই।

প্রতিটি মুহূর্ত এখন গুরুত্বপূর্ণ। দুটো বোট কাছে চলে আসছে। একটাকে চালিয়ে আনছে এঞ্জিন, আরেকটা স্রোতের টানে ভেসে আসছে। চিৎকার করে দিক নির্দেশনা দেয়া হচ্ছে। অ্যাপডের খোল থেকে সরে এলো রানা, ধীর গতিতে সাঁতার কাটছে বাঁকা একটা রেখা ধরে, তা না হলে কেবিন-ক্রুজারের মাস্তুলের গায়ে সদ্য জ্বলে ওঠা উজ্জ্বল আলো ওর গায়ে এসে লাগবে। তাসত্ত্বেও ওদের কারও চোখে ধরা না পড়বার কোন নিশ্চয়তা নেই। তাই যতক্ষণ সম্ভব পানির নিচে থাকবার চেষ্টা করছে রানা।

সাঁতারটা খুব একটা কঠিন লাগছে না। সঙ্গে বোঝা থাকলেও, ফ্লিপারগুলো সাহায্য করছে ওকে। এক গজ পিছনের পানিতে আলোড়ন থাকছে, আরও পিছনে থাকছে না। মাঝে মধ্যে চওড়া দু'একটা ঢেউ আসছে, দোল খাওয়ার অনুভূতিটা উপভোগ্য হয়ে উঠছে তখন, তবে এগুলো ওকে পিছিয়ে দিচ্ছে না। শ্বাস গ্রহণ আর নিজের পজিশন দেখবার জন্য দশ-বারোবার পানির ওপর মাথা তুলল রানা। অবশেষে ক্রুজারটার সরাসরি পিছনে চলে এলো ও, দূরত্ব মাত্র বিশ ফুট। ওটার খোল গাঢ় ছায়া তৈরি করেছে, সাবধানে ও নিঃশব্দে সেই ছায়ার ভেতর চলে এলো। বোটের মাঝামাঝি জায়গা থেকে পানির দিকে একটা ফেন্ডার ঝুলতে দেখতে পেল। ওটাকে ছাড়িয়ে এলো, সামনে এগোচ্ছে যদি কিছু শোনা বা দেখা যায় এই আশায়।

সিকান্দার টো রোপ বাঁধছে। ক্রুজারের বো-তে দামি সুট পরা চারজন ভদ্রলোক। শ্বেতাঙ্গ কিনা হঠাৎ বোঝা গেল না। আলাপটা এই মাত্র শুরু হয়েছে। প্রত্যাশিত পরবর্তী পদক্ষেপের জন্য অপেক্ষা করছে রানা। একটু পরই ওর অপেক্ষার অবসান ঘটল।

চার ভদ্রলোকের সঙ্গে কোন বিষয়ে একমত হয়েছে সিকান্দার, টো রোপ ধরে আনাড়ি ভঙ্গিতে টানছে। আর দু'এক মিনিটের মধ্যে ক্রুজারটা এত কাছাকাছি চলে আসবে যে প্যাসেঞ্জাররা লাফ দিয়েই অ্যাপডে চলে আসতে পারবে।

কাজ শুরু করবার এখনই সময় রানার।

ফ্লিপার খুলে ফেলে দিল ও, পিছিয়ে ক্রুজারের মাঝামাঝি জায়গায় চলে এলো। ফেন্ডারের রশি ধরে ওপরে উঠে খপ করে ধরে ফেলল রেইল, কোন শব্দ না করে বোটের ডেকে গড়িয়ে দিল শরীরটা। মাথা নিচু করে ডেক হাউসের ছায়ায় পৌঁছাল, কোমরে বাঁধা প্যাকেজের মুখ খুলল দ্রুত। হাঁটুর নিচে স্ট্র্যাপ দিয়ে আটকানো ছুরিটা হাতে চলে এসেছে, চোখ তুলে দৃষ্টি বুলাল ফরওয়ার্ড সেকশনে।

ক্রুজারের একজন লোক অ্যাপডের নাগাল পেয়ে গেছে। তার পিছনের লোকটা ইতস্তত করছে, গভীর মনোযোগের সঙ্গে দেখছে দুই বোটের মাঝখানের ফাঁক কেমন কমে-বাড়ে বাকি দু'জন হিমশিম খাচ্ছে টো-রোপ নিয়ে। তারমানে তাড়াহুড়ো না করলেও চলে। হামাগুড়ি দিয়ে এদিক-সেদিক ঘুরে নিশ্চিত হলো রানা, সব মিলিয়ে সংখ্যায় এরা পাঁচজন। চারজন সামনে, নাবিকের শার্ট আর স্ল্যাকস পরা শেষ লোকটা পাইলট-হাউসে দাঁড়িয়ে ঝুঁকে পড়েছে ইন্সট্রুমেন্ট-প্যানেলে, খুঁটিয়ে লক্ষ করছে সঙ্গীদের প্রতিটি নড়াচড়া। যদি ধরে নেয়া হয় এরা প্রতিপক্ষ, তা হলে এরকম একটা সময় বোটের নিচে কারও না থাকবারই কথা।

পাইলট-হাউসের খোলা দরজার পাশে এসে দাঁড়াল রানা। ছোট্ট আরেকটা ব্যাপার দেখে নিতে হবে, এখনই সময়। ঝুঁকি আছে জেনেই সামনে মুখ বাড়িয়ে উঁকি দিল ও। হ্যাঁ। পাইলটের সিটের পাশে, মেঝেতে, তামার পাত দিয়ে কিনারা মোড়া ট্র্যাপডোর, মাঝখানে গভীর খাঁজে বসানো রিঙ।

মাথা সরিয়ে এনে অপেক্ষায় থাকল রানা। পঞ্চম ব্যক্তির পিঠ থেকে মাত্র দেড় গজ দূরে, হাতে ছুরি নিয়ে।

ইতিমধ্যে সুট পরা চারজন অ্যাপডের আফটার-ডেকে পৌঁছে গেছে। বাকি একজন যেখানে দাঁড়িয়ে আছে সেখান থেকে নড়বে বলে মনে হচ্ছে না। কী নিয়ে যেন একটা তর্ক শুরু হলো। হাত দুটো দু'দিকে মেলে দিয়ে প্রতিবাদ জানাচ্ছে সিকান্দার–নিরীহ মানুষের রেগে ওঠার নিখুঁত ছবি। নিজের নাম উচ্চারিত হতে শুনল রানা। তারপর আমিনার। সবশেষে আসটিনোমিয়া–পুলিস।

সত্যিকার পুলিস হলে প্রকাশ্যে আসত, সার্চলাইট আর লাউডহেইলার ব্যবহার করত, পরনে থাকত ইউনিফর্ম, হাতে বাগিয়ে ধরা অস্ত্র। কী ঘটছে তা প্রায় পরিষ্কার, তবু পুরোপুরি নিশ্চিত হওয়া যাচ্ছে না। অপরপক্ষ নির্ভুলভাবে প্রমাণ করুক তারা পুলিস নয়, তাদের উদ্দেশ্য সৎ নয়।

সিকান্দার এখনও প্রতিবাদ করে যাচ্ছে, ইঙ্গিতে ফেলে আসা পথটা দেখাচ্ছে–সন্দেহ নেই প্ল্যান অনুসারে ব্যাখ্যা করছে সে তার আরোহী

বঙ্গসন্তানটিকে সাউনিয়নের তীরে নামিয়ে দিয়ে এসেছে।

এক লোক এক পা সামনে এগিয়ে সিকান্দারের ট্রাউজার পকেটে টোকা দিল, তারপর হুকুমের সুরে কী যেন বলল। বাকি দু'জন এক লাইনে হেঁটে ঢুকে পড়ল সেলুনে। সার্চ করতে বেশি সময় লাগল না, লোক দু'জন একটু পরই আবার বাইরে বেরিয়ে এলো। দু'জনের একজন ওপর-নিচে মাথা দোলাল—এদিকে এই ভঙ্গির মানে হলো—'না'। আরেকটা হুকুম শোনা গেল। লোক দু'জন এবার সামনের দিকে, রানার দৃষ্টিপথের বাইরে চলে গেল।

অটুট নিস্তব্ধতা, শুধু ক্যাঁচক্যাঁচ করছে ক্রুজারের সুপারস্ট্রাকচার। তারপর এক লোকের সশব্দ হাসি শোনা গেল—টান টান উত্তেজনার মধ্যে বড় বেশি বেমানান। তারপরই থম্পসনের উন্মত্ত ধাতব আওয়াজ শুরু হলো, কানে একঘেয়ে লাগছে, শব্দটা পানির ওপর ছড়াচ্ছে বলে প্রতিধ্বনি নেই।

কে যেন খুব জোরে গুঙিয়ে উঠল। মুহূর্তের জন্য সিকান্দারকে দেখতে পেল রানা, ডেক-হাউসের ছাদ ছুঁতে চাইছে—ওখানে ভাঁজ করা তারপুলিনের নিচে বেরেটাটা লুকানো আছে। রানার কাছাকাছি লোকটা একই সময়ে ব্যস্ত হয়ে উঠল—লাফ দিয়ে পড়ল পাইলটের সিটে, চাপ দিল প্যানেলের একটা বোতামে। সঙ্গে সঙ্গে ডেকের নিচে শক্তিশালী দুটো এঞ্জিন জ্যান্ত হয়ে উঠল।

এতক্ষণে রানার শরীরে বিদ্যুৎ খেলে গেল। সামনে লাফ দিয়ে বাঁ হাত দিয়ে মুখ চেপে ধরল লোকটার, ডান হাতে ধরা ছুরির নগ্ন ফলা বুকে গাঁথল—একবার, দু'বার, তিনবার। প্রতিটি কোপের সঙ্গে তড়পাচ্ছে ধড়, ধরার মত কিছু না পেয়ে হাত দুটো বাতাস খামচাচ্ছে। ভোঁতা একটা গোঙানির শব্দ পেল রানা, দু'গজ দূর থেকে শোনা যাবে না। হায় রে বোকা বেজন্মা, ভাবল ও—আমেরিকানদের সাধা পাঁচ-সাত হাজার মার্কিন ডলারের লোভে অচেনা মানুষের সর্বনাশ করতে এসেছিলি! ছুরির আরেকটা কোপ। ব্যস, শরীরটা নেতিয়ে পড়ল। উষ্ণ রক্ত গড়াচ্ছে রানার বাম আস্তিন থেকে। এক পাশে সরে এলো ও, শরীরটাকে সিট থেকে পড়ে যেতে সাহায্য করল।

অ্যাপড় থেকে চিৎকার আর গর্জন ভেসে আসছে, কিন্তু সেদিকে মনোযোগ দেওয়ার সময় নেই রানার। চট করে সামনেটা একবার দেখে নিল ও। এখানকার শত্রু গানল্-এর পিছনে গুড়ি মেরে বসে আছে, বাড়ানো হাতে পিস্তল, বোঝাই যাচ্ছে সিকান্দারকে গুলি করবার সুযোগ খুঁজছে।

হাঁটু গাড়ল রানা, পথ থেকে নিহত লোকটার পা সরাল, তামার রিঙে আঙুল পেঁচিয়ে ট্র্যাপডোরের ঢাকনি তুলে সরিয়ে রাখল একপাশে। কানে শক্তিশালী মেশিনারির গর্জন আর নাকে এঞ্জিনরূমের গন্ধ ঢুকল। ওখান থেকে দ্রুত দরজার বাইরের ডেকে সরে এলো ও, কোমরে বাঁধা পাউচ থেকে চারটে গ্রেনেড বের করল। প্রতিটিতে হেভী ডিউটি গ্রিজ-এর প্রলেপ দেয়া। রানার প্রতিটি কাজ ক্ষিপ্র। একটা করে গ্রেনেডের সেফটি-পিন খুলছে আর ছুঁড়ে দিচ্ছে হ্যাচওয়ে লক্ষ্য করে। ফায়ারিং পিন রিলিজ করবার সাত সেকেন্ড পর বিস্ফোরণ ঘটবে।

চারটে গ্রেনেডই ছোঁড়া হয়ে গেছে। এখনও কোন বিস্ফোরণ ঘটেনি।

তারপর যখন ঘটল, পায়ের তলায় লাফিয়ে উঠল ডেক। ধাতব পাত

ছিন্নভিন্ন হয়ে উড়ে যাওয়ার শব্দ পাওয়া গেল। হ্যাচওয়ের ওপর ধোঁয়ার কুণ্ডুলী। তারপর একটা পিস্তলের গুলি বাতাসে শিস কেটে রানার মাথা থেকে চার কি পাঁচ ফুট দূর দিয়ে ছুটে গেল। বাজে নিশানা, তবে পরেরটা বাজে না-ও হতে পারে: দেরি না করে রেইলিং টপকে ঝপাৎ করে সাগরে পড়ল রানা। পানিতে কান দুটো ডুবে যাবে, তার ঠিক আগে দ্বিতীয় বিস্ফোরণের আওয়াজটা শুনতে পেল। পানির নিচে, যথেষ্ট গভীরে নেমে এলো ও, একশো পর্যন্ত গোণার পর সারফেস ভেঙে মাথা তুলল।

একবার চোখ বুলিয়েই বুঝতে পারল, ক্রুজারের কোন বাছাধন যদি বেঁচেও থাকে, সাঁতারুকে গুলি করবার আশা নিয়ে রেইলের ধারে দাঁড়িয়ে নেই। এ-ব্যাপারেও কোন সন্দেহ নেই যে ক্রুজারটা আর কখনোই কোন বোটকে গুঁতো মারতে পারবে না। ওটার মধ্যপ্রদেশ দাউ দাউ করে জ্বলছে, তেল-সমৃদ্ধ মোটা শিখাগুলো হেসে যেন গড়িয়ে পড়ছে পরস্পরের গায়ে। তার ওপর শখ চেপেছে বাতাসের, শিখাগুলোকে যেন খেলাচ্ছলে ধাক্কাতে ধাক্কাতে ফরওয়ার্ডে-এ তাড়িয়ে নিয়ে আসছে।

বোটের পিছনে কী যেন বিস্ফোরিত হলো, মাথাচাড়া দিল কমলা শিখা, ভাব দেখে মনে হলো আকাশ ছুঁতে চাইছে। প্রফেশনাল জীবনে এবারই প্রথম নয়, নিজের দ্বারা সংঘটিত ব্যাপক, অপরিমিত ধ্বংস আর হত্যা অসুস্থকর অনুতাপের সৃষ্টি করে রানার অন্তরে। চিন্তাটা মন থেকে মুছে ফেলবার চেষ্টা করল ও। এ-সব ওকে বাধ্য হয়ে করতে হয়, একান্ত প্রয়োজনে, নিজেকে বোঝাল। ওর পেশায় এরই নাম কর্তব্য। ডিউটি।

কিন্তু চিনচিনে একটা ব্যথা কোথায় যেন থেকেই যায়। ওর ভেতরে কে যেন কষ্ট পাচ্ছে। আত্মা?

ভ্রাকোনিসির সামনে আরও খানিক স্বচ্ছ হয়েছে আকাশ। এখনও কোথাও কোন রঙ ফোটেনি, তবে চারদিকে ভোর হওয়ার আয়োজন শুরু হয়ে গেছে। তিনটে সংক্ষিপ্ত আওয়াজ হলো—সাফল্য অর্জনের সংকেত—ভেসে এলো অ্যাপডের হর্ন থেকে। জ্বলন্ত ধ্বংসাবশেষ থেকে ধীর গতিতে সরে যাচ্ছে ওটা সামনের পানিতে লম্বা হয়ে শান্ত অলস ভঙ্গিতে সেদিকে সাঁতরাতে শুরু করল রানা।

ডোগোকে সঙ্গে নিয়ে মূল পাল ছাড়াও আরও দুটো পাল তুলে ফেলল সিকান্দার। ভাল বাতাস থাকায় অ্যাপড় এখন দশ নট গতিতে ছুটছে।

আফটার-ডেকে সুখাসনে বসে রানা, মাঝে মাঝে আমিনার দেয়া ধূমায়িত কফিতে সাবধানে একটা করে চুমুক দিচ্ছে। 'কারও জানা আছে, ক্রুজারের ডেকে দাঁড়ানো লোকটার কি অবস্থা হয়?'

'কি জানি,' বলল সিকান্দার। 'আমাকে একটা গুলি করেছিল—খুব বাজে হাতের টিপ। আমিও পাল্টা গুলি করি—ভয় পেয়ে মাথা নামিয়ে নেয়। তারপরই তো বিস্ফোরণ শুরু হয়ে গেল, তাকে আর দেখতে পেলাম না। ওদের ডিঙ্গি ফরওয়ার্ডে বাঁধা ছিল, কিন্তু ওদিকে সে যায়নি।'

'যেভাবেই হোক অক্কা পেয়েছে,' কণ্ঠস্বরে নির্মম একটা ভাব ফুটল রানার। 'আগুনে পুড়ে, নয়তো পানিতে ডুবে। আমি প্রথম থেকে সবটুকু শুনতে চাই।'

'আরে বাপু, আমি চাষাভুষো মানুষ, আমাকে এত সব কথা জিজ্ঞেস করবার কি মানে, এভাবে শুরু করি আমি। আপনি বোধহয় দূর থেকে এ-সব দেখেও থাকবেন। তারপর একজন আমার কাছে রয়ে গেল, বাকি দু'জন ফরওয়ার্ডে গেল কেবিন-টপে ঘুমিয়ে থাকা আমার মেয়ের কাছে, উদ্দেশ্য ডেঞ্জারাস ক্রিমিন্যাল মাসুদ রানাকে লুকিয়ে রাখা হয়েছে কিনা দেখবে। এরপর···বাকিটুকু নাহয় আমার বেটিই বলুক।'

'আমি সিকান্দার চাচার সঙ্গে একমত—গোটা ব্যাপারটায় ভাগ্যের সহায়তা পেয়েছি আমরা,' বলল আমিনা, ভাঁজ করা হাঁটু বুকের কাছে তুলে রানার পাশে বসে আছে, কাঁধে কাঁধ ঠেকিয়ে। 'ওদের একজনকে আমি চিনতে পারি। প্রথমে গলার আওয়াজ আর কি। তারপরই জাহাজ ঘুরল না কী যেন হলো, একটু আলো পড়তেই দেখতে পেলাম: নাম বব ব্যারন, সিআইএ। তবে ঠিক এজেন্ট নয়। গ্রিক আন্ডারগ্রাউন্ডের লোক—মাফিয়া। বোধহয় শ্বেতাঙ্গ আর আমেরিকান বলেই সিআইএ মাসলম্যান আর ইনফর্মার হিসেবে মাঝেমধ্যে কাজে লাগায়। ব্যারন জানে আমি ইন্ডিয়ান সিক্রেট সার্ভিসে আছি। সিকান্দার চাচা তাঁর মেয়ে বলে পরিচয় দিয়েছে, তাই আমাকে দেখেই গলা ছেড়ে হেসে উঠল সে। তারপর বলল, কিছু প্রশ্ন আছে, আমাকে তার বোটে যেতে হবে, ওখানে নাকি মজাদার আরও অনেক কিছু ঘটবে। আমি তখন জিজ্ঞেস করলাম: শুনতে পেলাম নিজেদেরকে ওরা পুলিস বলছে, তাহলে ওদের সঙ্গে তুমি কেন? বলল, সে ওদেরকে একজন বিদেশী ক্রিমিন্যাল ধরতে সাহায্য করতে এসেছে।

'আমি তখন বললাম, কারও কোন প্রশ্নের জবাব দিতে বা কোথাও যেতে আমার কোন আপত্তি নেই। তবে একটু অপেক্ষা করতে হবে। দেখি একটা চাদর-টাদর পাই কিনা—গাউনের ওপর জড়াব। চাদর একটা পেলাম, সেটা গায়ে জড়িয়ে ভেতরে লুকিয়ে রাখলাম থম্পসনটা। আওয়াজটা তো শুনেছই, কাজেই জানো কিভাবে পটল তুলেছে সে।

'তবে নিচে আরেক লোক নেমেছিল, সে আমাকে ভীষণ ভয় পাইয়ে দেয়, কারণ প্রথম দফায় তাকে আমি গুলি করবার সময় পাইনি। জানা কথা, তার কাছে অস্ত্র থাকবেই। অন্ধকারে পিছন থেকে বেরিয়ে এসে গুলি করতে পারে।' নিজের হাঁটু দুটো আঁকড়ে ধরল আমিনা, তার হাত কাঁপছে।

'এই সময় হাজির হয় আমাদের ডোগো,' ভারী গলায় বলল সিকান্দার। 'বিপদ শুরু হবার আগেই প্রতিবাদ করেছিল সে, এরকম একটা সময়ে শিশুর মত বিছানায় যেতে রাজি নয়। যাই হোক, ধমক খেয়ে লুকিয়ে ছিল ঠিকই, কিন্তু গুলির শব্দ হতে হাতে একটা ছুরি নিয়ে বেরিয়ে আসে। বেরিয়ে আসে ঠিক সময় মত, আমিনা আর দ্বিতীয় লোকটার পিছনে। গুলি করবার জন্যে পিস্তল তুলছে দেখে চার ইঞ্চি শেফিল্ড স্টীল লোকটার বাম শোল্ডার ব্লেডের নিচে ঢুকিয়ে দেয় ডোগো। এরপর লোকটা আর বিপদ থাকে কি করে!

'ডোগোকে আমি জিজ্ঞেস করলাম খানিকটা ব্র্যান্ডি বা উজো দেব কিনা।

বলল, না, এই বয়সে ওসব শুরু না করাই ভাল। পিস্তলধারী এক লোককে ছুরি মারার পর কেউ এ-কথা বলতে পারে, আমার ধারণা ছিল না!' হাসতে শুরু করল সিকান্দার। তারপরই হঠাৎ হাসি থামিয়ে গম্ভীর আর উদাস হয়ে গেল। 'ডোগোর কাছ থেকে আমি একটা আলো পেয়েছি। এটাকে কেউ শিক্ষা বললেও আমি আপত্তি করব না।'

'কি আলো?' আগ্রহী হয়ে উঠল আমিনা।

'ন্যায়যুদ্ধ ব্যাপারটাই একটা নেশা,' বলল সিকান্দার। 'ঝাঁপিয়ে পড়বার জন্যে বা ধকলটা সামলাবার জন্যে মদ বা ড্রাগের কোন প্রয়োজন হয় না।' 'আমি দুনিয়ার অনেক জায়গায় লড়েছি–মদ খাওয়ার কথা মনেই পড়েনি। যুদ্ধ থেকে ইস্তাফা দেয়ার পর বহু বছর আগে ছেড়ে দেয়া অভ্যাসটা আবার ফিরে আসে। ভাবছি আবার ছেড়ে দেব।'

'ডোগো এখন কোথায়?' জানতে চাইল রানা।

'সঙ্গে সঙ্গে কাজ শুরু করে দিয়েছে। এখন বোধহয় ডেক ধুচ্ছে–রক্ত পরিষ্কার করতে প্রচুর সময় লাগে।'

শিউরে উঠল রানা। রোমহর্ষক, আকস্মিক নৃশংসতা নিয়েই ওর কাজ-কারবার, নিরীহ বহিরাগতরাও এর সঙ্গে জড়িয়ে পড়বে–এই ধারণার সঙ্গে নিজেকে মানিয়ে নিয়েছে ও; কিন্তু অপ্রাপ্তবয়স্ক কোন কিশোর সরাসরি খুনের মত একটা ভয়ঙ্কর কাজ করবে, এটা ওর কাছে একদম নতুন। দুনিয়ার সব দেশেই সংখ্যালঘুরা নিরাপত্তাহীনতায় ভোগে। ফলে মারমুখো ভাব তাদের মধ্যে একটু বেশিই দেখা যায়। সকল অর্থে বৈষম্যেরও শিকার তারা, প্রতিবাদের ভাষাও তাই ভায়োলেন্স। রানা শুধু আশা করতে পারে এই নাবালক ছেলেটি যেন ভবিষ্যতে অন্যায় ভাবে কারও রক্ত না ঝরায়। তাড়াতাড়ি প্রসঙ্গ বদলে ও জিজ্ঞেস করল, 'আপনার দিকটায় কি ঘটল, মিস্টার সিকান্দার?'

'না, কই, আমার দিকটায় কিছুই ঘটেনি। আমার প্রতিপক্ষ ছিল স্থানীয় এক গুণ্ডা। দেখা গেল পিস্তলটা বের করবার কাণ্ডজ্ঞান তার আছে, কিন্তু বুঝল না যে থম্পসনের আওয়াজ শুনে আমার ওপর থেকে এক সেকেন্ডের জন্যে দৃষ্টি সরানোটা চরম নির্বুদ্ধিতা হয়ে যাচ্ছে। লাথি ঝেড়ে হাত থেকে প্রায় খসিয়ে দিই পিস্তলটা, তারপর গুলি করি মুখে। পানির মত সহজ–খেলা, একে যুদ্ধ বলে না।'

বোটের মাঝখান থেকে ডোগোর গলা ভেসে এল। ঘাড় ফিরিয়ে তার প্রসারিত আঙুল অনুসরণ করে তাকাল ওরা। কিন্তু কোথাও কিছু চোখে পড়ল না। পানির রঙ ইস্পাতের মত, ছড়াতে শুরু করা ভোরের লালচে আভা হালকাভাবে ছুঁয়ে আছে, ক্রুজারটা যেখানে ছিল সেখানকার সারফেস কোথাও এতটুকু ভাঙা নয়। ক্রুজার নেই।

আইওস দ্বীপটাকে দশ কিলোমিটার দূর থেকে পাশ কাটাবার সময় এক ঝাঁক ফিশিং বোটকে পুবদিক থেকে ফিরতে দেখল ওরা। এটা ওদের ফেরবার সময় নয়, তাই খারাপ কিছু একটা আশঙ্কা করে কয়েকজন জেলের সঙ্গে কথা বলল

সিকান্দার। তাদের কাছ থেকে জানা গেল, তুরস্কের জলসীমার কাছাকাছি মাছ ধরছিল তারা, হঠাৎ মার্কিন নৌ-বাহিনীর একটা এয়ারক্রাফট-ক্যারিয়ার আর তিনটে ডেস্ট্রয়ার থেকে ঝাঁক-ঝাঁক হেলিকপ্টার গানশিপ, ও জেট ফাইটার ছুটে এসে তাড়া করে। ওদের ধারণা, বিনা নোটিশে আমেরিকানরা ওখানে সামরিক মহড়ার আয়োজন করছে।

খবরটা রানাকে চিন্তিত করে তুলল।

***

টপ সিক্রেট-২

প্রথম প্রকাশ: ২০০৩

এক

মনটাকে মাতিয়ে তুলবার মত একটা সকাল খোলা সাগরে বিশৃংখল বাতাস ঢেউগুলোর মাথা স্রেফ ফাটিয়ে দিচ্ছে। কিন্তু ভ্রাকোনিসির দক্ষিণ তীর ছাড়িয়ে ওই একই বাতাসের অন্য এক রূপ সচল পানিতে হালকা পরশ বুলিয়ে সাগরকে করে তুলেছে যেন তরল নীল রঙের দিগন্ত বিস্তৃত একটা পাথুরে আয়না আর ডাঙায়, আইলিট-এর বাড়িটায়, মৃদুমন্দ সমীরণই শুধু অনুভব করা যাচ্ছে: মাঝে মধ্যে অদৃশ্য লাগামে ঢিল পড়লে লিনেন পর্দাগুলোকে ফুলিয়ে দিচ্ছে, উঁচু করে তুলছে জানালার পাশে বসানো লম্বা সুইডিশ ডেস্কের কাগজগুলোর কোণা। পরিবেশ শান্ত ও ঠাণ্ডা। দেহ-মনে ভাল লাগার অনুভূতি জাগছে।

সামনে এক মগ কফি নিয়ে ডেস্কে বসে আছেন মাধব সিন্ধিয়া, ইন্ডিয়ান ইন্টেলিজেন্স "র" (রিসার্চ অ্যান্ড অ্যানালিসিস উইং)-এর অ্যাসিস্ট্যান্ট চীফ। সম্পূর্ণ শান্ত তিনি, চোখ-মুখের কোন পেশিতে এতটুকু টান নেই ভারতের বাইরে এটাই তাঁর প্রথম আন্ডারকাভার অ্যাসাইনমেন্ট। তবে র-র উচ্চপদস্থ কর্মকর্তা হবার কারণে স্বভাবতই ট্রেড ডেলিগেটের ছদ্ম-পরিচয়ে বিভিন্ন বিদেশী রাষ্ট্র সফর করেছেন। কখনও নেতৃত্ব দিয়েছেন কালচারাল মিশনের লিডার হিসেবে। তাছাড়াও, তিন বছর ওয়াশিংটনে ছিলেন ভারতীয় দূতাবাসে সামরিক উপদেষ্টার পদ অলংকৃত করে।

মাথা জোড়া টাক তাঁর, কিন্তু গাল ভর্তি কাঁচা-পাকা দাড়ি। মাথার পিছনে হাত বেঁধে নিস্তরঙ্গ সাগরের বিস্তৃতি দেখছেন। এই কনফারেন্সের জন্যে সিকিউরিটির ব্যবস্থা করা তাঁর মত ব্যাপক অভিজ্ঞতাসমৃদ্ধ একজন মানুষের জন্য খুব সহজ একটা ব্যাপার। আসল সব কাজ কয়েক হপ্তা আগেই হেডকোয়ার্টার দিল্লিতে সারা হয়েছে। ফুলপ্রুফ যে মেশিনারি তিনি তৈরি করেছেন, স্রেফ সেটার অপারেশন দেখবার জন্যই এত দূরের পথ পাড়ি দিয়ে এখানে আসা–নিজের ওপর আস্থা আর তাঁর পেশাদারি বিবেচনাবোধ চুপি চুপি বলছে–নেহাতই ফরমালিটি। সঙ্গে আসা পাঁচ-সাতজন অফিসারের যে-কেউ তাঁর এই দায়িত্ব একই সমান দক্ষতার সঙ্গে পালন করতে পারত। মুশকিল হলো অপারেশনটা র-র, কিন্তু সিদ্ধান্তটা আসছে রাজনীতিকদের তরফ থেকে, যাঁরা এ-সব ব্যাপার একেবারেই বোঝেন না। তাঁদের কাছে পদ, রূপী আর প্রোটোকল বড়; সিনিয়র ডিপ্লোম্যাটরা এলে তাঁদের প্রোটেকশনের জন্য সিনিয়র সিকিউরিটি অফিসারদের উপস্থিতি জরুরী। যেন কনফারেন্সে আসা

ডেলিগেটরা বুঝবে আসামের জঙ্গল থেকে বেরুনো বা মেঘালয়ের পাহাড় থেকে নেমে আসা অফিসারদের সঙ্গে দিল্লি বা কাশ্মীরের অফিসে দায়িত্ব পালনরত কর্মকর্তাদের কতটুকু পার্থক্য।

তবু, তাঁর অভিযোগ করা উচিত নয়। দিল্লি থেকে মাঝেমধ্যে বেরুতে পারাটা ভালই তো—আন্তর্জাতিক পরিস্থিতি সম্পর্কে ওয়াকিফহাল থাকতে চাইলে এ-ধরনের স্বল্পকালীন ভ্রমণ থেকে উপকার পাওয়া যায়। তাছাড়া, এখানকার আবহাওয়া অত্যন্ত স্বাস্থ্যকর। এলাকার লোকজনকে তাঁর অবশ্য বিশেষ সুবিধের মনে হয়নি, আদব-কায়দা জানে না, মন-মানসিকতায় সন্দেহপ্রবণ। তা হোক, ইন্টেলিজেন্স সংক্রান্ত ব্যাপারে ওদের সঙ্গে তাঁর যোগাযোগ খুবই কম। এ প্রসঙ্গে ওদের একজনের কথা বিশেষভাবে মনে পড়ে গেল। কম বয়সী একটা মেয়ে, দেখতে ভারী সুন্দর। পোর্টের ওদিকটায় ঝিনুক বেচে না কী যেন করে। সত্যি, ব্যাপারটা খুব ইন্টারেস্টিং হয়ে উঠছে। জীবন আসলে মেজর জেনারেল মাধব সিন্ধিয়াকে বিমুখ করছে না।

ইউরোপীয় উপকূলের সবচেয়ে নয়ন কাড়া জলরাশির ওপর শারদপ্রাতের সোনালি রোদের খেলা একঘেয়ে লাগতে শুরু করল। একটা দীর্ঘশ্বাস ফেলে সামনে পড়ে থাকা খোলা ফাইলটায় চোখ রাখলেন সিন্ধিয়া। ভাল অভ্যাস অটুট রাখবার জন্যে কাজের প্রতিটি স্তর পার হওয়াটা জরুরী, তা না হলে এই ফাইলটা তিনি খুলতেনই না। তাঁর কটা রঙের বড়-বড় চোখের দৃষ্টি ফাইলের প্রথম পাতায় ঘুরে বেড়াচ্ছে। প্রতিটি আইটেম, প্রতিটি লাইন তাঁর মুখস্থ। পাতার শেষাংশটা এরকম:

চতুর্থ দিন

সময়	ঘটনাপঞ্জী	মন্তব্য
১২০০	সতর্কতার মাত্রা—হলুদ	গোটা বাড়ি কর্ডন
১৬০০	সচিবদের আগমন	সাগরে টহল শুরু
১৭০০	সতর্কতার মাত্রা—লাল	
১৮০০—১৯৩০	মন্ত্রীদের আগমন	পরিচয়-পত্র পরীক্ষা
২০০০	স্বাগতভাষণ, টোস্ট	কর্ডন চেক
২০৩০	অধিবেশন শুরু	পালা করে কর্মীদের খেতে পাঠানো
২৩৩০	ডিনার	

০০৩০	অধিবেশন শুরু	
০৩০০	বিরতি, বিশ্রাম, আপ্যায়ন	কর্ডন চেক
০৪০০	অধিবেশন শুরু	
০৫৩০–০৬০০	ধন্যবাদ জ্ঞাপন, মন্ত্রীদের বিদায়	
০৬৩০	সতর্কতার মাত্রা–হলুদ	সাগর থেকে টহল প্রত্যাহার
১২০০	সচিবদের বিদায় সতর্কতার মাত্রা–নীল	রেডিও যোগাযোগ বিচ্ছিন্ন
১৭০০	কর্মীদের প্রস্থান	

জেনারেল সিন্ধিয়া নিজে অবশ্য নিজের স্টাফ বা কর্মীদের সঙ্গে বিদায় নেবেন না। দশদিনের ছুটি পাওনা হয়েছে তাঁর। বলা হয়েছে এর মধ্যে থেকে যে-ক'টা দিন যেখানে খুশি কাটাতে পারবেন। এখন তাঁর মনে হচ্ছে ছুটি কাটাবার জন্যে এই জায়গাটা নেহায়েত মন্দ নয়। বিশেষ করে বোকা-বোকা উজ্জ্বল হাসি নিয়ে সেই কম বয়েসী মেয়েটা যদি তাঁর কাজ-টাজ করে দেয়, সময় বেশ ভালই কাটবে।

দরজায় নক হতে সংবিৎ ফিরে এল তাঁর। 'কৌন হো?' বিরক্ত হয়ে মাতৃভাষায় জানতে চাইলেন।

যে দু'জন লোক এ-বাড়িতে প্রথম এসেছে, তাদের একজন ভেতরে ঢুকে ভারতীয় উচ্চারণে ইংরেজিতে বলল, 'গুড মর্নিং, জেনারেল, সার।'

'গুড মর্নিং, সঞ্জীব। বসো।' বিরক্তির লাগাম দ্রুত টেনে হাসিখুশি অমায়িক হয়ে উঠলেন জেনারেল সিন্ধিয়া। তাঁর একটা অভ্যাস হলো, প্রকাশ্যে কারও বিরোধিতা না করা; এমনকি সঞ্জীব শেঠির মত গর্দভেরও নয়–যে কিনা কাশ্মীরে তিন-তিনটে বছর দায়িত্ব পালন করে একজন পাকিস্তানী অনুপ্রবেশকারীকেও ধরতে পারেনি।

খালি ফায়ারপ্লেসের পাশে একটা টুলে বসল সঞ্জীব। 'রিপোর্ট করবার মত ঘটনা মাত্র একটাই, সার। আজ ভোর পাঁচটার দিকে সাগরে আগুন দেখা গেছে। হারবারের এক লোক জানিয়েছে আমাকে। দুটো বোট ইনভেস্টিগেট করতে যায়

এলাকায় তল্লাশী চালায় তারা। কিন্তু বোটটা তার আগেই ডুবে গেছে। পানি থেকে একজন সারভাইভারকে তোলা হয়, মারাত্মক ভাবে পুড়ে গেছে। পোর্টের ওদিকটায় ছোট্ট একটা হসপিটাল মত আছে, সেখানে নিয়ে যাওয়া হয়েছে তাকে। তার কাছ থেকে জানা গেছে, আগুনটা ইঞ্জিন রূম থেকে ছড়ায়।'

'খুবই দুঃখজনক, সঞ্জীব'। তবে এটা আমাদের কোন ব্যাপার নয়। এক গ্রিক গর্দভ পেট্রল ভর্তি টিনে সিগারেটের টুকরো ফেলে নিজের বোট জ্বালিয়ে দিয়েছে। এ-সব অপ্রাসঙ্গিক বিষয় নিয়ে মাথা ঘামিয়ো না। আর কিছু?'

'নির্দিষ্ট সময়ে এথেন্স ফ্রিকোয়েন্সিতে কান পাতছে যাদব। নো ট্র্যান্সমিশন, সার।'

'গুড। দেখো তো কী হচ্ছে।'

বাইরের টেরেসে চাপা ফিসফাস আর নড়াচড়ার আওয়াজ পাওয়া যাচ্ছে। তারপর গ্রিক ভাষায় এক লোক চেঁচিয়ে উঠল। সঞ্জীব শেঠি দরজার দিকে এগোল। কবাট খুলতেই তীব্র রোদ আর গরম বাতাস ঢুকল ছায়া ভরা ঘরে। প্রথমে কিছুই সে দেখতে পেল না। তবে দু'মিনিট পর যখন ফিরে এল, রীতিমত উত্তেজিত দেখাল তাকে। 'নৌকা, সার। বৈঠা চালাচ্ছে একটা মেয়ে আর একটা ছেলে—ছেলেটার বয়স ষোলোও হবে কি না সন্দেহ। আমাদের অ্যাঙ্কারিজের দিকে আসছে, সার।'

আইলিটে আসবার পর থেকে এ-ধরনের পরিস্থিতির উদ্ভব হয়েছে কম করেও দশ কি বারোবার—নানা জাতের ট্যুরিস্ট এসে জানতে চায় বাড়িটা ভাড়া পাওয়া যাবে কি না। দ্বীপটা থেকে আসে ব্যবসায়ীর ছদ্মবেশে কাস্টমসের চর। এদেরকে সামলানোর জন্যে তাঁর দলের এক গ্রিককে দায়িত্ব দেয়া হয়েছে। এর আগে জেনারেল সিন্ধিয়া এ-সব নিয়ে মাথা ঘামাননি, তবে এই মুহূর্তে চেয়ার ছেড়ে দাঁড়িয়ে পড়লেন। মেয়ের কথা শুনে আগ্রহ জাগায় ব্যাপারটা কী দেখতে চাইছেন। সবুজ আর আসমানী রঙের শার্টটা ঠিকঠাক করে নিয়ে ধীর পায়ে টেরেসে বেরিয়ে এলেন তিনি।

রোদের গরম আঁচ লাগল মুখে, পানিতে তার প্রতিফলন চোখ ধাঁধিয়ে দিল। হাত তুলে চোখে ছায়া ফেললেন, দেখলেন একশো গজ দূরে সাদা রঙ করা একটা ডিঙ্গি সোজা এইদিকেই আসছে। সিনিয়র গ্রিক চাকুরে, হাতে বিনকিউলার, জেনারেলের কাছ থেকে নির্দেশ চাইল। কয়েক মুহূর্ত পর ইংরেজিতে তিনি বললেন, 'কি চায় জিজ্ঞেস করেছেন?'

'জ্বী, অবশ্যই, জেনারেল। কিন্তু জবাব দিচ্ছে না।'

'আবার চেষ্টা করুন। পরিচয় জিজ্ঞেস করুন। বলুন, এটা একটা প্রাইভেট বাড়ি।'

নির্দেশ পালিত হলো। এবার মেয়েটার তরফ থেকে সাড়া পাওয়া গেল। জেনারেল সিন্ধিয়ার কাছে ভাষা হিসেবে গ্রিক বিষম সমস্যা, বিন্দু-বিসর্গ কিছুই বোঝেন না। কিন্তু তারপরও ওই দুর্বোধ্য শব্দজটের ভেতর থেকে একটা শব্দ তাঁর কানে খুব তীক্ষ্ণভাবেই বাজল।

'জেনারেল, সার, মেয়েটা বলছে সে ভগৎসিং আচারিয়ার একজন সহকর্মী। বলছে, এই বাড়ির ভদ্রলোকের সঙ্গে তার জরুরী আলাপ আছে—প্লিজ।'

নিচের ঠোঁট দু'আঙুলে ধরে রাবারের মত টেনে লম্বা করছেন জেনারেল সিন্ধিয়া। ঘটনাটা স্বাভাবিক নয়, অথচ উপলব্ধি করছেন মেয়েটাকে ভাগিয়ে দেয়াটা বড় ধরনের বোকামি হয়ে যেতে পারে। তবে সতর্ক হবার প্রয়োজনীয়তা অগ্রাহ্য করছেন না। 'ওদেরকে বলো, ভগৎসিং আচারিয়া নামে কাউকে আমরা চিনি না, তবে আলাপ করবার জন্যে এসকর্টকে নিয়ে মেয়েটা তীরে ভিড়তে পারে।'

দুমিনিট পর দু'কোমরে হাত রেখে বাঁধের ওপর দাঁড়িয়ে থাকতে দেখা গেল জেনারেল সিন্ধিয়াকে, আগন্তুকদের নামতে দেখছেন নৌকা থেকে। মেয়েটাকে গ্রিক বা আলবেনিয়ান বলে মনে হলো তাঁর, কিছুই ওর অসুন্দর নয়—বুক আর নিতম্ব একটু বেশি ভারী, যেমনটি তিনি পছন্দ করেন। আড়চোখে ছেলেটাকে দেখলেন। বয়সের তুলনায় স্বাস্থ্য ভাল, পেশীগুলো দেখবার মত, রঙটাও রোদে পোড়া তামাটে। জেনারেল অপেক্ষা করছেন; প্রথমে প্রতিপক্ষকে কথা বলতে দেন তিনি সবসময়।

মেয়েটা তাঁর সামনে বেশ সহজ ভঙ্গিতে দাঁড়াল। 'আপনি গ্রিক জানেন?'

'না।'

'আমার নাম আমিনা আথিয়ানা,' ইংরেজিতেই বলে যাচ্ছে আমিনা। 'এথেন্সে আমি ভগৎসিং আচারিয়ার একজন সহকর্মী। এখানে যিনি চার্জে আছেন তাঁর জন্যে আর্জেন্ট একটা মেসেজ আছে আমার কাছে।'

'চার্জ বলতে কী বোঝাতে চাও জানি না। তবে এই বাড়িটা আমার নামে ভাড়া নেয়া হয়েছে। এক মিনিট,' বলে আগন্তুকদের রোদে দাঁড় করিয়ে রেখে বাঁধ থেকে টেরেসে, টেরেস থেকে কামরার ভেতর ফিরে এলেন জেনারেল। ডেস্কের দেরাজ খুলে একটা ফাইল বের করলেন, ভেতরে ফটোস্ট্যাট করা অসংখ্য আইডেনটিটি ডকুমেন্ট আর ডোশিয়ে রয়েছে। আমিনা। এই তো পাওয়া গেছে! ফটোয় চুল একটু লম্বা লাগছে, তবে বাকি সব ঠিক আছে। ফাইল বন্ধ করে দোরগোড়ায় এসে দাঁড়ালেন। 'উঠে এসো। দু'জনেই।' টেরেসে উঠে আমিনা আর ডোগো তাঁর সামনে এসে দাঁড়াল। 'তোমার কাগজ-পত্র দেখলাম। সব ঠিক আছে, আমিনা। তুমি ভেতরে ঢুকতে পারো।' এরপর ছেলেটার পা থেকে মাথা পর্যন্ত চোখ বুলালেন। 'প্লিজ, তোমার ইয়ং ফ্রেন্ডকে জিজ্ঞেস করো কিচেনে বসে ঠাণ্ডা কিছু খাবে কি না।'

আমিনা প্রশ্ন করছে, কিন্তু ডোগো তাকিয়ে আছে জেনারেলের দিকে। তার অপলক দৃষ্টি যেন বলতে চাইছে জেনারেলের চিন্তা-ভাবনা তার বোঝা হয়ে গেছে, ফলে ঘৃণায় বমি পাচ্ছে তার। আমিনার উদ্দেশে একটা মাত্র শব্দ উচ্চারণ করে ঘুরল সে, তারপর চলে গেল।

একটা ঢোক গিলে নীরবে অপমানটা হজম করলেন জেনারেল। অনেক কষ্টে আমিনার দিকে ফিরে জোর করে হাসলেন, পরিচয় দিলেন নিজের, বললেন,

'এসো, আমরা ঠাণ্ডায় বসি, কেমন?'

আধঘণ্টা আগের সুখানুভূতি হারিয়ে জেনারেল সিন্ধিয়া এখন অশান্তিতে ভুগছেন। সব দিক বিবেচনায় রেখে বিচার করলে, গোটা ভারতীয় সিকিউরিটিতে তিনিই সম্ভবত একমাত্র কর্মকর্তা যিনি নিজের ধ্যান-ধারণা থেকে একচুল নড়বেন না: আমিনা কেন, কারও বক্তব্যের যথাবিহিত গুরুত্ব দেবেন না। তাসত্ত্বেও একবারও বাধা না দিয়ে তার বক্তব্য ধৈর্যসহকারে শুনে গেলেন।

আমিনার কথা শেষ হতে নিজের রিভলভিং চেয়ারটায় বসে কিছুক্ষণ চুপ করে থাকলেন, হাত দুটো মাথার পিছনে বাঁধা। তারপর চেয়ারটা ডেস্কের দিকে ঘুরিয়ে পারসোনেল ফাইলটা আবার খুললেন। অবশেষে যখন মুখ খুললেন, তাকিয়ে থাকলেন জানালা দিয়ে বাইরে। 'তোমাকে রিক্রুট করেছে আমাদের সিক্রেট সার্ভিস—আইএসএস।'

'জ্বী।'

'কেন? তোমার মত একটা মুসলমান মেয়ে এই এলাকায় হিন্দুস্থানের কী স্বার্থ উদ্ধার করতে পারবে? এই দেশে জন্মেছ, তোমার গ্রিক ইন্টেলিজেন্সে যোগ দেয়া উচিত ছিল না?'

'ছিল, সার। মুসলমান, অর্থাৎ এ-দেশে সংখ্যালঘু হলেও, আমি আমার দেশকে ভালবাসি। কিন্তু এ-দেশের সরকার মুসলমানদের সঙ্গে বিমাতাসুলভ আচরণ করে। সবাই জানে, সারা দুনিয়াতেই সংখ্যালঘুরা বৈষম্য আর নির্যাতনের শিকার।'

'তোমার মুখ থেকে আমি রাজনৈতিক বক্তৃতা শুনতে চাইনি,' বললেন জেনারেল সিন্ধিয়া। 'তুমি আইএসএস-এ ঢুকলে কীভাবে তাই বলো।'

'ভার্সিটি থেকে বেরিয়ে চাকরি খুঁজছি, বাবার এক ভারতীয় বন্ধুর সঙ্গে এথেন্সে দেখা হয়ে গেল। তিনি তখন এথেন্সে আইএসএস-এর দু'নম্বর ব্যক্তি। তিনিই আমাকে চাকরিটা অফার করেন।'

'হুম।' এখনও জানালা দিয়ে বাইরে তাকিয়ে আছেন জেনারেল সিন্ধিয়া। 'কিছু মনে কোরো না, কর্তব্য আর দায়িত্বের অংশ হিসেবেই প্রশ্নটা করতে হচ্ছে। শেষ পর্যন্ত তুমি তাহলে বাবার বন্ধুর সঙ্গে বিছানায় উঠতে বাধ্য হলে?'

'তিনি দেবতুল্য ব্যক্তি, আমার এই ধারণা আজও অটুট আছে।'

চেয়ারে বসবার পর এই প্রথম আমিনার দিকে তাকালেন জেনারেল। 'হিন্দু দেবতাদের কথা বলছ তো? ওঁদের লীলাখেলা সম্পর্কে তুমি কিছু না জানতে পারো, কিন্তু আমরা ভারতীয়রা জানি।'

'আমার ভুল হয়েছে,' ম্লান গলায় বলল আমিনা। 'তাঁকে আমার বলা উচিত ছিল দরবেশতুল্য।'

'তার নাম কী?'

'প্লিজ, জেনারেল, সেটা জানা কি খুব জরুরী?'

'হ্যাঁ, ভীষণ জরুরী।' এখন আবার জানালা দিয়ে বাইরে তাকিয়ে আছেন র-র অ্যাসিস্ট্যান্ট চীফ।

'তথ্যটা যদি আপনার ফাইলে না থেকে থাকে,' শান্তকণ্ঠে, সবিনয়ে বলল আমিনা, 'ধরে নিতে হবে ইন্ডিয়ান সিক্রেট সার্ভিস চায় না আপনি জানুন—অন্তত আমি তাই বুঝব।'

'তোমাকে একটু পরীক্ষা করলাম। কাউন্টার এসপিওনাজে প্রচুর কাজ করেছ মনে হচ্ছে?'

'খুব বেশি নয়। আমাকে দিয়ে সাধারণত ছোটখাট কাজই করানো হয়'

'এই যেমন কাউকে ফাঁদে ফেলা? টোপ-এর ভূমিকায়?'

মাথা নাড়ল আমিনা। 'আমাকে কেউ কখনও বেশ্যা হতে বলেনি, জেনারেল।'

'তুমি দেখছি একটু বেশি স্পষ্টবাদী।'

'জেনারেল সিন্ধিয়া, আপনি অযথা নিজের অমূল্য সময় নষ্ট করছেন,' আমিনা বিরক্ত হচ্ছে না বা রাগছেও না 'আমি ভারতের হয়ে কেন কাজ করি, এরচেয়ে অনেক গুরুত্বপূর্ণ বিষয়ে আলাপ করবার জন্যে এখানে এসেছিলাম। আপনার দেশ মারাত্মক একটা সংকটে পড়তে যাচ্ছে। কোথায় আপনি আমাকে নির্দেশ দেবেন, তা না

নাকের ফুটো কুঁচকে কিসের যেন গন্ধ শুঁকলেন জেনারেল সিন্ধিয়া। 'তোমাদের মত রোমান্টিক ফুলরাই মনে করে নির্দেশ পাওয়া কতই না সহজ এসো, আগে বিবেচনা করি আমাকে কী বলেছ তুমি। মানে, ওই কাহিনীটা, যাতে মেজর ভগৎসিং আচারিয়া আর তার দুই সহকারী খুন হলো খুনীদের পরিচয় জানা গেছে?'

'কথাটা আপনাকে আমি বলতে ভুলে গেছি। মিস্টার রানা যে লোকটাকে গুলি করেন, তাকে চিনতে পেরেছেন। ওঁর বসকে যে গ্রুপটা ইংল্যান্ডে কিডন্যাপ করে, এই লোক তাদের সঙ্গে ছিল।'

'এই কিডন্যাপিংটা আমার মনে খুব আগ্রহ জাগাচ্ছে। এর মধ্যে ফ্যান্টাসি-ফ্যান্টাসি একটা ভাব আছে। তবে এ-ও আমরা জানি বটে যে ফ্যানট্যাসটিক ঘটনা আবার ঘটেও। তবে দুঃখজনক বিষয় হলো এই ঘটনাটা সত্যি ঘটেছে কি না নিশ্চিতভাবে জানার কোন উপায় নেই। তারপর ধরো বোটে খুন-খারাবির কাহিনীটা। তুমি নিজে বব ব্যারন নামে মার্কিন লোকটাকে চিনতে পেরেছ মার্কিনিরা সন্ত্রাসের বিরুদ্ধে একটা ন্যায্য যুদ্ধ করছে, তবে তাদের মধ্যে কেউ-কেউ ডালকুত্তা, তোমার ভাষায় ক্রিমিন্যাল। হ্যাঁ, এখানটায় এসে সত্যের একটু গন্ধ যেন পাওয়া যাচ্ছে। তবে তাকে আমি সিআইএ-র লোক বলে মানতে রাজি নই। যে লোকটা বেঁচে গেছে তাকে ইন্টারোগেট করাটা ইন্টারেস্টিং হবে।'

'কেউ সত্যি বেঁচেছে?' জিজ্ঞেস করল আমিনা, চেয়ার ছেড়ে দাঁড়িয়ে পড়ল।

'এক্ষেত্রে বেঁচে থাকাটা শুধুই নরকযন্ত্রণা ভোগ করবার জন্যে। এখন হাসপাতালে তার চিকিৎসা চলছে। আমি তদন্তের ব্যবস্থা করছি।' জেনারেল সিন্ধিয়া উপলব্ধি করলেন, আমিনা না এলে সাগরে লাগা আগুনটাকে তিনি গুরুত্বের সঙ্গে নিতেন না। এই উপলব্ধি তাঁর অস্বস্তি আর অশান্তি আরও বাড়িয়ে দিল

'আপনি তাহলে আমাকে কোনও নির্দেশ দেবেন না?' জানতে চাইল আমিনা, খুব অসহায় ভঙ্গি। আবার ধপ করে বসে পড়ল চেয়ারে।

'তোমার গল্পে ফ্যান্টাসির উপাদান আরও আছে। যেমন– নিশ্চয় মাসুদ রানাই ঢুকিয়েছে তোমার মাথায়–মার্কিন সরকার নাকি আমাদের বিরুদ্ধে ষড়যন্ত্র করছে। তাদের সামরিক মহড়ার আসল উদ্দেশ্য কনফারেন্স উড়িয়ে দেয়া। তুমি আর মাসুদ রানা মুসলমান, তালেবান আর আল কায়েদা হলো ধর্মীয় ড্রাগ, ওই ড্রাগ গিলে দুজনেই একেবারে ফ্যানাটিক হয়ে উঠেছ–চারদিকে শুধু মুসলমানের শত্রু আমেরিকা আর ব্রিটেনকে দেখতে পাচ্ছ…

'কিন্তু জেনারেল, গোটা দুনিয়া, এমন কি ভারতও ওদের ইরাক আক্রমণ সমর্থন করেনি।' আমিনার মধ্যে প্রতিবাদে মুখর হয়ে উঠবার কোন লক্ষণ নেই, বড়জোর খানিকটা বিস্মিত দেখাচ্ছে তাকে।

'দুনিয়া ভুল করছে, ভারত ভুল করছে,' অত্যন্ত জোর দিয়ে বললেন জেনারেল সিন্ধিয়া। 'ইসলামী মৌলবাদীরা দুনিয়াটাকে একটা অরাজক অবস্থার দিকে ঠেলে দিতে চাইছে, আমেরিকা আর তার মিত্রদের ছাড়া আর কার ক্ষমতা আছে এই সর্বনাশ ঠেকাবে? ভারত, মালয়েশিয়া, চীন, বার্মা, নেপাল, শ্রীলঙ্কা–কাল রাতে কনফারেন্সে যে-সব দেশ অংশ নিচ্ছে সে-সব দেশ ইসলামী মৌলবাদীদের প্রশ্রয় দেয় না। তাহলে কী কারণে এটা বানচাল করতে চাইবে সিআইএ? প্রেসিডেন্ট বুশ লোকটা কি গুণ্ডা?

'মাই ডিয়ার ইয়াং লেডি, আমিনা আথিয়ানা,'–জোর করে আরেকটু হাসতে চেষ্টা করলেন জেনারেল–'গোটা ব্যাপারটার পিছনে দায়ী হলো ওই লোকটা, মাসুদ রানা। তার কীর্তিকলাপ সম্পর্কে খুব ভালভাবেই আমি ওয়াকিফহাল। তুমি যে-হিন্দুস্থানের পক্ষে স্পাই হয়ে কাজ করছ, এই তো মাত্র মাস কয়েক আগে সেই হিন্দুস্থানের মুখের গ্রাস কেড়ে নিয়ে গেছে। সে…'

'জ্বী!' যেন আকাশ থেকে পড়তে যাচ্ছে আমিনা।

'তবে আর বলছি কী! প্রফেসর মইনুল হাসান নামে এক বিজ্ঞানী, বৃহৎ ভারতবর্ষেই তাঁর জন্ম, চেন্নাই বা মুম্বাইয়ে বসে গবেষণা করবেন বলে সিদ্ধান্ত নিয়েছিলেন, কিন্তু এই মেজর রানা নোংরা কৌশল খাটিয়ে তাঁকে নিয়ে চলে গেল ঢাকায়।* এরও অনেক আগে থেকেই ওর ওপর বিরক্ত আমি। তার সম্পর্কে তুমি তো আসলে কিছুই জানো না। রানা হলো অত্যন্ত বিপজ্জনক এক আন্তর্জাতিক গ্যাংস্টার। কিডন্যাপিং আর ষড়যন্ত্রকারী মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র, এই গল্প শুনিয়ে নিজের কুমতলবে সাহায্য পাবার আশায় তোমার মত সরল একটা মেয়েকে কেমন জড়িয়ে নিয়েছে।'

উদ্বিগ্ন আমিনা জেনারেলের দিকে প্রায় দশ সেকেন্ড হাঁ করে তাকিয়ে থাকল। তারপর নিজেকে সামলে নিয়ে জিজ্ঞেস করল, 'আপনাকে একটা প্রশ্ন করতে পারি, জেনারেল সিন্ধিয়া?' কণ্ঠস্বরই বলে দিচ্ছে, জেনারেলের প্রতি

---

* দেশপ্রেম, মাসুদ রানা ৩০৯ দ্রষ্টব্য

তার শ্রদ্ধা কয়েকগুণ বেড়ে গেছে।

'সংক্ষেপে।'

'মেজর ভগৎ সিং আচারিয়া আর তাঁর দুই সহকারী খুন হবার সঙ্গে এই থিওরিটার কোন মিল আছে কি না বলতে পারেন?'

'থিওরি? কোন্ থিওরি?'

'যিনি খুন হয়েছেন, অর্থাৎ, মিস্টার আচারিয়ারই থিওরি এটা। খুন হবার আগে তিনি নিশ্চিতভাবে বিশ্বাস করতেন যে আমাদের অর্গানাইজেশনে অবশ্যই একজন বেঈমান আছে। আপনি কি তার এই থিওরির সঙ্গে একমত, জেনারেল?'

'প্রশ্ন এখানে দুটো। ঠিক আছে, এসো পরীক্ষা করি। আচারিয়া আর তার সহকারীরা খুন হবার কারণ হলো, বিরোধী পক্ষ রানাকে ধরতে চাইছিল, কিন্তু তাদের আর রানার মাঝখানে চলে আসে ওরা। অত্যন্ত বেদনাদায়ক, কিন্তু রহস্যময় নয়। আর দলে বেঈমান আছে বলে আচারিয়ার যে সন্দেহ…এবার তাহলে কিছু তিক্ত কথা বলতে হয়।' মাথা নিচু করে আয়নার মত চকচকে জুতো জোড়ার দিকে কয়েক মুহূর্ত নিঃশব্দে তাকিয়ে থাকলেন জেনারেল। 'মেজর আচারিয়াকে আমি চিনতাম। মানুষ হিসেবে সে মন্দ ছিল না। কিন্তু তার যোগ্যতা সম্পর্কে আমার সন্দেহ আছে। বদলির সময় অনেক আগে পার হয়ে যাওয়া সত্ত্বেও এখান থেকে তাকে সরানো হয়নি। তুমিও বলেছ, সিকিউরিটিতে পরিষ্কার ক্রটি ধরা পড়েছে। অর্থাৎ কোথাও একটা ফুটো আছে। আচারিয়া ভুল করেছিল, কিন্তু বুঝতে পারেনি কীভাবে বা কোথায়। নিজের সমস্ত ভুলক্রটি কাল্পনিক একজন বেঈমানের ঘাড়ে চাপিয়ে দেয়ার চেয়ে স্বাভাবিক ঘটনা আর কী হতে পারে?'

'আপনি ব্যাখ্যা করায় সব এখন আমার কাছে পরিষ্কার হয়ে গেল, জেনারেল। তবে আপনার কাছে আরও একটা ঘটনার ব্যাখ্যা পাব বলে আশা করি আমি।'

'ইয়েস?'

'কোন বেঈমান যদি না-ই থেকে থাকে, তাহলে এথেন্সে আমাদের দূতাবাসের মাধ্যমে আমার পাঠানো মেসেজটা আপনার কাছে পৌঁছায়নি কেন?'

জেনারেল সিন্ধিয়া একটা দীর্ঘশ্বাস ফেললেন। 'তুমি বলেছ, ওখানে কার সঙ্গে কথা বলেছ জানো না। নিশ্চয়ই জুনিয়র কোনও ক্লার্ক হবে, স্থানীয়। তোমার সযত্নে তৈরি মেসেজের গুরুত্বই সে বুঝতে পারেনি–লাঞ্চ খেতে গিয়ে সব বেমালুম ভুলে বসেছে। কি, আমার এই ব্যাখ্যাও সন্তোষজনক নয়? এরকম আরও পাঁচ-সাতটা ব্যাখ্যা আমার কাছে জমা হয়ে আছে।'

'এখন তাহলে, জেনারেল…'

'শোনো, আমি তোমাকে আমাদের অ্যাকশনের ছকটা বলে দিচ্ছি। প্রথম কথা, ওই মাসুদ রানাকে আমি এখানে চাই। আমাদের এই কনফারেন্সকে নিয়ে সে যে বড় ধরনের কোন ষড়যন্ত্র করছে, এ-ব্যাপারে কারও মনে কোন সন্দেহ থাকা উচিত নয়। আমি ব্যক্তিগতভাবে মনে করি–জানি–শুধু হিন্দুস্থানের জন্যেই

নয়, গোটা বিশ্বের জন্যে এই রানা লোকটা প্রায় একটা অভিশাপ। তবে এক্ষেত্রে একজন মৌলবাদী বুড়ো ধর্মযোদ্ধা আর পুঁচকে এক ছোকরার সাহায্য নিয়ে ঘোড়ার একটা ডিমও অর্জন করতে পারবে না সে। আমরা ইউনিফর্ম পরে নেই তো কী হয়েছে, এখানে এত বেশি অস্ত্র আমদানি করেছি যে একঝাঁক হেলিকপ্টার গানশিপ, যুদ্ধজাহাজ, জেট ফাইটারকেও ভাগিয়ে দিতে পারব। এ-কথা জোর দিয়ে বলতে পারি, কোনও দিকেই অবহেলা করা হয়নি।' জেনারেল ঠোঁট সরু করে একটু হাসলেন। 'তবে মাসুদ রানা ঝামেলা বাধাতে পারে। আমাদের ডেলিগেটরা চলে না যাওয়া পর্যন্ত তাকে দূরে সরিয়ে রাখতে হবে।'

'আমাকে কিছু করতে হবে, জেনারেল, সার?'

'কিছু মানে? তোমাকেই তো সব করতে হবে।'

একটা ঢোক গিলল আমিনা। 'জ্বী। বলুন।'

'আমি ধরে নিচ্ছি রানার সঙ্গে শুচ্ছ তুমি?' জিজ্ঞেস করলেন জেনারেল, কণ্ঠস্বর থেকে সমস্ত তিক্ততা ও ঘৃণা লুকিয়ে রাখবার চেষ্টা করে শতকরা প্রায় নব্বুই ভাগ সফল হলেন।

মাথা নত করল আমিনা।

'সত্যি কথা বলতে লজ্জা কী!' তাগাদা দিলেন জেনারেল। 'মনে রেখো, আমি আমার দেশের সেবা করছি, আর তুমি পাচ্ছ বেতন–দু'জনেই আমরা একদল গুরুত্বপূর্ণ ব্যক্তির নিরাপত্তা নিশ্চিত করার দায়িত্ব পালন করছি। বলো, তুমি কী তার সঙ্গে...'

'জ্বী।' আমিনা মাথা তুলছে না। 'সে আমাকে ছাড়ে না।'

'অল্প কথায় ব্যাখ্যা করো তার ওপর তোমার কতটুকু প্রভাব।'

'সাংঘাতিক।'

'তাহলে তো ভালোর চেয়েও ভাল!' জেনারেল উল্লসিত। 'একটা ফ্রেন্ডলি ইন্টারভিউ-এর কথা বলে এখানে তাকে নিয়ে আসবে তুমি। বলবে, যে-সব ঘটনা ঘটছে তার কোন ব্যাখ্যা না পেয়ে আমি দিশেহারা বোধ করছি, তার সাহায্য পেতে চাই। বলবে, ভগবানের দিব্যি দিয়ে বলেছি বহাল তবিয়তে যখন খুশি এখান থেকে চলে যেতে পারবে সে। তুমিই ভাল জানো কীভাবে বোঝালে বুঝবে। কী, পারবে না? এই কাজের বিনিময়ে আমাদের ফান্ড থেকে পঞ্চাশ হাজার ডলার বিশেষ পুরস্কার পাবে তুমি।'

'কেন পারব না, জেনারেল,' উত্তেজনায় চকচক করছে আমিনার চোখ। 'আমাকে পারতেই হবে।' চেয়ার ছেড়ে আবার দাঁড়িয়ে পড়ল সে। 'তবে আমাকে কিছুটা সময় দিতে হবে, জেনারেল।'

'হ্যাঁ, অবশ্যই।' জেনারেলও চেয়ার ছাড়লেন। 'আচ্ছা, এই যে আজ সকালে এখানে তোমাকে আসতে দিল সে, কী বলে রাজি করালে?'

'মেয়েদেরকে সব কথা জিজ্ঞেস করতে নেই, জেনারেল। তবে আপনারও জানার কথা যে মেয়েদের বিশেষ কিছু অস্ত্র আছে, আছে বিশেষ কিছু কৌশল। যে কৌশল খাটিয়ে আজ এখানে আমি আসতে পেরেছি, সেই একই কৌশল খাটিয়ে

তাকে এখানে আনতে পারব বলেও আশা রাখি।'

'গুড, ভেরি গুড,' তাড়াতাড়ি বললেন জেনারেল। তারপর হঠাৎ ভব্যতার কথা মনে পড়ে যাওয়ায় হাত কচলে আবার বললেন, 'যাবার আগে এক গ্লাস ঠাণ্ডা কিছু, মাই ডিয়ার?'

'না, ধন্যবাদ, সার। যত তাড়াতাড়ি ফিরতে পারি ততই ভাল।'

'তোমার ওপর আমার বিশেষ সুনজর থাকবে, আ-মি-না। শুধু এই কাজটা করে দাও।'

আমিনার নম্র হাসি কৃতজ্ঞতা প্রকাশের বাহন হয়ে উঠল। 'সার, জেনারেল, আপনার জ্ঞান আর মহানুভবতা আমাকে মুগ্ধ করেছে। আপনি ব্যাখ্যা না করলে নিজের বোকামি আমি ধরতেই পারতাম না। ওই দুশমন স্পাইটা আমাকে কী বোকাই না বানিয়েছে!'

মাথা নত করে 'তবেই বোঝো' ভঙ্গিতে সম্মান জানালেন জেনারেল। আমিনাকে সাধারণ একটা গ্রিক বেশ্যা বলে ধরে নিয়েছেন তিনি—বোকা, আবেগপ্রবণ; তবে নিজের ভুল দ্রুত শুধরে নেয়ার ব্যাকুলতা আছে। এটা একটা আশার কথা। 'আপাতত বিদায়, আমিনা। আশা করি খুব তাড়াতাড়ি আবার দেখা হবে আমাদের।'

আমিনা চলে যাবার পর কামরার ভেতর পায়চরি শুরু করলেন জেনারেল মাধব সিন্ধিয়া, দুই ভুরুর মাঝখানে চিন্তার রেখা। আমেরিকা সন্ত্রাসবাদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা করেছে। সবাই জানে এই সন্ত্রাস বলতে তারা একমাত্র ইসলামী মৌলবাদীদের দ্বারা সংঘঠিত ধ্বংসাত্মক কর্মকাণ্ডকেই বোঝাতে চায়। নাকি হিন্দু চরমপন্থীদের সংগঠন শিবসেনার লম্ফঝম্প, মাহাথির মহম্মদের যুক্তরাষ্ট্র বিরোধী ভূমিকা, শ্রীলঙ্কার তামিলদের স্বাধীনতা আন্দোলন, গণচীনের মৌনব্রত অবলম্বনকেও সন্ত্রাস বলে মনে করছে?

একটু পরই জেনারেলের কপাল থেকে চিন্তার রেখা মিলিয়ে গেল। আর কোন সন্দেহ নেই, ফ্যান্টাসি নিঃসন্দেহে ছোঁয়াচে। দুনিয়ার বুকে এই মুহূর্তে শান্তি বিরাজ করছে, এরকম একটা সময় আমেরিকা গণহত্যার মত জঘন্য অপরাধ করবে, কল্পনাতেই আসে না। এশিয়ান ইউনিয়ন যেখানে জন্মই নিল না, সেখানে সেটার গলা টিপে মারার প্রশ্ন ওঠে কি? আগে নিজের পায়ে দাঁড়াক ওটা, শক্ত প্রতিদ্বন্দ্বী হয়ে উঠুক, তখন না হয় চিন্তা করবে কীভাবে শত্রুকে ধ্বংস করা যায়। নাহ্, এ-ধরনের কোন হাস্যকর ষড়যন্ত্র সিআইএ করছে বলে তিনি বিশ্বাস করেন না। তবে, দু'একটা পয়েন্ট এখনি পরিষ্কার হওয়া দরকার।

ডেস্কের সামনে থেমে কলিংবেল বাজালেন জেনারেল। সঙ্গে সঙ্গে ভেতরে ঢুকল সঞ্জীব শেঠি। 'রেডিওরুমে যাও। অপারেটরকে বলো এখনি এথেন্সের সঙ্গে যোগাযোগ করতে হবে। দু'মিনিট পর কথা বলতে আসছি আমি।'

'সার, রেডিও সাইলেন্স ব্রেক করব আমরা?'

হাত দুটো মুঠো পাকালেন জেনারেল সিন্ধিয়া। এই শেঠির বাচ্চাটা তাঁকে পাগল বানিয়ে ছাড়বে। জবাব দিলেন বিদ্রূপাত্মক সুরে। 'হ্যাঁ, সঞ্জীব, রেডিও

সাইলেন্স ব্রেক করব আমরা। তুমি শুনতে ভুল করোনি। এখন যাও, হুকুমটা পালন করো। আর শোনো, গ্রিকদের কাউকে পাঠিয়ে দাও—মোটকুটাকেই—শহরের হসপিটালে গিয়ে জেনে আসুক...না, আমার কাছে আসতে বলো—কি করতে হবে আমিই বলে দিচ্ছি।'

একটু পরই মোটাসোটা এক গ্রিক কামরায় ঢুকল। নরম, শান্ত ভাবে ব্রিফ করলেন জেনারেল। কামরা থেকে বেরিয়ে এসে পাঁচ আঙুল নাচিয়ে এমন একটা ভঙ্গি করল লোকটা, যার অর্থ দাঁড়ায়: 'মাথায় আর কিছু নেই তোমার!'

এরপর বাড়ির ওপরতলায় উঠে এসে তন্দুরের মত উত্তপ্ত ছোট্ট রেডিওরুমে ঢুকলেন জেনারেল। এই স্টেশনের সঙ্গে এথেন্স, কায়রো আর কাবুল স্টেশনের সরাসরি যোগাযোগ আছে, ওগুলোর যে-কোন একটা থেকে এখানকার মেসেজ সরাসরি দিল্লিতে রিলে করা যাবে। কামরার ভেতর ঘাম আর সস্তা ইন্ডিয়ান সিগারেটের গন্ধ। ঝকঝকে রেডিও সেটটার পাশে আলুথালু হয়ে থাকা বিছানাটাই বেশিরভাগ জায়গা দখল করে রেখেছে। পকেট থেকে সুগন্ধি মাখানো রুমাল বের করে নাকে চেপে ধরলেন জেনারেল।

মাথায় পাগড়ি, তরুণ শিখ রেডিও অপারেটর তাঁর হাতে মাইক্রোফোনটা ধরিয়ে দিল।

এথেন্সের আকাশে তুমুল ঝড়-বৃষ্টি আর মুহুর্মুহুঃ বজ্রপাত হচ্ছে। ফলে কানের পর্দার জন্যে ক্ষতিকর যান্ত্রিক শব্দজট জেনারেলের মনটাকে বিষিয়ে তুলল, অপরপ্রান্তের অস্পষ্ট কণ্ঠস্বর শোনবার চেষ্টায় দু'সারি দাঁত পরস্পরের সঙ্গে চেপে বসছে। ঝাড়া মিনিট বিশেক ধরে গলদঘর্ম হবার পর পরিস্থিতি সম্পর্কে মোটামুটি একটা ধারণা করতে পারলেন তিনি। অপারেটরকে ধন্যবাদ জানিয়ে কামরা থেকে যখন বেরুলেন, দরদর করে ঘামছেন।

চওড়া পাথরের ধাপ বেয়ে বাড়ির আরেকটা টেরেসে নেমে এলেন মাধব সিন্ধিয়া, সকালের এই সময়টায় এক গ্লাস তাজা কমলার রস উপভোগ করা তাঁর অনেক দিনের অভ্যেস। প্রশ্নোত্তর পর্বটা কেমন হলো, মনে পড়তে হাসি পেয়ে যাচ্ছিল। কারণ হলো, তাঁর আন্দাজ করা উত্তরগুলোই অপরপ্রান্ত থেকে আওড়ানো হয়েছে। প্রথম প্রশ্ন ছিল এরকম—'সেলস ম্যানেজার আর তার দুই সহকারীর বাধ্যতামূলক অবসর গ্রহণ' রিপোর্ট করা হয়নি কেন? উত্তর এল, এই রিপোর্ট করবার সময় ধরা পড়ে ট্র্যান্সমিটারে যান্ত্রিক গোলযোগ রয়েছে। ত্রুটি মেরামত করতে প্রচুর সময় লেগে যায়। এই তো, মাত্র দু'ঘণ্টা হলো আবার কাজ করছে ওটা। 'এই দু'ঘণ্টার মধ্যে ঘটনাটা রিপোর্ট করা হয়নি কেন?' জেনারেলের দ্বিতীয় প্রশ্ন। উত্তর এল, কারণ সিদ্ধান্ত নেয়া হয় বরাদ্দ করা ট্র্যান্সমিশন পিরিয়ড বারোশো ঘণ্টায় রেডিও সাইলেন্স ব্রেক করা হবে। পরবর্তী প্রশ্ন—'বিপজ্জনক প্রতিদ্বন্দ্বী একজন বাঙালী মুসলমান'-এর আগমন কেন রিপোর্ট করা হয়নি? উত্তরে পাল্টা প্রশ্ন এল—জেনারেল কি মাসুদ রানার কথা বোঝাতে চাইছেন? জেনারেল বললেন—হ্যাঁ। উত্তর এল—এথেন্সে তাকে আটক করার প্ল্যানটা ব্যর্থ হবার পর পরই ট্র্যান্সমিটার বিকল হয়ে পড়ে। ভুলভাল মানুষেরই হয় ইত্যাদি বলে

আনুষ্ঠানিক ক্ষমা প্রার্থনা করা হলো, সেই সঙ্গে আশ্বস্ত করে বলা হলো অ্যাসিস্ট্যান্ট সেলস ম্যানেজার দায়িত্ব গ্রহণের পর পরিস্থিতি এখন সম্পূর্ণ নিয়ন্ত্রণে চলে এসেছে।

বাস্কেট চেয়ারে হেলান দিয়ে তৃপ্তির ঢেকুর তুলে আবার কমলার রসে চুমুক দিলেন জেনারেল সিন্ধিয়া। আরেকটা কথা মনে পড়ে যেতে এবার সত্যি-সত্যি হাসলেন তিনি। সিক্রেট সার্ভিসের সেই গর্দভটা, ভগৎসিং আচারিয়া, কোন্ সাহসে ভাবতে পারল একার চেষ্টায় মাসুদ রানাকে সামলাতে পারবে সে?

এসপিওনাজ বা ইন্টেলিজেন্স ওঅর্কই বা কী শিখেছে যে জানে না রেডিও স্টেশনে দক্ষ মেইন্টেন্যান্স-অ্যান্ড-রিপেয়ার সিস্টেম থাকা দরকার! আর কেমন বোকা সে, রানার সঙ্গে মাফিয়াদের বন্দুকযুদ্ধের মধ্যে পড়ে নিজের প্রাণ হারায়? কেউ মারা গেলে তার নিন্দা করতে নেই, তবে অত্যন্ত দুঃখের সঙ্গে ভাবতে হচ্ছে সত্যিকার বড় কোন ক্ষতি করবার আগে তার চলে যাওয়াটা ভালই হয়েছে।

'আমি রানাকে চাই!' বিড়বিড় করলেন জেনারেল। না, একা শুধু তিনি চান না। জলজ্যান্ত বিপদটাকে আটক করে সংশ্লিষ্ট মন্ত্রীসহ আরও অনেককে তিনি খবরটা জানিয়ে দেবেন। তাদের মধ্যে আইএসএস-এর ডেপুটি ডিরেক্টর কৃষ্ণস্বামী গোপালা থাকবেন, থাকবেন দিল্লির অতিরিক্ত সচিব রামকিঙ্কর আচারিয়াও। শেষোক্ত দু'জনের চোখের সামনে থেকে প্রফেসর মইনুল হাসানকে বগলদাবা করে নিয়ে চলে যায় মাসুদ রানা।

মন্ত্রী মহোদয়কে তিনি বলবেন, 'আমি এমন একজনকে বন্দি করেছি, শুনে ভারী খুশি হবেন। দুর্বল প্রতিবেশীদের গুণ্ডাটাকে। নাম মাসুদ রানা। ...না, ঠিক উল্টো—খুব সহজেই তাকে আমি ধরতে পেরেছি।' তারপর, আলোচনা শেষে, পালাবার জন্যে রানা একটা পিস্তল ছিনিয়ে নেবে, এবং জেনারেল আত্মরক্ষার্থে বাধ্য হয়ে তাকে গুলি করবেন। দুইয়ে-দুইয়ে নিখুঁত চার।

এক মুহূর্ত পর আবার বিড়-বিড় করলেন জেনারেল সিন্ধিয়া। 'আমিই সেই লোক যার হাতে মৃত্যু হয়েছে মাসুদ রানার!' তাঁর হাসির শব্দে বেসুরো কী যেন একটা আছে।

দুই

'ফিরে আসছে ওরা।' চোখ থেকে বিনকিউলার নামিয়ে কেবিনের মাথায় রেখে দিল সিকান্দার।

চোখ-ধাঁধানো রোদের ভেতর রানা শুধু কাঁপা-কাঁপা একটা দাগ দেখতে পাচ্ছে। আকৃতিটা ডিঙ্গির মতই, দূরত্ব এখনও অনেক বেশি হওয়ায় মনে হচ্ছে স্থির। দ্বীপটাকে ছাড়িয়ে একপাশে সরে না এলে চোখে পড়ত না। ওই দ্বীপের ওপাশে লুকিয়ে আছে আইলিটটা।

অ্যাপড় নোঙর ফেলেছে ছোট একটা খাঁড়িতে। খাঁড়ির দু'পাশের গ্র্যানিট দেয়াল প্রায় খাড়াভাবে পানিতে নেমে গেছে। জায়গাটা লোকচক্ষুর আড়ালে, কিন্তু ভ্রাকোনিসির দক্ষিণ উপকূল প্রায় কখনোই শান্ত হতে জানে না, ফলে খাঁড়ির ভেতর ওদের বোটটা বড় বেশি দুলছে আর ঝাঁকি খাচ্ছে।

'হ্যাঁ, আবার শুরু করুন, মিস্টার সিকান্দার,' বলল রানা, ছোট্ট ফোরডেকে একটা ক্যানভাস-চেয়ারে বসে আছে। 'ভাল কথা, এই ফুগিয়ে জায়গাটা কোথায়?'

'বসনিয়া-হার্জেগোভিনায়। ছোট্ট একটা পাহাড়ী গ্রাম। মানুষগুলোও সব একেকটা পাহাড়। সাতশো বছর ধরে মুসলমান ওরা, তারও অনেক আগে থেকে বসবাস করছে ওখানে। তবে কিছু তুরকি, কিছু আলবেনীয় মুসলমানও পরে ওখানে আসে। যাই হোক, গ্রামে ঢুকবার আগেই স্টাফ কার একটা রোড-ব্লকে বাধা পেল। আশপাশে পাথরের আড়াল থেকে মাথা তুলল মুসলিম গেরিলারা, সার্বদের পাঁচজন মেজর আর দু'জন কর্নেল সঙ্গে সঙ্গে মারা গেল।

'এটা ছিল পাহাড়ী গ্রামগুলোয় সার্ব হানাদারদের নির্বিচারে মুসলমান হত্যার প্রতিশোধ। ওই সময় ইহুদি আবসালাম ইয়াহুদও বসনিয়ায় ছিল। তার জন্ম সারায়েভোয়, কিশোর বয়সে ইজরায়েলে চলে যায়। সেনাবাহিনীতে যোগ দিয়ে মেজর হয় সে, তারপর চাকরি ছেড়ে দিয়ে মোসাদে ঢোকে। সেবার সে তার মা-বাবা আর ভাইকে ইজরায়েলে নিয়ে যেতে বসনিয়ায় ফিরে এসেছিল। এসে দেখে গোটা যুগোস্লাভিয়া ভেঙে পড়ছে, একই সঙ্গে চলছে জাতিগত দাঙ্গা–বিশেষ করে যেখানে যারাই পাচ্ছে সেখানেই কচুকাটা করছে মুসলমানদের। ব্যস, মহা আনন্দে সেই হত্যাযজ্ঞে ঝাঁপিয়ে পড়ল ইয়াহুদও।

সার্ব হানাদার বাহিনীর পরামর্শদাতা হিসেবে কাজ করেছিল ওখানে সে। অফিসাররা সবাই খুন হয়েছে শুনেই একদল সার্ব সৈনিক নিয়ে পাহাড়ে উঠে আসে। মুসলিম গেরিলারা অন্য কোন গ্রাম থেকে এসেছিল, নিজেদের কাজ সেরে ফিরে গেছে। গ্রামের লোকজন পরে জানতে পারল কিছু সামরিক অফিসার মারা গেছে, কিন্তু তাদের সঠিক পরিচয় বা কী কারণে মারা গেল, এ-সব কেউ তাদেরকে ব্যাখ্যা করে বলেনি।

'ঘটনার দু'ঘণ্টার মধ্যে সৈনিকদের দিয়ে গ্রামটাকে ঘিরে ফেলল ইয়াহুদ, গ্রামবাসী সবাইকে কয়েক লাইনে দাঁড় করাল চৌরাস্তার ওপর। মহিলা আর চোদ্দ বছরের নিচের ছেলেমেয়েদের গ্রামের স্কুলে পাঠিয়ে দিল। স্কুলটা বেশ বড়, কাঠের তৈরি। প্রতিটি কামরার দরজা বাইরে থেকে বন্ধ করে তালা ঝুলিয়ে দেয়া হলো। তারপর কাঠের দেয়াল, বারান্দা আর ছাদে হড়-হড় করে ঢালা হলো ড্রাম-কে-ড্রাম পেট্রল। আগুন লাগার পর অনেক মা তাদের বাচ্চাদের জানালা দিয়ে বাইরে ঠেলে দেয়ার চেষ্টা করে, তবে তাদেরকে মরতে হয় সাব মেশিনগানের ব্রাশ ফায়ারে। এরপর ইয়াহুদ বাকি লোকজনকে খুন করে। সেদিন ওখানে সবমিলিয়ে দুশো একুশজন মারা গিয়েছিল। দুই বৃদ্ধ কীভাবে যেন বেঁচে গিয়ে এই ঘটনার চাক্ষুষ বর্ণনা দেয়।

'খবর পেয়ে গেরিলা দলটা পরদিন ফিরে আসে, সেবারও তাদের সঙ্গে

ছিলাম আমি। ভাগ্যগুণে বেঁচে যাওয়া দুই বৃদ্ধের একজন জানাল–একটা দৃশ্য জীবনে সে ভুলবে না। বাচ্চাদের নিয়ে মায়েরা যখন স্কুলে ঢুকছে, গেটে তখন দাঁড়িয়ে ছিল ইয়াহুদ। অতি সুদর্শন আট বছরের একটা ছেলেকে দেখে ভাল লাগে তার, মাথায় হাত বুলিয়ে আর গাল টিপে দিয়ে আদর করে, কুশল বিনিময় করে তার মায়ের সঙ্গে। আহ্, যীশুর পশ্চিমা অনুসারীরা পারিবারিক মূল্যবোধকে সব কিছুর ওপরে স্থান দেয় যে!' আবেগে গলা প্রায় বুজে এল সিকান্দারের। ঘুরে দাঁড়াল সে।

চেয়ার ছেড়ে পাশে চলে এল রানা, একটা হাত রাখল তার কাঁধে। দু'জনের কেউই কিছু বলছে না।

তারপর সিকান্দারই আবার মুখ খুলল। 'সেবার সার্ব সৈনিকদের ঠিকই আমরা ঘেরাও দিই, কিন্তু চতুর ইয়াহুদকে ধরতে পারিনি। সে জানত গেরিলারা ফিরে আসবে, তাই লেজ গুটিয়ে বেলগ্রেডে চলে যায়। সেজন্যেই বলছিলাম–মিস্টার রানা, আপনাকে কথা দিতে হবে। ওটাকে আমার হাতে ছেড়ে দেবেন আপনি। আমি নিজে মারব।'

'হ্যাঁ, ঠিক আছে, মিস্টার সিকান্দার।'

ওখান থেকে সরে এসে ডিঙ্গিটার দিকে তাকাল রানা। ইতিমধ্যে ওটা এত কাছে চলে এসেছে যে আমিনার নীল শার্ট পরিষ্কার চেনা যাচ্ছে, রোদে ঝলমল করছে মখমলের মত চুল। হাত নাড়ল ও, উত্তরে আমিনাও। মেয়েটা নিরাপদে ফিরে আসায় খোদাকে ধন্যবাদ দিল রানা। কারণ, ও শুনেছে ভারতীয় ইন্টেলিজেন্স র আর সিক্রেট সার্ভিসের মধ্যে সমন্বয়ের অভাব তো আছেই, প্রাতিষ্ঠানিক রেষারেষি আর অসুস্থ প্রতিযোগিতাও নাকি চরম। আমিনার রিপোর্ট আইলিটের কর্মকর্তারা কীভাবে নেবেন, মেজর আচারিয়া আর তার সহকারীদের মৃত্যুর জন্যে আমিনাকেই দায়ী করা হবে কি না, রানার সঙ্গে তার হাত মেলানোটাকেই বা কী চোখে দেখা হবে–এ-ধরনের সন্দেহ ওকে অস্থির করে তুলেছিল। যাই হোক, আমিনাকে গ্রেফতার করা হয়নি। তাহলে ধরে নিতে হয় তার রিপোর্ট ভারতীয় সিকিউরিটি অফিসাররা বিশ্বাস করেছেন।

ডিঙ্গির পিছনে আর অনেকটা ওপরে, পাহাড়ের গায়ে কী যেন একটা নড়ে উঠল। ভাল করে তাকাতে এক লোকের আকৃতি টের পাওয়া গেল। রাশি রাশি পাথরের টুকরো আর বেটপ গড়নের কাঁটাঝোপের ভেতর দিয়ে তির্যক একটা পথ তৈরি করে নিচে নামছে লোকটা, একটা খাঁড়ির ঢালু কাঁধ বেয়ে। তার নড়াচড়া একটু অদ্ভুত লাগল চোখে, যেন কোন ধরনের প্রতিবন্ধী। ওকে এভাবে নামতে দেখে কৌতূহল বোধ করছে রানা। কেবিনের মাথা থেকে বিনকিউলারটা নিয়ে চোখে তুলল, কিন্তু ততক্ষণে লোকটা দৃষ্টিপথের বাইরে চলে গেছে।

দ্বীপে কর্নেল ময়নিহানের আস্তানা, আইলিটে তার প্রতিপক্ষ জেনারেল সিন্ধিয়ার ঘাঁটির তুলনায় ছোটই বলতে হবে। এই আস্তানা অনেক বেশি নিরালাও বটে। আশপাশে খাঁড়িগুলো থেকে কর্নেলের হেডকোয়ার্টারে কেউ যদি পৌঁছাতে চায়,

অনেকগুলো কঠিন শর্ত পূরণ করতে হবে তাকে। ছোট বড় পাহাড়চূড়াগুলো শুধু খাড়া নয়, গা এমন ভাঙাচোরা আর ধারাল যে বিশ গজ এগোতে হলেও রক্তাক্ত না হয়ে উপায় নেই। যে-ই উঠতে চাক, তার থাকতে হবে অবিশ্বাস্য শারীরিক শক্তি, আর হতে হবে অসম্ভব কষ্টসহিষ্ণু। কিছু ঢাল তেমন খাড়া নয়, ক্রল করে ওঠা যাবে, তবে গ্র্যানিট আর মার্বেল পাথরের ওপর দিয়ে। বেশিরভাগেরই কোন আকৃতি নেই, আবার কিছু পাথরকে দেখে মনে হবে জ্যামিতিক নকশা অনুকরণ করে কেটে রেখে গেছে কেউ।

সমস্ত শর্ত পূরণ করবার পর কঠিন চ্যালেঞ্জে জয়ী হয়ে যে লোকটা টেরেসে উঠে কর্নেল ময়নিহানের পায়ের সামনে বসে আছে, তার শারীরিক সামর্থ্য নিয়ে সন্দেহ পোষণ করা চলে না। কেবিন-ক্রুজার থেকে সেকেন্ড ডিগ্রি বার্ন অর্থাৎ গায়ে ফোস্কা নিয়ে পানিতে ঝাঁপ দেয় সে, এক ঘণ্টা সাঁতার কাটবার পর তাকে তুলে নেয় বন্দর থেকে খোঁজ নিতে আসা বোট। হাসপাতাল থেকে পালিয়ে রোদের মধ্যে পাঁচ মাইল হাঁটতে হয়েছে ওকে এই বাড়িটার ওপর পাহাড়চূড়ায় পৌঁছানোর জন্যে। বাঁ হাতে ব্যান্ডেজ বাঁধা রয়েছে, ওই জখমী হাতটার জন্যে ঢাল বেয়ে নামবার সময় দু'বার পা পিছলে যায় তার। শুধু যে ক্লান্তির শেষ সীমায় পৌঁছে গেছে, তা নয়, শকটা এখনও পুরোপুরি সামলে উঠতে পারেনি। তাই রিপোর্ট দেয়ার সময় তোতলাচ্ছে, একই কথা কয়েকবার করে বলছে।

কর্নেল ময়নিহান ব্যাপারটা ধৈর্যের সঙ্গে মেনে নিচ্ছে। কাঠের শক্ত চেয়ারে শিরদাঁড়া খাড়া করে বসে আছে সে, দৃষ্টিতে প্রশংসা আর সদয় ভাব নিয়ে তাকিয়ে আছে কাছাকাছি এক বন্দরের তৃতীয় সারির গুণ্ডাটার দিকে, যে কিনা এত কিছু সহ্য করেছে শুধু পাঁচশো মার্কিন ডলারের জন্য। ফোম-রাবার দিয়ে তৈরি একটা কুশনে কালো-সবুজ ডোরাকাটা বিকিনি পরে আধশোয়া ভঙ্গিতে ওদের কাছাকাছি দেখা যাচ্ছে হেলেনকে। দোভাষী হিসেবে তার এই ভঙ্গি ও নামমাত্র পরিচ্ছদ মোটেও মানানসই বলা যাবে না। মাঝে মধ্যে গ্লাসের লালচে পানীয়তে ডোবানো স্ট্র মুখে পুরে মৃদু মৃদু টান দিচ্ছে সে।

'মিস্টার চেরিউসকে বলো কী ঘটেছে সবই আমি পরিষ্কার বুঝতে পারছি,' মেয়েটাকে বলল কর্নেল। 'যথেষ্ট সার্ভিস দিয়েছে, সেজন্যে ধন্যবাদ দাও। তারপর জিজ্ঞেস করো ঠাণ্ডা গরম কী নেবে। তবে আমার ক'টা প্রশ্ন আছে। প্রথম প্রশ্ন, ও আমাকে খুঁজে পেল কীভাবে।'

প্রশ্নটা ভাষান্তর করা হচ্ছে, কর্নেল ভেতর দিকে ডেবে থাকা চেরিউসের মুখটা তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে লক্ষ করছে। উত্তর দেয়ার সময় লোকটার মুখের ভেতর সোনায় বাঁধানো একাধিক দাঁত দেখতে পেল সে।

স্ট্রতে আরেকবার টান দিয়ে নগ্ন একটা হাঁটু ভাঁজ করে কর্নেলের দিকে ঘাড় ফেরাল হেলেন। 'বলছে, ওর মনে হয়েছে আপনাকে সাবধান করা উচিত। তাছাড়া, সব টাকা এখনও পায়নি ও।'

'আমার প্রশ্নের উত্তর পেলাম না। আবার জিজ্ঞেস করো।' অপেক্ষায় থাকল কর্নেল।

'ও বলছে–যদি কেউ মারা যায়, তাই ওদের সবাইকে একটা ম্যাপ দেখানো হয়েছিল।'

'দারুণ দূরদৃষ্টি। যুক্তিসঙ্গতও বটে। বেশ, আপাতত আমার আর কিছু জানার নেই।'

চেরিউসকে ব্র্যান্ডি দেয়া হয়েছে। একটা করে ঢোক গেলে আর নিচু গলায় এক দেড় মিনিট বকবক করে। বড় বেশি অস্বস্তিতে ভুগছে লোকটা। এর কারণ হয়তো এই যে তার ভয়ানক দুর্দশা আর অক্ষমনীয় ব্যর্থতা অমায়িক বিনয়ের সঙ্গে মেনে নেয়া হয়েছে। টাকার চিন্তা বা বিবেক নয়, ভয়ই তাকে হাসপাতাল থেকে পালিয়ে আসতে বাধ্য করেছে, যে-সময় তার সমগ্র অস্তিত্ব বিশ্রাম পাবার জন্যে ফোঁপাচ্ছিল। পিরাউসের সবখানে নানা ধরনের গুজব ছড়িয়ে পড়েছে…তবে সে-সব মুখ ফুটে বলতে চায় না সে।

চেহারায় থমথমে গাম্ভীর্য নিয়ে হেলেনের ভাষান্তর শুনল কর্নেল ময়নিহান। তারপর ঘাড় ফিরিয়ে তাকাল। 'এই সব লোক শব্দের পূজারী। এত কথা বলে, কথাই যেন এদের ঈশ্বর। অ্যাকশন আর কথার মধ্যে কী পার্থক্য, বোঝে না। এই লোক যা করেছে তা যদি আমি সিরিয়াসলি নিই, দুনিয়ার কোন ভাষার কোনও শব্দই ওকে বাঁচাতে পারবে না। সহজ এই কথাটা ব্যাটা কেন বুঝতে পারছে না?'

এই ঝামেলাটা চুকে যাবার অপেক্ষায় রয়েছে হেলেন। রোদ, সাগরের বাতাস আর পাহাড়ী ঢাল থেকে ভেসে আসা বিভিন্ন ফুলের সুগন্ধ তার চোখে একটা ঘুম-ঘুম ভাব এনে দিচ্ছে। চোখের সামনে পালা করে নাচানাচি করছে বিছানা, মুখরোচক লাঞ্চ, আবার বিছানা। হঠাৎ মনটা খারাপ হয়ে গেল। তাকেও তো কেউ সিরিয়াসলি নিচ্ছে না! শিশির ছিপি খুলে হাতের তালুতে তেল ঢালল সে, তারপর ধীরে-ধীরে উরুতে ঘষতে শুরু করল।

কর্নেল এবার দ্রুত কথা বলল। 'মিস্টার চেরিউসকে বলো, আমি জানি কী ধরনের কঠিন পরিস্থিতির সামনে পড়তে হবে আমাকে। ওকে অভয় দাও–মাসুদ রানার পালিয়ে যাওয়াটা সিরিয়াস কোন ব্যাপার নয়। শান্তির স্বার্থে এই সমস্যারও সুরাহা করা হবে। মিস্টার চেরিউসকে আরও বলো, তার পাওনা তো মেটানো হবেই, দায়িত্ববোধের পরিচয় দেয়ায় বোনাস দেয়া হবে আরও তিনশো মার্কিন ডলার। এখন তার চিকিৎসা চলবে। ওকে ডক্টর গ্রাহাম লেম্যানের কাছে নিয়ে যাও। আর গেরোকে বলো ওকে যেন কিছু খেতে দেয়। তারপর তুমি বা তোমার বান্ধবী ওর একটু সেবা-যত্ন করো, যদি সে চায় আর কী। তবে খেয়াল রেখো, লোকটা আহত আর দুর্বল, কাজেই সেবার ডোজ খুব বেশি না হওয়াই ভাল।'

হেলেন হাসতে শুরু করলেও, কার উদ্দেশে হাসছে মনে পড়ে যেতেই যেন সুইচ টিপে বন্ধ করল হাসি। হাঁটুর ওপর সিধে হয়ে চোখেমুখে আগ্রহ ফুটিয়ে তুলল সে, কথা বলছে চেরিউসের সঙ্গে।

চেয়ার ছেড়ে দাঁড়াল কর্নেল, তার দীর্ঘ একহারা কাঠামো নাঙ্গা তলোয়ারের মতই ঋজু। ছায়ার ভেতরই থাকল, ধীর পায়ে টেরেসের শেষ প্রান্তে হেঁটে এসে একটা পাথুরে স্তম্ভের পাশে দাঁড়াল। এই মুহূর্তে যেন নিষ্প্রাণ একটা অটল মূর্তি

সে। আধবোজা চোখ, দৃষ্টি ঘুরে বেড়াচ্ছে দুর্গম, রোদ ঝলমলে ঢাল আর চূড়াগুলোর ওপর; কিন্তু কিছুই দেখছে না। ঘুঘরে পোকার কিচিরমিচির কানে আসছে, কিন্তু শুনছে না সে। এমন কী মনে অন্য কোন চিন্তা না থাকলেও, এই তাৎপর্যহীন অপ্রাসঙ্গিক অচেনা দৃশ্য তার মনোযোগ আকর্ষণ করতে পারত না। গুরুত্বপূর্ণ হলো অ্যাকশন, মঞ্চটা নয়। ইতিহাসে ঠাঁই পায় শুধু কর্ম, আর সেই কর্ম যারা সম্পাদন করে। লোককে যদি জিজ্ঞেস করতে হয় একটা ঘটনা 'কোথায়' ঘটেছে, তাহলে নিশ্চিতভাবে ধরে নেয়া যায় যে সেটা অদ্বিতীয় কিছু নয়। এবং, হ্যাঁ, আটচল্লিশ ঘণ্টারও কম সময়ের মধ্যে সে এমন একটা সাফল্য অর্জন করতে যাচ্ছে যেটাকে ইতিহাসের পাতায় জায়গা না দিয়ে উপায় থাকবে না; কারণ, ঘটনা হিসেবে সেটাকে অদ্বিতীয় বলতেই হবে।

তার পিছনে ওদের কথাবার্তা শেষ হয়েছে, লোকটাকে নিয়ে বাড়ির ভেতরে ফিরে গেছে মেয়েটা। শরীর অটল, পরিবর্তনটা শুধু কর্নেলের মুখে ঘটল। পিঁয়াজরঙের পাপড়ির পিছনে চোখের তারায় যেন আগুন ধরানো হলো, সামান্য প্রসারিত হলো সরু ঠোঁট জোড়া। ছন্দবদ্ধ শোঁ-শোঁ শব্দ হচ্ছে, যেন দূর থেকে ভেসে আসছে এয়ার-পাম্পের আওয়াজ। আসলে, ময়নিহান হাসছে।

নিজেকে সামলে নিয়ে টেরেস থেকে বাড়ির ভেতর ফিরল সে, সিঁড়ি বেয়ে ওপরে উঠছে। লম্বা করিডরে পৌঁছাল, সবটুকু হেঁটে এসে একটা দরজার ভারী বোল্ট খুলে ভেতরে ঢুকল।

'গুড মর্নিং, মাই ডিয়ার মেজর জেনারেল। ভাল তো? আশা করি যা-যা প্রয়োজন সবই আপনি পাচ্ছেন?'

খুদে জানালা দিয়ে বাইরে তাকিয়ে আছেন রাহাত খান। সরু ফাঁকটা দিয়ে এক ফালি রূপালি সাগর দেখা যাচ্ছে, ভাগ্য প্রসন্ন হলে মাঝেমধ্যে ওই ফালির ওপর দিয়ে অবিশ্বাস্য সত্যের মত ভেসে যাচ্ছে একটা ইয়ট বা ফিশিং বোট। ওগুলো মাত্র দশ কি বারো সেকেন্ড দেখা যায়, তবে মনে করিয়ে দেয়ার সঙ্গে আশ্বস্তও করে যে দুনিয়া এখনও চলছে, জীবন থেমে নেই, এবং সব কিছু প্রায় আগের মতই আছে। জানালার সামনে প্রতিবার কয়েক মিনিটের বেশি থাকতে পারেন না তিনি, কারণ একটানা বেশিক্ষণ দাঁড়িয়ে থাকলে ক্লান্তি বোধ করেন। এটা একদম নতুন একটা বিড়ম্বনা, সম্ভবত তাঁকে যে ড্রাগ ইঞ্জেক্ট করা হয়েছে তারই প্রতিক্রিয়া।

এটা একটা পাথুরে সেল। একমাত্র চেয়ার থেকে জানালার বাইরেটা দেখা যায় না। ওটা ছাড়া ফার্নিচার বলতে আর শুধু একটা বিছানা। এই সেলে আসবার পর থেকে বিশেষ করে দুটো চিন্তা তাঁকে পীড়িত করছে—একটা ভয়, চেয়ারে বসে বিশ্রাম নেয়ার সময় হয়তো কোন জলযান সরু ফালিটা পেরিয়ে যাবে; আর এই উপলব্ধি, খাঁ-খাঁ শূন্যতার মধ্যে কর্নেল ময়নিহানের আগমনটাকে এক ধরনের মুক্তি বলে ভাবতে চাইছেন। এই অসুস্থকর ও রহস্যময় ঘনিষ্ঠতা, তিনি তাঁর নিজের অবস্থান থেকে ভালই বুঝতে পারেন, ধীরে-ধীরে বন্দি আর তার ইন্টারোগেটরকে এক করে ফেলবার প্রাথমিক পর্যায়।

এই মুহূর্তে ঘুরে কর্নেল ময়নিহানের মুখোমুখি হলেন তিনি। একটু বেসামাল লাগছে তাঁকে—উদ্বেগে ক্লান্ত, বিশ্রাম ও পুষ্টির অভাবে কাহিল। তবে কণ্ঠস্বরে ঠিকই টের পাওয়া গেল রয়েল বেঙ্গল টাইগারের চাপা গর্জন। 'এই, ধাড়ি শয়তান, আমার প্রয়োজন নিয়ে আদৌ তোমার কোন মাথাব্যথা আছে? যা বলতে এসেছ সেটাই বলো, ফর গড'স্ সেক।'

'রাগবেন না সার, প্লিজ। রাগ জিনিসটা শুধু রক্ত গরম করে না, দু'পক্ষের চিন্তা-ভাবনায় বাধাও সৃষ্টি করে। হ্যাঁ, আপনার প্রয়োজন নিয়ে অবশ্যই আমি মাথা ঘামাচ্ছি। আমাদের নিজস্ব স্বার্থেই আমরা চাই আপনার শরীর-স্বাস্থ্য ভাল থাকুক। আপনাকে কম খেতে দেয়া, বাথরুমে যেতে দিতে অস্বীকার করা ইত্যাদি আমার পরিকল্পনার অংশ নয়। আমরা একটা ইউনিক অভিজ্ঞতা অর্জন করতে যাচ্ছি, তাতে আপনার ভূমিকা শক্তিশালী একজন তৎপর পুরুষের। এর অন্যথা হলে আপনার মৃত্যু মানাবে না, প্রশ্নবিদ্ধ হয়ে থাকবে। কাজেই, বিশ্বাস করুন, আপনাকে মোটাতাজা দেখতে চাই আমি।'

রাহাত খানের দৃষ্টি এক চুল নড়ল না। 'সাধু বটে!'

'তবে আমি শুধু আপনার তবিয়ত ভাল কি না জানতে আসিনি। আপনার জন্যে ছোট্ট একটা খবরও নিয়ে এসেছি খবরটা আপনার সহ-সন্ত্রাসী ও প্রিয় শিষ্য মাসুদ রানা সম্পর্কে।'

চোখে আশার আলো ফুটবার আগেই তা গোপন করে ফেলতে হিমশিম খেতে হলো রাহাত খানকে। সামান্য একটু আগ্রহই শুধু প্রকাশ পেল তাঁর চেহারায়। একটা হাত বাড়ালেন, খুব দ্রুত নয়, পাশের দেয়ালে তালু ঠেকিয়ে শরীরের ভার এক পা থেকে আরেক পায়ে চাপালেন। 'তাই বুঝি?' স্বাভাবিক শান্ত কণ্ঠস্বর।

'এখানে আর কেউ নেই, তাই আপনার কাছে স্বীকার করছি,' গলা খাদে নামিয়ে ফিসফিস করছে কর্নেল ময়নিহান, যেন একটা ষড়যন্ত্র পাকাচ্ছে। 'ওস্তাদ, শিষ্য একটা বানিয়েছেন বটে! বিশ্বাস করুন, যাকে বলে একেবারে ঘোল খাইয়ে ছাড়ছে সবাইকে। এই অপারেশনের এথেন্স সেক্টরের মারাত্মক ক্ষতি হয়েছে তার হাতে। যাই হোক, ওদিকটা আমার দায়িত্বে ছিল না, ক্ষতিটা পুষিয়েও নেয়া যাবে। আসল খবর হলো, রানাকে এদিকে দেখা গেছে।'

বিসিআই চীফ কিছু বলছেন না। কোন প্রতিক্রিয়াও নেই।

'আপনি হয়তো জানেন যে সিআইএ-র নিজস্ব কিছু সমস্যা আছে। একই অপারেশনে আমাদের কয়েকটা সেপারেট ইউনিট কাজ করে, প্রতিটি ইউনিট জবাবদিহি করে হেডকোয়ার্টারে। সেজন্যেই এই অদ্ভুত পরিস্থিতিও সৃষ্টি হয়—এথেন্স সেক্টর যেখানে রানাকে যে-কোন মূল্যে বন্দি করবার জন্যে খুঁজছে, সেখানে আমি ওকে অক্ষত অবস্থায় রিসিভ করবার জন্যে প্রস্তুতি নিচ্ছি। ওদিকে আবার পেন্টাগন খবর পাঠিয়েছে, আইওস দ্বীপের ওদিকে, তুরকি জলসীমায় সামরিক মহড়া শুরু করছে তারা, প্রয়োজনে যেন সাহায্য চাই।'

রাহাত খান কিছু বলছেন না।

'তবে আমার প্রস্তুতিটাই কাজে লাগবে আপনি আর আমি, দু'জনেই রানার ওপর পূর্ণ আস্থা রাখতে পারি–যেভাবেই হোক একটা পথ তৈরি করে নিয়ে এখানে পৌঁছে যাবে সে। যখনই সে আসুক, আজ যদি না-ও হয় তো কাল তো বটেই, তাকে আমরা সঙ্গে সঙ্গে বন্দি করব সিআইএ-র ফাইলে বর্ণনা করা হয়েছে কতখানি ভয়ঙ্কর সে। সব মনে রেখেই তাকে আটক করবার প্রস্তুতি নেয়া হয়েছে। ভাল কথা, আমরা কিন্তু রানা এজেন্সির কোন অপারেটরকে তার আশপাশে দেখছি না, এমন কী বিসিআই এজেন্টরাও যেন বাতাসে মিলিয়ে গেছে। আপনার শিষ্য এক বুড়ো ইসলামী জঙ্গি আর ভারতীয় সিক্রেট সার্ভিসের একটা মুসলমান মেয়ের সাহায্য নিয়ে সিআই-এর বিরুদ্ধে যুদ্ধ করতে চাইছে। সিআইএ তথা আমেরিকা কী জিনিস, রানা যেন জানে না। সে যাই হোক, ওকে সামলাবার জন্যে পাঁচজন লোককে ডেকেছি আমি। সবাই টাফ এবং অভিজ্ঞ। ঠিক সময়েই পৌঁছাবে তারা। ফলাফল সহজেই অনুমেয়।'

'একজনের বিরুদ্ধে পাঁচজন?' একটু হাসলেন বিসিআই চীফ। 'রানার জায়গায় অন্য কেউ হলে বলতাম, এ তোমাদের কাপুরুষতা। কিন্তু তোমাদের প্রতিপক্ষ যেহেতু রানা, তাই না বলে পারছি না যে এ হলো তোমাদের নির্বুদ্ধিতা। সিআইএ-র ফাইলে দেখা যাচ্ছে আসল কথাটাই লেখা নেই–ও তো একাই একশো। লোক আরও বাড়াতে হবে তোমার, ময়নিহান।'

হাসল কর্নেলও, যদিও মনে মনে নিজেকে তিরস্কার করছে। 'কাঁচা চামড়া পোড়ানো হলো, অথচ তা নিয়ে একটা টুঁ-শব্দও করছেন না যে? ব্রাভো, জেনারেল, ব্রাভো! বুকের কি অবস্থা? আর কয়টা ছ্যাঁকা দিলে মুখ খুলবেন?' নিজের লোকবল সম্পর্কে আভাস দেয়া তার উচিত হয়নি, ভাবল সে। অপারেশনটা গোপন রাখার স্বার্থে সিআইএ সদর দফতর আর পেন্টাগন থেকে ওকে নির্দেশ দেওয়া হয়েছে, লোকজন ও উপকরণ যথাসম্ভব কম ব্যবহার করতে হবে, কিন্তু শত্রুপক্ষকে এ-সব জানাবার কোন প্রয়োজন ছিল কি?

রাহাত খানের চোখ দুটো থেকে নিঃশব্দে আগুন ঝরছে যেন।

'পরে আমরা দেখব আপনার পিঠের চামড়া নিয়ে কী করা যায়। পিঠের না হয়ে সেটা পায়ের চামড়াও হতে পারে। তবে না, এভাবে ভয় দেখানোটা উচিত হচ্ছে না। আপনাকে লাঞ্চ খাবার সুযোগ করে দিয়ে আপাতত আমি চলে যাচ্ছি। চাকরটাকে বলে দিয়েছি, আপনাকে ভাল ভাল খাবার দিতে হবে। মোটাতাজা, প্রাণবন্ত দেখতে চাই আমরা আপনাকে। মাসুদ রানা আসছে, এ উপলক্ষ্যে খানিকটা ওয়াইনও দিতে বলছি।'

ময়নিহান আর দরজার দিকে পিছন ফিরলেন রাহাত খান, আবার সরু এক ফালি রূপালি সাগরের দিকে তাকালেন। এই মুহূর্তে কিছু নেই ওখানে।

তিন

'আমার সব কথা শুনে জেনারেল মাধব সিন্ধিয়া ভয়ানক চিন্তায় পড়ে গেছেন,' বলল আমিনা। 'উনি চাইছেন তুমি ওখানে গিয়ে তাঁর সঙ্গে দেখা করে ব্যাপারটা নিয়ে আলোচনা করো। বলছেন, তোমার সাহায্য দরকার তাঁর। আলোচনার পর তুমি অবশ্যই ফিরে আসতে পারবে–ভগবানের দিব্যি দিয়ে কথাটা বলেছেন জেনারেল।'

রানা নিজের আঙুলের নখগুলো খুঁটিয়ে পরীক্ষা করছে। 'নিশ্চয়তা কী? আমার ওপর তাঁর রাগ গোপন কোন ব্যাপার নয়। র-র অ্যাসিস্ট্যান্ট ডিরেক্টর হবার আগে থেকেই বলে বেড়িয়েছেন, আমাকে বাগে পেলে ছাড়বেন না, জন্মের মত শিক্ষা দেবেন। এখন আমি গেলে যদি আর ফিরতে না দেন?'

'বললাম না, ভগবানের নামে কথা দিয়েছেন!' আমিনাকে একটু বিরক্ত, একটু অসহিষ্ণু দেখাল। 'ভারত শুধু শক্তিশালী প্রতিবেশী নয়, তোমাদের স্বাধীনতা যুদ্ধে সাধ্যেরও বেশি সাহায্য করেছে–তাদের ইন্টেলিজেন্স কর্মকর্তার কথা তুমি বিশ্বাস করতে পারছ না?'

অ্যাপডের সেলুন এক মুহূর্ত নীরব হয়ে থাকল। তারপর রানা ও সিকান্দার একযোগে হেসে উঠল।

'আমার অভিনয় ভাল হয়নি?' ওদের হাসিতে এখনি যোগ না দিয়ে ব্যগ্র কণ্ঠে জানতে চাইল আমিনা। 'তোমাদের আমি মুহূর্তের জন্যেও বোকা বানাতে পারিনি?'

দু'হাত দিয়ে তাকে জড়িয়ে ধরে কপালে হালকা একটা চুমো খেলো রানা। 'না,' বলল ও। 'দুঃখের সঙ্গে জানাচ্ছি, তোমার অভিনয় একেবারে যাচ্ছেতাই হয়েছে। অসম্ভব, কোনদিনই তুমি ভাল অভিনেত্রী হতে পারবে না, এত সৎ হলে এ লাইনে চলে না। শোনার সময়ই বোঝা যাচ্ছিল যা বলছ নিজেও তা বিশ্বাস করো না। সব মিলিয়ে খুবই বাজে পারফরম্যান্স।'

'লোকটা বোধহয় শুধু পাগল নয়, বোকাটে পাগল।' নিজের গ্লাসে উজো ঢালছে সিকান্দার। 'সে আসলে ভাবছেটা কী? পুরো গল্পটা তাকে তুমি শুনিয়েছ তো?'

'কিছুই বাদ দিইনি, সিকান্দার চাচা। কিন্তু আমার কথা তিনি বিশ্বাস করেননি। তবে আচারিয়ার ব্যাপারটা বিশ্বাস করেছেন, কারণ জানেন সত্যি কি না যাচাই-যোগ্য কোন বিষয়ে মিথ্যেকথা বলার সাহস হবে না আমার। কিন্তু বাকিটা শোনার সময়ই ধরে নিয়েছেন, রানার শেখানো মন্ত্র মুখস্থ বলে যাচ্ছি আমি। তাঁর বিশ্বাস, রানা কিছু গুণ্ডার বিরুদ্ধে লড়ার কথা বলে আমার সাহায্য চাইছে, ওর আসল উদ্দেশ্য কনফারেন্সটা বানচাল করা। শুধু হিন্দুস্থানের জন্যে নয়, রানা নাকি

গোটা দুনিয়ার জন্যে একটা অভিশাপ। এই তো মাত্র কয়েক মাস হলো হিন্দুস্থানের মুখের গ্রাস কেড়ে নিয়ে গেছে ও ভারতের হাতের মুঠো থেকে।'

'ওহ্, গড!'

'তাঁর প্রায় সব কথাতেই সায় দিতে হয়েছে আমাকে, তা না হলে ফিরতে পারতাম বলে মনে হয় না।'

'তারমানে, তোমাকে দেখামাত্র ভদ্রলোক সিদ্ধান্ত নিয়ে ফেলেন এ মেয়েকে বিশ্বাস করা যাবে না।'

'একদম ঠিক ধরেছ। আমি হলাম তাঁর দৃষ্টিতে অবিশ্বাস করার আদর্শ পাত্রী। গ্রিক অথচ মুসলমান, এটা একটা কারণ। তাঁর বোধহয় ধারণা, মুসলমান মাত্রই হিন্দুস্থানের শত্রু। আমি একটা মেয়ে, এই ফ্যাক্টও আমার বিরুদ্ধে গেছে। আর সবচেয়ে বড় কথা–আমি আইএসএস, উনি র।'

'হ্যাঁ।' মাথা ঝাঁকাল রানা। 'সম্ভব। শুনেছি দুই সংস্থার মধ্যে সাপে-নেউলে সম্পর্ক।'

'শুধু প্রতিদ্বন্দ্বী হলে কথা ছিল,' বলল আমিনা। 'পরস্পরকে ঈর্ষা আর ঘৃণা করা হয়। নিজেদের মধ্যে কোল্ড ওঅর।'

'যাই হোক, জেনারেল সিন্ধিয়ার কাছ থেকে তাহলে আমরা কোন সাহায্য পাচ্ছি না,' বলল রানা। 'সত্যি কথা বলতে কী, তাঁর পথ থেকে সরে থাকাই সব দিক দিয়ে ভাল। এটুকু অন্তত জানতে পেরেছি আমরা।'

'না, আরও বেশি জেনেছি। কেবিন-ক্রুজারের একজন সারভাইভার এখানকার হাসপাতালে ভর্তি হয়েছে। জেনারেল সিন্ধিয়া তার ব্যাপারটা তদন্ত করবেন।'

রানার সঙ্গে দৃষ্টি বিনিময় করল সিকান্দার। 'তারমানে কেউ তাকে উদ্ধার করেছে, মিস্টার রানা। ইন্টারেস্টিং!'

'ওই লোক আমাদের জন্যে কোন হুমকি নয়,' ধীরে ধীরে বলল রানা। 'তাছাড়া, আমাদের এত লোকবলও নেই যে তার ওপর নজর রাখতে পারব।'

সিকান্দার ও আমিনা চট করে একবার দৃষ্টি বিনিময় করল।

রানা ভাবল, কী সিদ্ধান্ত হয়েছে তা কি ওদেরকে ব্যাখ্যা করে বলা দরকার? রাহাত খানকে ইংল্যান্ড থেকে কিডন্যাপ করা হয়েছে, এই রিপোর্ট দেশে পৌঁছানোর সঙ্গে সঙ্গে প্রধানমন্ত্রীর নির্দেশে সংশ্লিষ্ট মন্ত্রণালয়ের মন্ত্রী মহোদয় বিসিআই-এর প্রশাসনিক কর্মকর্তা আর প্রথম সারির এজেন্টদের সঙ্গে কয়েক দফা মীটিং করেছেন। বিসিআই আর রানা এজেন্সির কয়েকশো দুর্ধর্ষ এজেন্ট আর অপারেটর রাহাত খানকে উদ্ধার করবার জন্য প্রাণ দিতে এক পায়ে খাড়া হলেও, সর্বশেষ মীটিঙে সব দিক বিবেচনা করে সিদ্ধান্ত নেয়া হয়, সাজ-সাজ রব তুলে ছুটোছুটি করাটা হবে চরম বোকামি। সবাইকে ধৈর্য ধরতে হবে, এবং আস্থা রাখতে হবে এমআরনাইনের উপর। মীটিং চলবার সময়ই খবর আসে, ভারতীয় কর্তৃপক্ষ কনফারেন্স সংক্রান্ত কোন তথ্য প্রকাশ করতে রাজি নন। মীটিঙে আরও সিদ্ধান্ত হয়, এজেন্ট ও অপারেটররা যে যেখানে আছে সেখানেই থাকবে, তবে

মুহূর্তের নোটিশে দুনিয়ার যে-কোন জায়গায় পৌঁছানোর প্রস্তুতি নিয়ে রাখবে সবাই, এমআরনাইন ডাকলেই যাতে সাড়া দিতে পারে।

এ-সব রানা সোহেলের কাছ থেকে টেলিফোনে জেনেছে। ও ঠিক করল, এত কথা এদেরকে বলবার কোনও প্রয়োজন নেই।

'তাহলে, রানা, আমরা ক্লু পাব কোত্থেকে?' জিজ্ঞেস করল আমিনা।

'আমাদের ক্লু আবসালাম ইয়াহুদ। আমরা তাকে কোথায় খুঁজব?'

'আমার ধারণা হারবারে গেলে তার খোঁজ পাওয়া যাবে,' জবাব দিল সিকান্দার। 'এমনিতেও ওখানে একবার যেতে হবে আমাদের–রিফুয়েল দরকার, কারণ এটার রেঞ্জ তো দুশো মাইলের বেশি নয়; টাটকা কিছু ফল আর মাংসও কিনতে হবে।'

'হারবার আমাদের জন্যে নিরাপদ তো?' আমিনার চোখে-মুখে সংশয়ের ছায়া।

'বেশিক্ষণ না থাকলে মোটামুটি নিরাপদ।' গ্লাস খালি করে ইঞ্জিনরূমের দিকে চলে গেল সিকান্দার।

আমিনার দিকে তাকাল রানা। মেয়েটার পটলচেরা চোখ ক্লিওপেট্রার কথা মনে করিয়ে দেয়, কিন্তু দৃষ্টিতে কেমন যেন বিষণ্নতা। তার কাঁধে একটা হাত রাখল ও। 'কী হয়েছে, আমিনা?'

'না, কিছু না, শুধু মনটা আমার দমে গেছে। এত বড় একটা গুরুত্বপূর্ণ অপারেশন, অথচ ভেবে দেখো, কেমন বাজে এক লোককে সিকিউরিটির দায়িত্ব দেয়া হয়েছে। কী বিশাল দেশ ভারত, কোটি কোটি যোগ্য লোক দেশটাকে দ্রুত উন্নত বিশ্বের সারিতে তুলে নিয়ে যাচ্ছে। তাহলে? এরকম একটা উদ্ভট ব্যাপার ঘটল কী করে?'

'ব্যুরোক্র্যাসি আর রাজনৈতিক কারণে অযোগ্য লোক কীভাবে ওপরে উঠে আসে, এর ওপর তোমাকে আমি আস্ত একটা লেকচার শোনাতে পারি। তবে ভুলে যাও। মিস্টার সিকান্দার আর আমার ওপর ভরসা রাখো নিজের ওপরও। জেনারেল সিন্ধিয়া যা পারবেন না, আমরা তা করে দেখাব।'

রানার গা ঘেঁষে এল আমিনা। নিঃশব্দে হাসল রানা। ভারতের স্বার্থ ও সুনাম ভারতীয় একজন এজেন্টের সাহায্য নিয়ে রক্ষা করতে হবে ওকে, তাদের একজন সিকিউরিটি কর্মকর্তার আক্রোশমূলক শত্রুতাকে ব্যর্থ করে দিয়ে এসপিওনাজ জগতে এরকম কত বিচিত্র ঘটনাই না ঘটে! বস্ শুনে বলবেন–

ইঞ্জিন স্টার্ট নেয়ার শব্দ রানার চিন্তাধারাকে অন্যদিকে ঘুরিয়ে দিল।

ড্রাকোনিসি দ্বীপের মেইন হারবার–ছোট হলেও–দক্ষিণ ঈজিয়ান-এর সেরা বন্দরগুলোর অন্যতম। দক্ষিণা তুফান ছাড়া যে-কোনও আবহাওয়ায় নিরাপদ। বেশিরভাগ ভলক্যানিক আইল্যান্ড সাগর থেকে বড় বেশি খাড়া হয়ে উঠে এসেছে, ফলে অ্যাঙ্কারিজ ফ্যাসিলিটি পেতে খুব অসুবিধে হয়। সান্টোরিনি বে-র কথাই ধরা যাক, গভীরতা এক হাজার ফুটেরও বেশি, জাহাজের রশি হয় ডাঙার সঙ্গে বাঁধতে

হবে, নয়তো কোন এজমালি বয়ার সঙ্গে। কিন্তু ভ্রাকোনিসির বেলায় তা নয়। সেই কোন প্রাগৈতিহাসিক যুগে সাগরের তলায় ভূমিকম্প হওয়ায় দ্বীপটার উত্তর প্রান্তের অংশবিশেষ কাত হয়ে নেমে গেছে একটা ঢালের মত, তীর থেকে আশি গজ পর্যন্ত সরু একটা অগভীর ফালি। দুটো ছোট বাঁধ দিয়ে এলাকাটা ঘেরা, পশ্চিমেরটা প্রাচীন ভেনিশান যুগে তৈরি। রিফুয়েলিঙের পর এখানে নোঙর ফেলল অ্যাপড্।

উজ্জ্বল রোদ গায়ে নিয়ে বাঁধটার ওপর দাঁড়িয়ে রয়েছে রানা, অপেক্ষা করছে ওরা এসে কখন চারপাশে তাকাবে। বহু কিছু দেখবার আছে। ওর ডান পাশের বেসিন ছোট আকারের জলযানে ভর্তি: ইয়ট, ফিশিং বোট, ট্রান্সপোর্ট ভেসেল আর ত্রিশ-চল্লিশ ফুটী বোটের বিশাল এক বহর। ভ্রাকোনিসির প্রায় সবরকমের সাপ্লাই জলপথেই আসে। দ্বীপে রাস্তার সংখ্যা কম, মানও খারাপ, তাছাড়া বেশিরভাগ বাসযোগ্য স্থানে শুধু সাগরপথে পৌঁছানো যায়, তাই দ্বীপের লোকজন আসা-যাওয়ার জন্য ছোট বোটই ব্যবহার করে।

সামনে, পানির কিনারায়, এক সারিতে পাশাপাশি দাঁড়িয়ে রয়েছে অনেকগুলো দালান। কাছাকাছি প্রান্তে দেখা যাচ্ছে সাদা চুনকাম করা কটেজ, সবগুলোর দরজা আর শাটার নীল। তারপর একটা মুদি দোকান, হারবার অফিস আর সরাইখানা। কোথাও কোন নিওন সাইন বা গাড়ি নেই।

সিকান্দার আর আমিনা তীরে নামল, ওদেরকে নিয়ে কর্মচঞ্চল বন্দরে ঢুকে পড়ল রানা। আঁকাবাঁকা মেটো পথটা বন্দরের পিছন থেকে চোখ-ধাঁধানো সাদা শহরের দিকে চলে গেছে। ছড়ানো-ছিটানো বাড়িঘর নিয়ে আশ্চর্য একটা শহর এটা। ছ'টা ছোট চূড়ার সমষ্টি, চার কি পাঁচশো ফুট উঁচু, প্রতিটি দালান এগুলোর গায়ে বা মাথায়। একটা লাইমস্টোন চূড়া আর তার ঢাল বাদে সবখানে এবড়োখেবড়ো কালো লাভা আর হলুদ-সাদা ট্যুফা পাথরের স্তর চোখে পড়ছে। কালের বিবর্তনে পাথরের রঙ কোথাও লালচে, কোথাও বেগুনি বা সামুদ্রিক আগাছার মত সবুজাভ হয়ে উঠেছে। একবার দেখে ভ্রাকোনিসিকে ভোলা কঠিন। তবে সুন্দর না বলে অদ্ভুত বলাটাই যেন ঠিক, মানুষের বসবাস থাকলেও কোথায় যেন কী একটা অসঙ্গতি আছে।

দেরি করে লাঞ্চ খেতে বসল ওরা। প্রচুর লেমন-জুসের সঙ্গে ফিশ সুপ আর কোয়েল জাতীয় ছোট আকৃতির ছ'টা করে পাখির রোস্ট–বছরের এই সময় এগুলো গ্রিসের সব জায়গায় বন্দুক দিয়ে শিকার করা হয়। কফি খেতে রাজি হলো না, হারবার মাস্টারের অফিসে যেতে হবে বলে তাড়াতাড়ি চলে গেল সিকান্দার। অ্যাপডের কাগজ-পত্র জমা দিয়ে আইনের প্রতি শ্রদ্ধা জানানো তার একমাত্র উদ্দেশ্য নয়; বোঝা গেল, কান খোলা রাখবার পাশাপাশি দ্বীপের যেখান থেকে গল্প-গুজব ডানা মেলে, সেখানে বাছাই করা কিছু প্রশ্নও ছাড়বে।

এক ঘণ্টা পর ফিরে এল সিকান্দার। চোখ দুটো জ্বলজ্বল করছে। ঠোঁট শক্ত হয়ে চেপে আছে পরস্পরের সঙ্গে। একবার তাকালেই বলে দেয়া যায়, দুঃসংবাদ নিয়ে এসেছে।

ধপাস করে বসল সে, ভারী গলায় কফি চাইল; তারপর দুই হাতে টেবিলের

ওপর ভর দিয়ে সামনের দিকে ঝুঁকল। 'গুরুত্বপূর্ণ দুটো পয়েন্ট,' নিচু গলায় বলল সে। 'আমার ধারণা, আবসালাম ইয়াহুদকে আমি খুঁজে পেয়েছি।'

'কোথায়?'

'রহস্যময় একজন ডাচ, নিজের নাম বলছে বুলডারকোভ। মস্ত পণ্ডিত। ভ্রাকোনিসির বিচিত্র রক ফরমেশন স্টাডি করতে এসেছে। দ্বীপের পুব প্রান্তে একটা কটেজ ভাড়া নিয়েছে সে। সঙ্গে এক তরুণ আছে, সে-ও পাথর পরীক্ষা করতে এসেছে।'

'এতসব আপনি জানলেন কীভাবে?'

'মোটেও কষ্ট করতে হয়নি। ইয়াহুদ নিজেকে লুকিয়ে রাখার প্রায় কোন চেষ্টাই করছে না। দ্বীপের একমাত্র সরাইখানায় কাল সন্ধ্যায় ডিনার খেয়েছে সে। ধরেই নিয়েছে এখানে কেউ তাকে চিনবে না। না চিনবারই কথা, এদিকে আগে কখনও আসেনি সে। যাই হোক, কোন সন্দেহ নেই যে আমরা ভাগ্যের সহায়তা পাচ্ছি।'

এক সেকেন্ড ইতস্তত করে রানা বলল, 'কিন্তু এই লোকই যে ইয়াহুদ, আপনি শিওর হচ্ছেন কীভাবে?'

'তাহলে আপনাকে বলতে হয় লেবাননে কী ঘটেছিল।' হাসছে সিকান্দার। 'আপাতত শুধু শুনে রাখুন, বিশেষ একটা চিহ্ন আছে ইয়াহুদের। গুলি সে আমাকেই করেছিল, কিন্তু পিস্তলটা তার মুখের সামনে মিস ফায়ার করে। মাজল ফ্ল্যাশ মাথার ডান দিকটা পুড়িয়ে দেয়। কানের ক্ষতি হয়, ক্ষতি হয় আশপাশের চামড়ার, সেই সঙ্গে খুলির কিছুটা চুল চিরকালের জন্যে হারায়। এখানে বুলডারকোভ নামে যে ডাচ লোকটার কথা আলোচনা করছি আমরা, রক ফরমেশন স্টাডি করতে এসেছে, তার মাথা আর কানের ওই একই অবস্থা আর কিছু লাগে?'

'না, আমি সন্তুষ্ট।' শান্ত দেখালেও অকস্মাৎ সারা শরীরে উথলে ওঠা একটা উত্তেজনা অনুভব করছে রানা। অ্যাকশনের অভাব সারাটা দিন অস্থির করে রেখেছিল ওকে, সেই অস্থিরতা আরও প্রবল হয়েছে এই আশঙ্কায় যে কোন ধরনের অ্যাকশনে কাজ হবে তা হয়তো সময় মত জানা যাবে না। মনে এই ভয়ও জেগেছে, নির্বুদ্ধিতা আর আনাড়িপনার কারণে হয়তো তিনজনের বাহিনীটা আরও ছোট ও দুর্বল হয়ে আইলিটে অনুষ্ঠিতব্য আসন্ন ঘটনার রাতে নিশ্চিহ্ন হয়ে যাওয়াও বিচিত্র কিছু নয়। অ্যাপড় হয়তো ডুবে যাবে, একটা রাইফেল আর টমি গান মার্কিনিদের বিপুল ফায়ারপাওয়ারের বিরুদ্ধে কোন কাজেই আসবে না। গোপন একটা কনফারেন্সে আসা প্রতিনিধিদলকে পাইকারীভাবে যারা খুন করতে চাইছে তাদের ফায়ারপাওয়ার কী রকম হতে পারে আন্দাজ করা কঠিন কিছু নয়। এখন পরবর্তী পদক্ষেপ দেখতে পাচ্ছে ওরা। তবে তার আগে আরও একটা ব্যাপার পরিষ্কার হয়ে যাওয়ার দরকার। 'গুরুত্বপূর্ণ দ্বিতীয় পয়েন্টটা যেন কী?'

'ও, হ্যাঁ।' কফির কাপে শেষ চুমুক দিল সিকান্দার। 'হাসপাতাল কর্তৃপক্ষকে প্রশ্ন করতে যাওয়াটা অনর্থক। ব্যান্ডেজ বেঁধে দেয়ার একটু পরই আহত লোকটা ওখান থেকে পালিয়েছে। শহরের দিকে ফেরার পথে বাঁধের ওপর এক চাষীর

সঙ্গে তার দেখা হয়, চাষীকে দিয়ে সে তার জুতোর ফিতে বাঁধিয়ে নিয়েছে। চাষী তাকে গাধায় চড়িয়ে পৌঁছে দিতে চেয়েছিল, কিন্তু বলেছে হেঁটেই যেতে পারবে।'

'শহরে কেউ তাকে দেখেনি?' জিজ্ঞেস করল রানা।

'বহু লোক দেখেছে। অনেকেই বলেছে–থামো,' খানিক বিশ্রাম নিয়ে যাও। কিন্তু তাদের কথা শোনেনি সে। এ-নিয়ে সবাই আলোচনা করছে। বলছে, দোষটা আসলে চাষীর, তার উচিত ছিল লোকটাকে হাসপাতালে ফিরে যেতে বাধ্য করা।'

'সে এখন কোথায়?'

'সেটাই তো চিন্তার কথা, মিস্টার রানা। শেষবার তাকে পশ্চিম দিকে হাঁটতে দেখা গেছে। যেখানে এশিয়ানরা কনফারেন্সে বসতে যাচ্ছে–আইলিটে। আবসালাম ইয়াহুদের হাইড-আউটের উল্টোদিকে। এখন বলুন, এ থেকে কী বুঝছেন আপনি?'

'দুটো গোপন আস্তানা,' বলল রানা, টেবিলের কাটাকুটি দাগগুলোর দিকে একদৃষ্টে তাকিয়ে আছে। স্মৃতিতে কী যেন একটা নড়ছে, নিস্তেজ ভঙ্গিতে চেষ্টা করছে চৈতন্যের চৌকাঠে পৌঁছাতে। ছোট্ট একটা ব্যাপার, সম্প্রতি ঘটেছে। জোর করে মনে করবার চেষ্টা সফল হবে না, জানে ও। বরং সরিয়ে দিতে চাইলে চৌকাঠ পেরুবার দ্বিগুণ প্রয়াস চালাবে ওটা। মুখ তুলে সিকান্দারের দিকে তাকাল ও। 'দুই আস্তানার শক্তি এক হবে। আজ রাতে; কারণ ওদের হাতে এর বেশি আর দেরি করবার সময় নেই। মূল অপারেশন চালানো হবে, ধরে নিচ্ছি, দ্বীপের পশ্চিম দিক থেকে–অর্থাৎ তৎপর হতে হবে ইয়াহুদকে। প্রশ্ন হলো, তার মুভটা কী হবে? যে বাড়িটা সে ভাড়া নিয়েছে, মিস্টার সিকান্দার, ওটায় পৌঁছাবার কোন রাস্তা বা পথ আছে, নাকি শুধু বোট নিয়ে যাওয়া যায়?'

'বাড়িটার ওপর দিকে, কিছু জমিতে আঙুরের চাষ হয়, কিন্তু ওগুলোয় পৌঁছাতে হলে পাহাড়-প্রাচীর বেয়ে উঠতে হবে আপনাকে। অসম্ভব নয়, তবে অত্যন্ত কঠিন। ওটার কথা আমরা বাদ দিতে পারি। ইয়াহুদ জলপথেই মুভ করবে।'

'কাজেই আমরা অ্যাপড় থেকে জায়গাটার ওপর নজর রাখব,' বলল আমিনা। 'তারপর বেরিয়ে এলেই ফলো করব।'

মাথা নাড়ল সিকান্দার। 'তাতে ঝুঁকি আছে, বেটি। খুব জটিলও। আমরা তাকে দেখতে পাবার মত কাছে থাকলে সে-ও আমাদেরকে দেখতে পাবে। এর কোন সমাধান আমার জানা নেই। আমরা এমন একটা পার্টি, স্রেফ ঘটনাচক্রে ওই সময় ওখান দিয়ে যাচ্ছি? সেক্ষেত্রে আমরা চলে না যাওয়া পর্যন্ত অপেক্ষা করবে সে। সত্যি খুব জটিল।'

'কেন, আমরা যদি সব আলো নিভিয়ে রাখি?'

'আকাশের চাঁদটাকে কীভাবে নেভাবে?'

'আমি তাকে দেখেছি!' হঠাৎ বলল রানা। দু'জনেই ওর দিকে তাকাল। 'আবসালাম ইয়াহুদকে নয়, হাসপাতাল থেকে চলে আসা লোকটাকে। আজ সকালে, আমিনা। আমরা যখন তোমার ফেরার অপেক্ষায় ছিলাম। লোকটা

পাহাড়ের ঢাল বেয়ে আড়ষ্ট ভঙ্গিতে নামছিল, মনে হলো আহত। যেখানে দেখলাম সেখান থেকে ওদিকের তীর বরাবর পাঁচ-সাতটা বাড়িতে পৌঁছানো যায়। তবে এলাকাটা এখন আমরা চিনি।'

'কি করে বুঝছেন এ সে-ই?' জানতে চাইল সিকান্দার।

'আহত বা পঙ্গু একজন লোক ওরকম অমানুষিক কষ্ট করে কেন ঢাল বেয়ে নামতে যাবে ওদিকে? এ সেই লোক না হয়ে যায় না–প্রভুদের কাছে রিপোর্ট করতে যাচ্ছিল।'

'কিন্তু ওটা তো উত্তর তীর।' সিকান্দার এখনও সন্তুষ্ট হতে পারছে না। 'ওখান থেকে আপনি এমন কী আইলিটটাও দেখতে পাবেন না।'

'ওরাও আমাকে দেখতে পাবে না। এটা একটা ধাঁধার মত, এই পর্যায়ে বুঝতে পারার আশা না করাই ভাল। আমরা শুধু এটুকু জেনেছি–এরপর কী করতে হবে।'

'কি করতে হবে, এটা আপনাকে আমি একটু পর জিজ্ঞেস করব। তার আগে আপনি আমাকে একটা ধাঁধার জবাব দেবেন?'

'কি ধাঁধা?'

'গণহত্যা, কনফারেন্স বানচাল, এ-সব করতে চাইছে সিআইএ, তাই না? ইয়াহুদ তাহলে এখানে কেন? সে তো মোসাদ এজেন্ট।'

'আমেরিকা থেকে গ্রিস চার হাজার মাইল দূরে। আর গ্রিস থেকে ইজরায়েলের দূরত্ব মাত্র কয়েকশো মাইল–ফাইটার প্লেন আর হেলিকপ্টার গানশিপ তেলআবিব থেকে ভ্রাকোনিসিতে পাঠানো খুব সহজ। আর সহজ বলেই ইতোমধ্যে টার্কির একটা দ্বীপে সব নিয়ে এসে সামরিক মহড়ার আয়োজন করছে। মোসাদের উপস্থিতির আরও বড় কারণ সম্ভবত, ওরা এ-ধরনের হামলা চালিয়ে অভ্যস্ত, অভিযোগ প্রমাণিত হলেও ওদের বিরুদ্ধে জাতিসংঘ কোন ব্যবস্থা নিতে পারে না, আমেরিকা ভেটো দেয় বলে।'

'আপনি বলতে চাইছেন, অপরাধটা আমেরিকা করবে, কিন্তু জানাজানি হয়ে গেলে দোষ চাপবে ইজরায়েলের ঘাড়ে?' এক মুহূর্ত বিস্ময়ে হাঁ হয়ে থাকবার পর জিজ্ঞেস করল সিকান্দার। 'মোসাদের সঙ্গে এরকম একটা চুক্তিতে এসেছে সিআইএ?'

মাথা ঝাঁকাল রানা। 'আমার তাই বিশ্বাস।'

'কি ভয়ঙ্কর!'

'হ্যাঁ। তবে যতই মহড়ার আয়োজন করুক, বাধ্য না হলে সামরিক হামলার ঝুঁকি ওরা নেবে না। কারণ ওদের উদ্দেশ্য হলো, নিজেদের অপরাধ বাংলাদেশের ঘাড়ে চাপানো। সামরিক হামলা হলে সেটাকে বাংলাদেশের বলে চালানো সম্ভব নয়।'

'তাহলে তাড়াতাড়ি বলুন, কী করতে হবে।'

'অ্যাপডে ফিরে গিয়ে এখনি আমরা রওনা হব,' বলল রানা। 'তীরের ওদিকটা পার হয়ে নিরাপদ দূরত্বে পৌঁছতে চেষ্টা করব, তারপর একটা আড়াল পেলে...'

সিকান্দারের চোখ-মুখ বদলে গেল, সারা শরীর হঠাৎ কাঠ। রানার কনুইয়ের ওপর তার ভারী হাত পড়ল। কথা বলল এমন সুরে, কেউ যেন গলা টিপে ধরেছে। 'আমি ওকে দেখতে…ও এখানে! আবসালাম ইয়াহুদ। আপনার বাম দিকে, মিস্টার রানা। মুদি দোকান থেকে বেরুচ্ছে। গাল আর খুলির কারণেই লোকজন তাকিয়ে আছে।'

স্বাভাবিক ভঙ্গিতে ঘাড় ফিরিয়ে তাকাতে মাত্র বিশ গজ দূরে লোকটাকে দেখতে পেল রানা। পরনে স্পোর্টস শার্ট আর শর্টস, হাতে ঢাউস এক শপিং ব্যাগ, কাঁধের ওপর দিয়ে পিছন দিকে তাকিয়ে মুদিঅলার কী একটা রসিকতায় হাসছে। তার সঙ্গীর মাথায় সোনালি চুল, বয়স হবে বাইশ-তেইশ, হাতে ওয়াইনের একটা জার, মুচকি-মুচকি হাসছে সে-ও। দু'জনের চেষ্টায় তৈরি পরিবেশটায় ছুটির আমেজ, নির্মল আনন্দ আর ভালমানুষি সুন্দর ফুটেছে। এরপর রানার দিকে মুখ করল ইয়াহুদ। দেখা গেল কানের চারপাশে বিবর্ণ চামড়া, প্রায় লাল ও মসৃণ, খুলির এক দিকটায় কোন চুল নেই। হাসি-ঠাট্টায় মুখর, সঙ্গী তরুণকে নিয়ে ঘুরল ইয়াহুদ, জেটি ধরে চলে গেল।

'আস্তানায় ফিরছে,' বলল সিকান্দার। 'একটু হেঁটে আমি শুধু ওদের বোটটা দেখে আসি। পরে কাজে লাগবে।'

সিকান্দার চলে গেল। একটু পর আমিনা বলল, 'রানা, সিকান্দার চাচার ধাঁধার যে উত্তর তোমার মুখে শুনলাম তাতে আমার একটা প্রশ্নের জবাব নেই।'

'তোমার আবার কী প্রশ্ন?'

'প্রশ্ন তো অনেকই। তবে এখন যেটা জানতে চাইছি: সিআইএ মোসাদের সাহায্য নিচ্ছে ভাল কথা, কিন্তু এত থাকতে এরকম দাগী একজন লোককে কেন ডেকেছে ওরা? দেখামাত্র অনেকেই তাকে চিনে ফেলতে পারে। লোকটার কী এমন বৈশিষ্ট্য যে তাকে ছাড়া ওদের চলবে না?'

'এই প্রশ্নের উত্তর তোমার জানাই আছে।'

'মানে?'

'তুমিই আমাকে বলেছ, ইয়াহুদ ফিজিক্স নিয়ে পড়াশোনা করেছে। আবার আর্মিতেও ছিল।'

আমিনাকে চিন্তিত দেখাচ্ছে। 'তারমানে…নাহ্, তা কী করে হয়! তুমি…ব্যাপারটা অসম্ভব নয়?'

'কোনটা অসম্ভব?'

'তুমি ধারণা করছ ইজরায়েলের পারমাণবিক প্রোগ্রামে কাজ করেছে ইয়াহুদ, আমেরিকার অনুরোধে এখানে তাকে একটা ছোটখাট অ্যাটম বোমা দিয়ে পাঠানো হয়েছে কনফারেন্স চলার সময় আইলিটের বাড়িটা উড়িয়ে দেয়ার জন্যে?'

'হ্যাঁ এরকম চিন্তাও করছি আমি।'

'কিন্তু অ্যাটম বোমা ছুঁড়তে হলে তো মিসাইল লাগবে। ওরকম খাড়া ঢাল বেয়ে তুলবে কীভাবে? এই দ্বীপে সেটা আনলই বা কীভাবে, আদৌ যদি এনে থাকে?'

'আমি খুব ছোট, খুদে আণবিক বোমার কথা ভাবছি।' রানা গম্ভীর। 'ক্লোজ-সাপোর্ট টাইপ। ওগুলো সহজেই বহন করা যায়। এই মুহূর্তে অন্য কোন বিকল্প আমার মাথায় ধরা দিচ্ছে না।'

'আমার যুক্তি অন্য কথা বলে। ওরা কনভেনশনাল কিছু ব্যবহার করবে। সাগর থেকে নয়, বরং জমি থেকে।'

সেকান্দার না ফেরা পর্যন্ত আর কোন কথা হলো না।

'বড়সড় একটা ডিঙ্গি বলা যায়,' রিপোর্ট করল সে। 'আউটবোর্ড মোটর। রওনা হচ্ছে ওরা। আমরা পাঁচ মিনিট পর উঠি।'

'এই সুযোগে একটা বিষয়ে আলাপ হওয়া দরকার,' বলল রানা। 'জুলহাস।'

'ডোগো? তাকে নিয়ে কী আলাপ?'

'ওকে ওর পাওনা মিটিয়ে দিয়ে এখনই তো বিদায় করে দেয়া উচিত, তাই না? এরপর আর সুযোগ পাচ্ছি কোথায়?'

সিকান্দার এক মুহূর্ত চিন্তা করল। 'জানি, সেরকমই কথা ছিল। কিন্তু কথা যাই থাক, বর্তমান পরিস্থিতিতে কি ওকে বিদায় করে দেয়াটা ঠিক হবে? ছুরিতে খুব দক্ষ সে। বোটের সব কাজও ভাল পারে। কঠিন বিপদে নিজের ওপর থেকে নিয়ন্ত্রণ হারায় না।'

'দেখুন, মিস্টার সিকান্দার,' লম্বা-চওড়া দৈত্যাকার বুড়োর দিকে পুরোপুরি ঘুরে বসল রানা। 'ডোগোকে চলে যেতে হবে। এখনই। ও স্রেফ বাচ্চা ছেলে। একটা পরিবারের সদস্য। ভাল-মন্দ কিছু হয়ে গেলে ওর মা-বাবাকে কী জবাব দেবেন? তাছাড়া, শারীরিক ক্ষতিই শুধু ক্ষতি নয়, ক্ষতি আরও অনেক রকমের হয়। এই ট্রিপে ইতিমধ্যে তা যথেষ্ট হয়েছে ডোগোর।'

সিকান্দারকে অনুতপ্ত মনে হচ্ছে। 'এদিকটা আমি ভাল করে ভেবে দেখিনি। আপনি ঠিকই বলেছেন। এক পরিচিত লোককে দেখে এলাম, সে আজ সন্ধের দিকে পিরিয়াসে ফিরে যাবে–দেখি, পারি তো তার সঙ্গেই ডোগোকে পাঠিয়ে দেব।'

দশ মিনিট পর। সবার সঙ্গে হ্যান্ডশেক করে অ্যাপড় থেকে নেমে গেল ডোগো। জেটি ত্যাগ করে ক্রমশ দূরে সরে আসছে অ্যাপড়। রানার চোখ এই মুহূর্তে ক্যামেরার কাজ করছে, নিজের চারপাশের সমস্ত কিছু, খুঁটিনাটি সহ, রেকর্ড করে রাখছে মগজে।

পিছনে পড়ে থাকল হারবার; শয়ে শয়ে পাল, মাস্তুল, বিভিন্ন দেশের পতাকা; এ-সবের মাথার ওপর ভ্রাকোনিসি, গম্ভীর ও কঠিনদর্শন পাথরের রাজ্য, কয়েক কোটি বছরের প্রাচীন। রানার ডান দিকে হুইলে রয়েছে সিকান্দার, গাঢ় চোখ সরু হয়ে আছে, তামাটে লোমশ হাত বো-কে স্টারবোর্ডের দিকে ঘোরাচ্ছে। ওর বাঁয়ে আমিনা যেন মার্বেল পাথরের নারীমূর্তি, সান্ধ্য বাতাসে উড়ছে রেশমি চুল। আর সামনে প্রকাণ্ড একটা আলোকিত কমলার মত অস্ত যাচ্ছে সূর্য–ডুব দেবে যেন তরল পারদের মধ্যে।

চার

সাগর থেকে দুশো ফুট ওপরে জোছনাস্নাত পাহাড়ের ঢালে বসে রয়েছে রানা। গ্র্যানিট পাথরের টুকরোটা মাঝারি আকারের একটা হাতির সমান, ফুটফুটে জোছনার মধ্যে ছায়া তো দিচ্ছেই, হেলান দেয়ার কাজেও লাগছে। অবজারভেশন পোস্ট হিসেবে জায়গাটা আদর্শ না হলেও, দিনের আলো ফুরিয়ে যাবার ঠিক আগে অ্যাপডের ডেক থেকে দ্রুত চোখ বুলিয়ে এটাকেই মন্দের ভাল বলে মনে হয়েছিল।

ছড়ানো-ছিটানো যে পাঁচটা বাড়িকে শত্রুপক্ষের সম্ভাব্য হেডকোয়ার্টার বলে মনে করা হয়েছিল, সেগুলোর প্রায় মাঝামাঝি জায়গায় রয়েছে রানা। দুটো বাড়ি সরাসরি দেখতে পাচ্ছে। তৃতীয়টা দেখতে পাবার সম্ভাবনা আছে বাম দিকে পঞ্চাশ ফুট সরে গেলে। চতুর্থ ও পঞ্চম বাড়িটা দেখতে পাবে না, তবে পরিষ্কার ধারণা আছে ওগুলো ঠিক কোথায়, ফলে ইয়াহুদের বোট ওর চোখকে ফাঁকি দিয়ে সেদিকে যেতে পারবে না, এমন কী আলো নিভিয়ে এলেও।

এই মুহূর্তে সব শান্ত ও স্বাভাবিক। বোট নিয়ে পাহাড়-প্রাচীর ঘেঁষে এগোবার সময় বিলিয়ার্ড-বোর্ড আকৃতির একটা খুদে সৈকত দেখতে পেয়েছিল ওরা, খাড়া ঢাল বেয়ে ওপরে উঠবার জন্যে প্রকৃতির তৈরি একটা স্টার্টিং পয়েন্ট বা প্ল্যাটফর্ম বলা যেতে পারে। রানার সঙ্গে প্রচুর তর্ক করবার পর অবশেষে ওই সৈকত থেকে চারপাশে নজর রাখতে রাজি হয়েছে সিকান্দার। পানিতে নেমে আসা পাথরের লম্বা একটা বাহুর আড়ালে ছোট্ট ডিঙিটা লুকিয়ে রেখেছে ওরা, রাতের বেলা সাগরের দিক থেকে দেখতে পাবে না কেউ। বিদ্রোহের ভাব সিকান্দারের চেয়ে অনেক বেশি হওয়ায় আমিনাকে অ্যাপডে থাকতে রাজি করতে হিমশিম খেতে হয়েছে রানাকে। উত্তর উপকূলে রয়েছে সে, মাইল দেড়েক দূরে, জেলেদের একটা জেটির সঙ্গে রশি দিয়ে বাঁধা বোট নিয়ে। পাশেই তাদের গ্রাম, জেটিতে একই রকম দেখতে আরও অনেক বোট আছে। এদিকে এরচেয়ে ভাল ক্যামোফ্লাজ আশা করা বোকামি।

নিস্তব্ধতা ভারী ও ভরাট হলেও, পুরোপুরি অটুট নয়। প্রায় ঘণ্টাখানেক আগে কাছাকাছি একটা বাড়ি থেকে টিভি বা রেডিওতে গান বাজছিল। এই গান রানার পরিচিত নয়, অর্থাৎ কথাগুলোর অর্থ ওর জানা নেই, তবে এ-ধরনের সুর ছন্দ, আর যন্ত্রসঙ্গীত সম্পর্কে ওর ধারণা আছে। আরব, তুরকি আর স্লাভ মিউজিকের সংমিশ্রণ। নারীকণ্ঠের সুরে প্রথমে থাকল আক্ষেপ, তারপর ফুটল বিষণ্ণতা, সবশেষে যৌনাবেদন। গান থেমে যাবার পর বাড়িটার সব আলো নিভে গেছে। তবে ওটার পাশের বাড়ির আলো এখনও জ্বলছে, খোলা জানালা দিয়ে মাঝেমধ্যে ভেসে আসছে টুকরো দু'একটা কথা বা হাসির শব্দ এক কি দু'বার মাথার ওপরে

ঝুঁকে থাকা পাহাড়চূড়ায় ডানা ঝাপটানোর শব্দ হয়েছে, তারপর বুকের রক্ত ছলকে দিয়ে ডেকে উঠেছে একটা পেঁচা। সবশেষে, এই খানিক আগে, কত দূরে আন্দাজ করা কঠিন—ছাগলের গলায় বাঁধা ঘন্টীর টুং-টুং শোনা গেছে কি যায়নি। ব্যস, আর কিছু নয়।

কব্জির রোলেক্সে আলো জ্বেলে ডায়ালে চোখ বুলাল রানা। রাত তিনটে বেজে দশ মিনিট। ওর মনে কোন সন্দেহ নেই যে ইয়াহুদ আসবে। কখন আসবে সেটা অবশ্য অন্য প্রশ্ন। ভোরের প্রথম আলোয় আসা বেশি সুবিধে, তবে অন্য যে-কোন সময়ে আসার সম্ভাবনা উড়িয়ে দেয়া যাবে না—এমন কী সকালবেলা সবার চোখের সামনে দিয়েও আসতে পারে, ইয়াহুদ আর তার তরুণ সঙ্গীকে হাউস গেস্ট হিসেবে অভ্যর্থনা জানানো হবে।

শত্রুরা কোথায় আসছে বা জড়ো হচ্ছে জানবার পর অ্যাকশন না নিয়ে অপেক্ষা করাটা ভয়ানক এক মানসিক অস্থিরতার জন্ম দেয়; কিন্তু এই অপারেশনে প্রথম থেকেই রানা চেয়েছে, সদলবলে হোক বা একা, হঠাৎ কিছু করে বসা উচিত হবে না—তাতে হতচকিত শত্রু রাহাত খানকে মেরে ফেলতে পারে। এই অপারেশনে কৌশল অবলম্বন ও গোপনীয়তা রক্ষার কোন বিকল্প নেই। তাছাড়া, হঠাৎ করে কিছু করলেই কি বসকে উদ্ধার করতে পারবে ও? ও কি জানে তিনি কোথায়?

রানা শুধু জানে, অপারেশনটা সময়ের সঙ্গে সঙ্গে পিচ্ছিল একটা ঢালের মত হয়ে উঠছে, এখানে শুধু ভুল একটা পদক্ষেপই নয়, লে-আউট সম্পর্কে সূক্ষ্ম কোন হিসেবের গোলমালও অপূরণীয় ক্ষতি ডেকে আনতে পারে

এই সময় বোটের আওয়াজ পেল ও।

পশ্চিম দিক থেকে আসছে, আসছে যেদিকে আইলিটটা আছে সেদিকের বাঁক ঘুরে। দু'মিনিট পর ইঞ্জিনের অস্পষ্ট আওয়াজ তুলে দৃষ্টিপথে চলে এল, নেভিগেশন লাইট ছাড়াও সামনে সাদা একটা নিষ্প্রভ আলো জ্বলছে। ধনুকের মত বাঁকা পথটুকু ঘোরা শেষ করে তীরের সঙ্গে সমান্তরাল রেখা ধরে প্রায় সিকি মাইল এগোল, তারপর দিক বদলে রানা নিজের পোস্ট থেকে যে দুটো বাড়ি দেখতে পাচ্ছে সেগুলোর একটার দিকে ঘুরে গেল।

বাড়িটার সব আলো এখনও জ্বলছে।

কোন লুকাচুরি নেই, না আছে ধোঁকা দেয়ার জন্যে মাত্রা ছাড়ানো হইচই। নিজের উদ্দেশে মাথা ঝাঁকিয়ে সিধে হলো রানা। ভাল করে দেখবার জন্যে নিচে নামতে হবে ওকে।

আড়াআড়ি এগিয়ে সময় বাঁচাচ্ছে রানা, যে পথ দিয়ে উঠেছে সেই পথ ধরেই নামছে—দুই প্রস্থ গ্র্যানিট পাঁচিলের মাঝখান দিয়ে। এটা আসলে দশ ফুট গভীর একটা শুকনো নালা। এরপর পেট-উঁচু বেঢপ বিস্তৃতি, যেন পাথরের তৈরি একটা জাহাজ, পেরুতে হলো ক্রল করে; ওখান থেকে লাফ দিয়ে আট ফুট নিচের মাটিতে; সামনে পড়ল খাদ, খাড়া গায়ে গর্ত আর ফাটল থাকায় নামতে সমস্যা হলো না—আকাশ ছোঁয়া পাহাড়চূড়া থেকে ওকে দেখা যাবে না

বড়সড় একটা ঝুল-পাথরের আড়াল থাকায়। যতটুকু নিচে নামলে ওর সমস্যার সমাধান হয় প্রথম দফায় তার অর্ধেক নামতে পেরেছে; কিন্তু একই সঙ্গে একশো গজের মত সরে এসেছে পুবদিকে। এখানে সহজ নাগালের মধ্যে পাওয়া গেল বাঁ-হাতি একটা বাঁক। বাঁকের পর প্রকৃতির তৈরি টেরেস, দৈর্ঘ্যে একটা ফুটবল মাঠের সমান, তীররেখার সঙ্গে ঠিক সমান্তরালভাবে এগিয়েছে; অর্ধেকটা ঝুল-পাথরের আড়াল পাচ্ছে, মেঝে সমতল। পায়ের নিচে নরম ঘাসের অস্তিত্ব টের পাচ্ছে রানা, যেন একটা গলফ-কোর্সের ওপর দিয়ে হাঁটছে ও। সানিংডেল-এ কবে ছিল ও? মঙ্গলবার সন্ধ্যায়। এখন শুক্রবার রাত, বলা উচিত শনিবার ভোর। উৎকণ্ঠাময় আর উত্তেজনায় ঠাসা তিনটে দিন।

ডানদিকে, যেখানে জমিন ঢালু হতে শুরু করেছে, হাঁটু গেড়ে নিচের দিকে তাকাল রানা। স্পীড কমিয়ে এগিয়ে আসছে বোটটা। একটা অ্যাঙ্কারিজের অংশবিশেষ দেখা গেলেও, বাড়িটা কিন্তু আড়ালে পড়ে গেছে। তির্যক পথ ধরে আরও খানিকটা নিচে না নামলে চলছে না। টেরেসসদৃশ পাথুরে ফরমেশন-এর দিকে ফিরছে ও, মাথা ও কাঁধ নিচু করে কাঁটা ঝোপের আড়াল নিচ্ছে। সামনে পড়ল চাঁদের আলোয় ধোয়া সাদাটে পাথরের ঢাল, ঢালে ছড়িয়ে আছে আলগা নুড়ি পাথর, একদম নিচে সরু একটা নালার মুখ। ঘুরপথে এগোবার সময় নেই হাতে। আড়ালবিহীন ঢাল বেয়ে ধীর গতিতে নামতে শুরু করল রানা, চোখ পায়ের সামনে। এদিকে তাকিয়ে থাকলে তবেই কেউ ওকে দেখতে পাবে: পায়ের ধাক্কায় একটা নুড়ি পাথর গড়াতে শুরু করলে সে-ই শুনতে পাবে যে কিছু শুনতে পাবার আশায় কান খাড়া করে আছে।

বোটের ইঞ্জিন থেমে গেছে। লোকজনের আওয়াজ পাচ্ছে ও। দম আটকে শুনছে রানা, কারণ ওদের কণ্ঠস্বরে আকস্মিক উত্তেজনা থাকলে, মনে করতে হবে ওর উপস্থিতি টের পেয়ে গেছে ওরা। কিন্তু না, কথাবার্তার গুঞ্জনে সুরের কোন পরিবর্তন ঘটছে না।

নালাটায় পৌছাল রানা। আসলে গ্র্যানিটে একটা ফাটল, এঁকেবেঁকে এগিয়েছে, নেমে গেছে বাড়িটার দিকে। মেঝে উঁচু-নিচু নয়, লম্বা ঘাস জন্মেছে। দু'বার থেমে দু'হাত দিয়ে ঝোপ সরাতে হলো, গোটা পথ বন্ধ করে রেখেছে। এরপর নালা মোচড় খেয়েছে বাঁ দিকে, ফলে দু'পাশের পাঁচিল ঝুঁকে পড়েছে পরস্পরের দিকে। জায়গাটা ক্রল করে পেরুতে হলো রানাকে, অবশ্য মাত্র গজ পাঁচেক। এরপর হঠাৎ খুব ঢালু হয়ে সাগরের দিকটায় নেমে গেছে মেঝে। আরেকটা বাঁক। ব্যস, পৌঁছে গেল ও; এত কাছে যে বিপজ্জনক না বলে উপায় নেই।

প্রথমে দরকার আড়াল। নালার ঠোঁটে ঝুলে রয়েছে তেকোনা একটা বোল্ডার, ওজন হবে কম করেও দুশো মন, যেন গতকালই খসে পড়েছে এখানে। আসলে হয়তো ভ্রাকোনিসি কোন ম্যাপে স্থান পাবার আগে থেকে এভাবেই ঝুলে আছে ওটা।

বাড়িটার কাছাকাছি অংশ এখান থেকে ত্রিশ গজেরও কম দূরে। ওটার

সমতল ছাদের সঙ্গে একই লেভেলে গুড়ি মেরে বসে রয়েছে রানা। তবে বাড়িটা নিয়ে পরে মাথা ঘামালেও চলবে। ওখান থেকে একটু দূরে, প্রায় নব্বুই ডিগ্রি কোণে, ছোটখাট একটা পাথুরে জেটিতে নামছে ইয়াহুদ। ডান কানের ওপর চামড়ার মসৃণ চকচকে ভাবটুকু ধরা পড়ল রানার চোখে। বেঁটে, চওড়া ও শক্তিশালী এক লোক, মাথাটা গোল, বোটের বো বাঁধছিল–এই মুহূর্তে ওপরে উঠে সোনালি চুল সহকারীকে বোঝা বইতে সাহায্য করছে। বোঝা বলতে ক্যানভাসের তৈরি অত্যন্ত ভারী তিনটে ব্যাগ। দু'জন ধরাধরি করে তীরে নামাল ওগুলো। গলাটা রানা সারস পাখির মত যতটা সম্ভব সামনে লম্বা করতে চাইছে। ব্যাগ তিনটে বেঢপ ভাবে ফুলে আছে, খুবই সন্দেহজনক আকৃতি। অ্যাসেম্বল না করা কোন ধরনের মিসাইল লঞ্চার নাকি? ওটার পিছু নিয়ে তীরে পৌঁছাল বিশটার মত বাক্স, একেকটা পাঁচ কি ছয় ফুট লম্বা, ফুটখানেক উঁচু, ফুটখানেক চওড়া। বোটে মাত্র একটা বালব জ্বলছে, অপরটা জ্বলছে বাড়িটার কোণে ব্র্যাকেটের ভেতর, ফলে আলো খুব বেশি নয়, তারপরও ধাতব বাক্সগুলোকে গাঢ় রঙ করা বলে মনে হলো। ওগুলোও যেন আকারের তুলনায় অনেক বেশি ভারী। এরপর দেখা গেল প্লাস্টিক মোড়া একজোড়া সুটকেস। মাল খালাস করবার কাজ পুরোপুরি নিঃশব্দে সারা হলো। তারপর, এতক্ষণে একটা কণ্ঠস্বর শোনা গেল।

যে-ই কথা বলুক, সে বাড়ির সামনের দিকে কোথাও আছে, রানার পজিশন থেকে তাকে দেখা যাচ্ছে না। গলার আওয়াজ চড়া, তবে সুরটা স্বাভাবিক আলাপের–যেন এখানে গোপন কোন কাজ করা হচ্ছে না, পরিবেশে এতটুকু চাঞ্চল্য বা উত্তেজনা নেই। লোকটা ইয়াহুদকে 'বুলডারকোভ' নামে সম্বোধন করল, সম্মানিত অতিথি হিসেবে সাদর অভ্যর্থনা জানাল। পরিষ্কার ইংরেজি বলছে, তবে মার্কিন বাচনভঙ্গি স্পষ্ট। রানা প্রায় নিশ্চিত, এ লোক সিআইএ-র কোন কর্মকর্তা–সম্ভবত এই অপারেশনের লীডার। ধৈর্য ধরে অপেক্ষায় থাকল ও, একবার যদি চেহারাটা দেখা যায়।

বোঝা গেল, এখন অন্তত সুযোগটা রানা পাচ্ছে না। আবসালাম ইয়াহুদ ওরফে বুলডারকোভ, উষ্ণ অভ্যর্থনার জবাবে উচ্ছ্বসিত আনন্দে মুখর হয়ে বাড়িটার সামনে দিয়ে এগোল, দৃষ্টিপথের বাইরে হারিয়ে যাবার ঠিক আগে হ্যান্ডশেকের জন্যে বাড়িয়ে দিল ডান হাতটা।

কথাবার্তা আরও হলো, সেই সঙ্গে কিছু হাসাহাসিও, তবে সবই অস্পষ্ট হতে হতে মিলিয়ে গেল–বাড়ির ভেতর ঢুকে পড়েছে ওরা। বেঁটে, শক্ত-সমর্থ লোকটা আর ইয়াহুদের সহকারী ক্যানভাসের ব্যাগগুলো প্রতিবার একটা ধরাধরি করে রানার লুকানোর জায়গাটাকে পাশ কাটিয়ে বাড়ির পাশের দরজা দিয়ে ভেতরে রেখে এল। পুরো কাজটা শেষ করতে প্রচুর সময় নিল তারা। ব্যাগগুলো বয়ে নিয়ে যাবার সময় দু'জনের হাতের পেশী থরথর করে কাঁপছে, পরিষ্কার না দেখেও আন্দাজ করতে রানার কোন অসুবিধে হলো না। ইস্পাতের বাক্সগুলোও অসম্ভব ভারী, প্রতিটি বয়ে নিয়ে যাবার সময় কুঁজো হয়ে গেল দু'জনে। কাজটা

শেষ করবার আগে বার কয়েক বিশ্রাম নিতে হলো। সবশেষে সুটকেস দুটো নিয়ে বাড়িতে ঢোকবার পর আর বেরুল না। আজকের মত এটাই শেষবার, এরকম ভাব নিয়ে দরজাটা বন্ধ হয়ে গেল। বাড়ির যে অংশটা রানা দেখতে পাচ্ছে, সেটুকুর সব আলো নিভে গেল। এরপর নীরবতা; মাঝে-মধ্যে শুধু অস্পষ্ট দু'একটা কথা আর জেটিতে বাঁধা বোটের খোলে ঢেউ আছড়ানোর শব্দ শোনা যাচ্ছে।

অন্ধকারে আকাশ ছুঁতে চাওয়ার ভঙ্গিতে পূর্ণদৈর্ঘ্য আড়মোড়া ভাঙল রানা। বোটে ভুলে কিছু ফেলে গেছে, মনে পড়ে যাওয়ায় কেউ নিতে আসবে, এই আশায় অপেক্ষা করবার প্রস্তুতি নিল ও। গণহত্যা চালানোর উপযোগী অস্ত্র আর গোলাবারুদ আসতে দেখেছে, এটা বিশ্বাস করতে পারছে এখন। ব্যাগগুলোয় রয়েছে খোলা অবস্থায় লঞ্চিং মেশিনারি। তিনটে ব্যাগ, প্রচুর পার্টস-জোড়া লাগালে শুধু একটা ছোট আকৃতির রকেট লঞ্চার তৈরি করা যাবে, এটা বিশ্বাস হয় না। এই ধাঁধার উত্তর পাওয়া যেতে পারে ইস্পাতের বাক্সগুলোয়। ছয় কি সাত ফুট লম্বা মিসাইল? ক্রুজ মিসাইলের ক্ষুদ্র সংস্করণ? ক্রুজ সাধারণত নিউক্লিয়ার ওঅরহেড বহন করে। তাই বলে এতগুলো-বিশটা? না। আবার হ্যাঁ-ও। ক্রুজের উনিশটা সংস্করণে হয়তো কনভেনশন্যাল বোমা আছে। বাকি একটায় আছে অতি অল্প শক্তির নিউক্লিয়ার ওঅরহেড।

হাসি পেলেও রানা হাসল না তবে বুঝতে পারছে যে ওর চিন্তা-ভাবনা ঠিক পথে এগোচ্ছে না।

একটু অপ্রাসঙ্গিক হলেও, গোড়া থেকে শুরু করল ও। সাউথ-এশিয়া ইউনিয়ন গঠিত হোক, এটা আমেরিকা দেখতে চায় না বলে খসড়া চুক্তি স্বাক্ষরের অনুষ্ঠানে আসা ডেলিগেটদের মেরে ফেলবে সিআইএ, তারপর সেই গণহত্যার দায় চাপাবে বিসিআই তথা বাংলাদেশের ওপর। কেন? ধরা যাক গ্যাস বেচেনি, ইরাকে সৈন্য পাঠায়নি, একের পর এক চুক্তি স্বাক্ষরে অনীহা প্রকাশ করেছে ইত্যাদি কারণে বেশ। কিন্তু তাহলে মানুষগুলোকে মারবার জন্যে নিউক্লিয়ার ওঅরহেড ব্যবহার করবার অনুমতি সিআইএ চাইবেই বা কেন, পেন্টাগন তা দেবেই বা কেন? বাংলাদেশের কাছে কি ওই জিনিস আছে?

আইলিটের বাড়িটার পাঁচিল ও দেয়াল শক্ত পাথরের তৈরি। কিন্তু আকারে ছোট হলেও আমেরিকার কাছে এমন শক্তিশালী সারফেস-টু-সারফেস মিসাইল আছে যে পাথর, কংক্রিট, এমনকি ইস্পাত ভেদ করে পঞ্চাশ-ষাট ফুট গভীরে গিয়ে বিস্ফোরিত হবে বাক্সগুলোয় সে-ধরনের মিসাইল থাকলে বাড়িটা স্রেফ ধুলো হয়ে বাতাসের সঙ্গে উড়ে যাবে।

কিংবা এ-সবই হয়তো ধোঁকা দেয়ার উপকরণ। ওরা জানে ওদের ওপর নজর রাখা হচ্ছে, সেজন্যেই ব্যাগ ও বাক্স করে ওগুলো আনা হয়েছে-খবর পেয়ে গ্রিক পুলিস এসে সার্চ করলে দেখতে পাবে মিসাইল লঞ্চার বা মিসাইল নয়, ব্যাগে আছে কোন ব্যান্ডগ্রুপের একগাদা মিউজিকাল ইন্সট্রুমেন্ট, আর বাক্সে আছে ইলেকট্রিক্যাল ইকুইপমেন্ট। এ হলো এক ধরনের ডাইভারশন। আসলে

হামলাটা আসবে সাগর থেকে। এটা ভূমধ্যসাগর না? এই সাগর দিয়ে আমেরিকার যুদ্ধজাহাজগুলো হরদম আসা-যাওয়া করছে না? সেরকম একটা জাহাজ থেকে মিসাইল ছুঁড়লেও হয়, কিংবা হেলিকপ্টার গানশিপ পাঠালেও চলে। তাছাড়া, ইজরায়েলও তো বেশি দূরে নয়—এক ঝাঁক বোমারু এসে কয়েকটা ক্লাস্টার বোমা ফেলে যাবে।

এই শেষ ধারণাটাও মগজের এক কোণায় সরিয়ে রাখল রানা। লীডাররা এখানে। এই জায়গাই গুরুত্বপূর্ণ।

আরও বিশ মিনিট অপেক্ষা করল রানা। কোন পরিবর্তন নেই। এবার একটু নড়াচড়া করা দরকার।

বাড়িটাকে ঘিরে ধীরে ধীরে সাবধানে চক্কর দিয়ে এগোবার সম্ভাব্য পথ খুঁজে বের করতে এক ঘণ্টার বেশি সময় লেগে গেল ওর। এই সময়টার শেষ দিকে নিজেকে আশ্বস্ত করতে পারল—কোথাও কোন তার ফেলে রাখা হয়নি, কোন অ্যালার্ম সিস্টেম নেই; সাগর থেকে পাহাড় বেয়ে ওঠা প্রায় অসম্ভব, সঙ্গে সঙ্গে কারও না কারও চোখে ধরা পড়ে যাবার আশঙ্কাও প্রবল; আজ রাতে যে নালাটা ব্যবহার করেছে ও, সেটা ছাড়াও বিকল্প একটা পথ সরাসরি পাহাড়ী ঢাল বেয়ে বাড়ির পিছনের টেরেসের দিকে নেমে গেছে। টেরেসে ওঠাটা একজনের পক্ষে কঠিন হলেও সম্ভব, দু'জন হলে কোন সমস্যা নেই।

দুশো মন ওজনের তেকোনা বোল্ডারটার আড়ালে ফিরে এল রানা, মনে মনে সুযোগ আর সময়ের একটা হিসেব করছে। চাঁদ নেমে যাওয়ায় চারদিক এই মুহূর্তে অন্ধকার, শুধু তারার আভা আছে; তবে মিনিট পনেরোর মধ্যেই ভোরের আলোর প্রথম আভাস দেখা দিতে পারে। অর্থাৎ এখানে ওর বেশিক্ষণ থাকা ঠিক হবে না। কিন্তু বাড়ির ভেতরকার লে-আউটে একবার চোখ বুলানোর গুরুত্ব এত বেশি যে নিজেকে ধরে রাখা যাচ্ছে না। উঁচু-নিচু পাথরের শেষ ঢালটা বেয়ে দ্রুত নামল ও, সমতল চাতালটা পেরিয়ে বাড়ির পাশের দরজায় এসে থামল। কোন রকম ইতস্তত না করে নব মেকানিজম আর নবের মধ্যবর্তী শ্যাঙ্ক ধরে ওপর দিকে চাড় দিল, কপাটের তলার ফাঁকে জুতোর ডগাও ঢুকিয়ে দিয়েছে, একই সঙ্গে ঘোরাবার চেষ্টা করছে নবটা। ক্ষীণ একটা ধাতব শব্দ হলো, শোনা যায় কি যায় না। তারপর যখন বুঝতে পারল যে কবজা থেকে ক্যাঁচক্যাঁচ শব্দ বেরুতে যাচ্ছে, কাঁধ ঠেকিয়ে চাপ দিল সামনের দিকে। দরজা হার মানল। প্রতি মুহূর্তে এক মিলিমিটার করে।

মিনিট পাঁচেকের মধ্যে এক ফুট চওড়া একটা ফাঁক তৈরি করল রানা। সরাসরি একটা সিঁড়ির অংশবিশেষ দেখতে পাচ্ছে, ধাপগুলো উঠে গেছে বাঁয়ে, সম্ভবত বাড়ির পিছনদিকের টেরেসে পৌঁছেছে; দু'পাশে দরজা আর অল্প আলো নিয়ে একটা করিডর। ঠিক সেই মুহূর্তে, যেন ওর তাকানোর সঙ্গে সম্পর্ক আছে, একটা দরজা খুলে গেল—ভেতর থেকে কেউ একজন বেরিয়ে আসছে।

ধরা পড়বার হাত থেকে রানা বেঁচে গেল শুধু একটা কারণে, লোকটা চৌকাঠে থেমে ভেতরের অন্য এক লোকের সঙ্গে শেষ দু'একটা কথা সেরে

নিচ্ছে। দ্রুত অথচ নিঃশব্দে দরজার ফাঁকটা বন্ধ করল রানা, ঝট করে ঘুরল, তারপর ঝড়ের বেগে দৌড়। ঢাল বেয়ে অর্ধেকটাও উঠতে পারেনি, বাড়ির বাইরের আলোটা জ্বলে উঠল। নিজের তেকোনা আড়ালে পৌঁছাল হাঁপাতে হাঁপাতে, বাড়িটার দিকে ঘুরল, সচেতন কোন চিন্তা ছাড়াই হাতে বেরিয়ে এসেছে ওয়ালথারটা।

যুক্তিসঙ্গত সাবধানতাই বলতে হবে। পাশের দরজা খুলে ইয়াহুদ বেরিয়ে এল। কয়েক সেকেন্ড থেমে এদিক-ওদিক ভাল করে তাকাল, তারপর যেন নির্দিষ্ট একটা উদ্দেশ্য নিয়েই এগিয়ে এল রানা যেখানে শুয়ে রয়েছে সেইদিকে। পিস্তল একটু তুলে তার বুকে লক্ষ্যস্থির করল রানা। লোকটা এখনও এগোচ্ছে। দূরত্ব মাত্র পাঁচ গজ। হঠাৎ আরেক দিকে ঘুরে দৃষ্টিপথের বাইরে চলে গেল সে।

অপেক্ষা করছে রানা। এক মিনিট। দু'মিনিট। কোন শব্দ পাচ্ছে না। তারমানে নিশ্চয়ই কাছাকাছি কোথাও দাঁড়িয়ে আছে ইয়াহুদ। কেন? বোধহয় কারও জন্যে অপেক্ষা করছে। কিংবা হয়তো কিছু ঘটবার অপেক্ষায় আছে। পাশের দরজা দিয়ে এবার আরেক লোক বেরিয়ে এল। এই প্রথম কর্নেল ময়নিহানকে দেখতে পেল রানা।

একহারা দীর্ঘদেহী লোকটার এগিয়ে আসা কঠিন চোখে দেখছে রানা–কাঁধ আর নিতম্ব যেন আলগাভাবে জোড়া লাগানো, অনায়াস একটা ছন্দে হেলছে-দুলছে, টকটকে লাল মুখে ক্ষীণ হাসির আভাস–ধরে নিতে হবে ইয়াহুদের উদ্দেশে। লোকটার নড়াচড়া আর হাবভাবে ফুটে আছে অবহেলিত বিপুল ক্ষমতা। এই দু-পেয়ে জীবটি যে-কোন কাজ করবে। একটা বিরল গুণ–এ স-ব পারে। মনে মনে স্বীকার করতে হলো রানাকে, যোগ্য লোককেই পাঠিয়েছে সিআইএ।

ইয়াহুদের পথ অনুসরণ করছে লোকটা। দশ থেকে পনেরো গজ দূরে, রানার পজিশন থেকে খানিকটা ওপরে, তারা নিজেদের মধ্যে আলাপ শুরু করল।

'এই জায়গা আপনার কাজের জন্যে ঠিক আছে, মেজর?' বাড়ির সামনে থেকে ভেসে আসা এই কণ্ঠস্বর আগেও শুনেছে রানা, বাচনভঙ্গিতে মার্কিন টান পরিষ্কার।

'জ্বী, কর্নেল। আমার কোন সন্দেহ নেই, এই জায়গাই আদর্শ।' এটা, বোঝাই যায়, ইয়াহুদের কণ্ঠস্বর। 'তবে শক্ত পাথরে সমস্যা হতে পারে। আমাকে হয়তো খানিকটা পানি ঢেলে মাটি নরম করে নিতে হবে এটা নিয়ে পরে এক্সপেরিমেন্ট করলেও চলবে। তো, ভালই। রীতিমত সন্তোষজনক। এখন বোধহয় আমরা আলোটা নিভিয়ে দিলে পারি।'

'অবশ্যই।' কর্নেল ময়নিহান গলা চড়াল। 'গেরোস্কি! আলোটা, হে, প্লিজ।'

'গেরোস্কি: একজন রুশ। নিশ্চয়ই বেঁটে, শক্ত-সমর্থ লোকটা।

'এখন আমরা ইগজ্যাক্ট অপারেটিং কন্ডিশন দেখতে পাব,' বলল মোসাদ এজেন্ট। 'আশা করি আপনি বুঝতে পারবেন যে সময়টাও আমরা ঠিক বেছেছি।'

আলো নিভে গেল।

'চোখের পুরো দৃষ্টি ফিরে পেতে কিছুক্ষণ অপেক্ষা করতে হবে,' বলল ইয়াহুদ। 'আমার চোখে অবশ্য এরই মধ্যে সব ঠিক আছে বলে মনে হচ্ছে।'

তা তো মনে হবেই! নিজের ঠোঁট কামড়াল রানা। আকাশে একবার চোখ বুলালেই বোঝা যায় ভোরের আলো ফুটতে শুরু করেছে। ওর চারপাশে একটু একটু করে যেন চুপিচুপি ফিরিয়ে দেয়া হচ্ছে রঙ–পাথরের ধূসরতা আর কালচে-খয়েরি, ঘাস আর ঝোপের সবুজ-শ্যামল, বাড়ির দেয়ালের সাদা। ওখানে দাঁড়িয়ে কতক্ষণ আলাপ করবে ওরা?

যেন রানাকে খেপিয়ে তোলবার জন্যেই ঝাড়া পাঁচ-সাত মিনিট একটা কথাও বলছে না ওরা। তারপর, ওর মনে হলো এক যুগ পর, ইয়াহুদ মুখ খুলল। 'ওই যে! আপনি দেখতে পাচ্ছেন ওকে?'

'ওহ্, ইয়েস! দারুণ!'

'আমরা রিমোট কন্ট্রোল ডিভাইসের কাছ থেকে ভাল রেজাল্টের আশায় একটা কালার কোড ব্যবহার করছি। মাত্র গত মাসে জিনিসটা প্রায় নিখুঁত করা সম্ভব হয়েছে। ওদের গাইডেন্স সিস্টেমের বিকল্প হিসেবে কাজ করবে এটা। আপনাকে আগেই বলেছি, সব রকম ফ্যাসিলিটি ছিল আমাদের। সত্যিকার উপভোগ্য একটা কাজ। আর জরুরী, প্রয়োজনীয় গবেষণা দারুণ আকর্ষণীয় হয়ে ওঠে। রঙটা থাকবে বলগুলোয়।'

'আশা করি ফলাফলটাও হয় চূড়ান্ত।'

'হ্যাঁ, অবশ্যই। প্রায় নিখুঁত। এই পয়েন্টে আপনি পজিটিভ থাকতে পারেন। ওদের নকশা ধরে বানানো হয়েছে মূল জিনিসটা।'

আমেরিকান লোকটা নরম সুরে কী যেন বিড়বিড় করে থেমে গেল।

আবার সেই স্নায়ুবিদারক নীরবতা।

রানা ঘামছে। এইমাত্র সিদ্ধান্ত নিয়েছে ও, বাড়ি ফেরবার সময় দু'জনকেই পিছন থেকে গুলি করবে, তারপর গেরোস্কি আর সোনালি চুলটাকে কাবু করবে বিস্ময়ের চমক দেখিয়ে। বাড়িতে আরও যদি কেউ থাকে, বেরুলেই টার্গেট প্র্যাকটিস করবে। হাঁটুর ওপর স্ল্যাকস-এ ডান হাত মুছল ও।

'ঠিক আছে, আপাতত যথেষ্ট দেখা হয়েছে,' এক সময় আবার ইয়াহুদের কণ্ঠস্বর শোনা গেল। 'ব্রেকফাস্টের পর মিককে নিয়ে এক লাইনে দাঁড়াব আমি।'

'ভেরি গুড। এই মিক–এরকম একটা কম বয়েসী শান্ত ছেলে মোসাদের সঙ্গে নিজেকে খাপ খাওয়াল কীভাবে?'

'না, কোন সমস্যাই হয়নি। ওর একটা ইন্টারেস্টিং ইতিহাস আছে। প্রধানমন্ত্রী হবার অনেক বছর আগে শ্যারনের ড্রাইভার ছিল ওর বাবা। ফিলিস্তিনিরা শ্যারনের বিরুদ্ধে যে ম্যাসাকারের অভিযোগ তোলে, তাতে মিকের বাবার নামও জড়িয়ে আছে। মিক তখন...'

কথা তারপরও হচ্ছে, তবে রানা আর শুনছে না। ওদের কণ্ঠস্বর

অ্যাঙ্কারিজের দিকে সরে যাচ্ছে। হাতে অস্ত্র নিয়ে অপেক্ষা করছে রানা। যেখানে ওরা দাঁড়িয়ে ছিল সেখান থেকে তির্যক পথ না ধরে সরাসরি পানির কিনারায় নেমে যাচ্ছে। অবশেষে আবার যখন রানার দৃষ্টিপথে উদয় হলো, সত্তর থেকে আশি ফুট দূরে ওরা। রানা সিদ্ধান্ত নিল, গুলি করবে না। আলোর অবস্থা এখনও করুণ, ভাল করে ফোটেনি। তারপরও অপেক্ষায় থাকল ও, আবার যদি ফিরতি পথ ধরে।

কিন্তু না। আড়ষ্টভঙ্গিতে পাথরের কিছু স্তূপ টপকে বোটটাকে পাশ কাটিয়ে বাড়ির সামনের অদৃশ্য অংশে হারিয়ে গেল দু'জন। শেষ; আজ বোধ হয় আর কোন সুযোগ পাওয়া যাবে না।

নিষ্প্রভ আলো গুলি করবার উপযোগী না হলেও, ইতোমধ্যে নড়াচড়া ধরিয়ে দেয়ার মত যথেষ্ট পরিচ্ছন্নতা পেয়েছে, সেটার মাত্রা প্রতি মুহূর্তে একটু একটু করে বাড়ছেও। ধৈর্য ধরে তিন মিনিট অপেক্ষা করে দেখল রানা সিআইএ কর্মকর্তা আর মোসাদ এজেন্ট ফিরে আসে কি না, তারপর আড়াল থেকে বেরিয়ে নালা ধরে ওপরে উঠতে শুরু করল। নামবার চেয়ে উঠবার গতি কম, নালার মুখে পৌঁছে মনে হলো এই বুঝি উঁকি দিল সূর্য। দম নেয়ার জন্যে একটু থেমে চিন্তা করল—পাথুরে ঢাল ভয়ানক খোলা লাগছে; কিন্তু আবার ঘুরপথে গেলে একশো ফুটের মত নগ্ন পাহাড়-প্রাচীর বেয়ে উঠতে হবে।

সিধে হলো রানা, কাঁধ দুটো নেড়েচেড়ে সমান করল, দৃঢ় পায়ে অপরপ্রান্ত লক্ষ্য করে হাঁটছে। ঢালু অংশটুকু পেরিয়ে এল। সামনে এখন সমতল বিস্তৃতি। আগের মতই হাঁটছে রানা, এরকম আলোয় কাঁটা-ঝোপগুলোকে ব্যাকগ্রাউন্ড হিসেবে ব্যবহার করার কোন মানে হয় না। এভাবে ঝুল-পাথরের নিচে পৌঁছে গেল ও। সমতল পথ এখানেই শেষ।

ওর সামনে, পিছনেও, অস্বাভাবিক একটা ভূস্তর পড়ে রয়েছে। বিশ থেকে ত্রিশ ফুট উঁচু প্রায় চৌকো অসংখ্য পাথরখণ্ড আধমাইল জায়গা দখল করে রেখেছে, স্তূপ তৈরি করেছে পাশাপাশি বা লম্বালম্বি, কিংবা একটার ওপর আরেকটা। সব মিলিয়ে এমন এলোমেলো, বেঢপ আর বিশৃংখল একটা জায়গা—দশ ফুট এগোতে হলে ওঠানামা করতে হবে তার দ্বিগুণ। ওপরে আর নিচে পাহাড়-প্রাচীর। আসবার সময় এই পাথরের স্তূপ পেরুতে রানার সময় লেগেছিল পঞ্চাশ মিনিট। এখন আলো থাকলেও ত্রিশ মিনিটের কমে পারা যাবে বলে মনে হচ্ছে না। তবে এই জায়গাটা পেরুতে পারলে সামনে পড়বে ছোট একটা ঢালের পর সমতল পাথুরে প্ল্যাটফর্ম, ওখান থেকে সৈকত আর বোটের দিকে নামা পানির মত সহজ। তাহলে এগোনো যাক।

বিশৃংখল জায়গাটা পেরুতে আধ ঘণ্টার বেশি লেগে গেল। পাথুরে প্ল্যাটফর্মে উঠছে, এই সময় অপরপ্রান্তে সিধে হলো এক লোক, হাতের পিস্তল তাক করল ওর দিকে।

লোকটা যথেষ্ট লম্বা। গায়ে চাপিয়েছে গাঢ় রঙের সস্তা সুট, ভাঁজ বলতে কিছু নেই, দু'এক জায়গায় ছেঁড়া। কাঁধে সবুজ প্লাস্টিক কেস ঝুলছে, তাতে

একটা বিনকিউলার। ভারী স্বরে কথা বলল সে, ইংরেজিতে ভারতীয় টান। 'গুড মোর্নিং, মিস্টার মাসউদ রানা।' তারপর চাপা গলায় খুক্ খুক কাশির মত শব্দ করে হাসল–বিদ্রূপ করছে।

স্থির দাঁড়িয়ে অপেক্ষা করছে রানা।

'তুমকো ম্যায় দেখা হ্যায়···উপার সে,' লোকটা শান্ত মেজাজে কথা বলছে, এবার হিন্দিতে, অনেকটা ব্যাখ্যা দেয়ার সুরে। 'এখন আমরা ওই ওপরেই উঠব।' বাঁ হাত দিয়ে পাহাড়-প্রাচীরটা দেখাল।

রানা নড়ছে না।

'কী? তুমি উঠতে চাও না? তাহলে···গুলি করতে হবে। সেটাও কম মজার হবে না।' নিজের পায়ে একটা চাপড় মারল ভারতীয় লোকটা। 'ওপরে আমার বন্ধু আছে।' রশি টেনে ভারী কিছু তোলবার ভঙ্গি করে দেখাল, তবে পিস্তলটা একটুও নড়ল না। 'কঠিন কাজ। তুমি হয়তো পড়ে যাবে। আমার জন্যে কোন সমস্যা নয়।' আবার সেই খুক্ খুক্ কাশির সঙ্গে চাপা হাসি।

এরমধ্যে কোন জটিলতা নেই। প্রস্তাব অনুসারে পাহাড় বেয়ে ওঠার সময়, অনুপস্থিত বন্ধু উদয় হবার আগে, অপেক্ষা করতে হবে এমন এক মুহূর্তের জন্যে যখন পিস্তলটা ওর দিকে তাক করা থাকবে না। রানা মাথা ঝাঁকাল।

'বুদ্ধিমান পাগল, সুযোগ হারায় না।' সোনার দাঁত দেখিয়ে হাসল। 'এদিকে এসো।' বাঁ হাত দিয়ে প্ল্যাটফর্মের এমন একটা জায়গা দেখাল, এক লাফে তার নাগাল পাওয়া যাবে না।

এগিয়ে এসে জায়গাটায় দাঁড়াল রানা।

'এবার···তোমার বাপকে বের করো।'

রাগে রানার ব্রহ্মতালু পর্যন্ত জ্বলে গেল।

'পিস্তলের কথা বলছি, ব্রাদার। ধীরে ধীরে বের করো। আহেস্তা আহেস্তা–হে হে।'

পিস্তলটা রানার ব্রেস্ট-বোনে তাক করা। লক্ষ্য যার আগে থেকেই স্থির করা, তারচেয়ে দ্রুত লক্ষ্যভেদ করা কারও পক্ষেই সম্ভব নয়। এই মুহূর্তে সম্পূর্ণ অসহায় রানা, হিপ পকেট থেকে ওয়ালথারটা বের করে তালুতে রেখে বাড়িয়ে দিল হাতটা।

'আকালমান্দ। ফেকো–ছুড়ে দাও।'

আরেকটা সুযোগ হারিয়ে যাচ্ছে। পিস্তলটা এক পাশে ছুড়ে দিল রানা, পাথরে বাড়ি খাবার আওয়াজ শুনতে পেল।

'তোমার দোস্ত–,' ইঙ্গিতে সৈকতের দিকটা দেখাল লোকটা, '–কোন কম্মের নয়, ঠিক না? এবার···হাঁটো, মিস্টার মাসউদ। আহেস্তা আহেস্তা।'

নির্দেশ পালন করতে যাচ্ছে রানা, এই সময় ওর প্রতিপক্ষ ঝাঁকি খেলো, কেউ যেন কষে চাপড় মেরেছে পিঠে। তারপরই মিডিয়াম-ক্যালিবার কার্টিজের তীক্ষ্ণ গর্জন, অকস্মাৎ উঠে এল ওদের পায়ের নিচে থেকে। একই সঙ্গে পিছু নিয়ে এল রাইফেল-বোল্ট টেনে ছেড়ে দেয়ার শব্দ। একটাই প্রতিধ্বনি শোনা

গেল—ভেসে এল দূর থেকে, এলও দেরি করে।

লোকটার পিস্তল ধরা হাত ঝুলে পড়ল। রানার চোখে তাকিয়ে আছে দৃষ্টিতে অসীম বিহ্বলতা নিয়ে, যেন ব্যাকুল মিনতির সঙ্গে জানতে চাইছে এই অসম্ভব ঘটনা কী করে ঘটতে পারল। রানার কণ্ঠস্বর কর্কশ শোনাল। 'তোমাকে রাইফেল দিয়ে গুলি করা হয়েছে, সৈকত থেকে।' রানার বুক ধকধক করছে। সন্দেহ আছে ওর বক্তব্য লোকটা বুঝতে পেরেছে কি না। শরীর অর্ধেকটা ঘুরিয়ে পিছনদিকে তাকাতে যাবে লোকটা, দ্বিতীয় বুলেট ফেলে দিল তাকে নড়বড়ে হাত-পা নিয়ে একটা কাপড়ের তৈরি পুতুলের মত ঢাল বেয়ে গড়িয়ে নেমে গেল, থামল পাথরের একটা স্তূপে মুখ গুজে দিয়ে। রক্তের দাগ দেখা যাচ্ছে শোল্ডার-ব্লেড আর নিতম্বে।

ওয়ালথারটা তুলে নিয়ে দু'মিনিটের মাথায় সৈকতে নেমে এল রানা। সিকান্দার এরইমধ্যে ডিঙ্গিটাকে পানিতে নামিয়ে ফেলেছে। লাফ দিয়ে চড়েই তুলে নিল জোড়া বৈঠা।

'নাইস শূটিং, মিস্টার সিকান্দার,' খানিক পর, একটু দম নিয়ে, বলল রানা।

'নাইস নয় বলি কী করে। ওপরদিকে গুলি লাগানো একটু কঠিনই তো। তবে গ্রিসে থাকলে এ-সবে আপনি অভ্যস্ত হয়ে যাবেন। দুশো গজের বেশি দূরে তো আর ছিল না, তাই খুব বেশি কঠিন টার্গেট বলা যাবে না।' এই মুহূর্তে রানার কোলে পড়ে থাকা লী এনফিল্ড রাইফেলটার দিকে সস্নেহে তাকাল। 'আমি একবার এক সার্ব সার্জেন্টকে ছ'শো গজ দূর থেকে ফেলে দিয়েছিলাম। এ-যুগের লোকজন এই রাইফেলের বৈশিষ্ট্য ভুলে গেছে। পঞ্চাশ ফুটের মধ্যে চারদিকে কিছু দেখতে না পেলে ধরে নেয় তারা নিরাপদ। বাজি ধরে বলতে পারি, গুলি খাওয়ার পর লোকটা একেবারে হকচকিয়ে গিয়েছিল।'

'হ্যাঁ,' বলল রানা, সুরটা এখনও একটু কর্কশ। লোকটার হতবিহ্বল চেহারা মনে পড়ে গেছে।

'আমি খুব সাবধানেই নজর রাখছিলাম, মিস্টার রানা। কিন্তু আপনাকে দেখে সিধে না হওয়া পর্যন্ত আমি তাকে দেখতেই পাইনি। ব্যাটা বেশি সময় দেয়নি আমাকে।'

'ও কিন্তু আপনাকে ঠিকই দেখেছিল। নিজেই বলল আমাকে।'

'আরে, তাই নাকি? তাহলে এ তার কেমন বোকামি যে কোন আড়াল ছাড়াই আমার সামনে দাঁড়িয়ে আপনার দিকে পিস্তল তাক করল? আসলে কে ওই লোক?'

'জেনারেল মাধব সিন্ধিয়ার সিকিউরিটি গার্ড। আমাকে সে দেখতে পায় পাহাড়-প্রাচীরের মাথায় টহল দেয়ার সময়। দেখে নিচে নেমে আসে।'

'বাহাদুর জেনারেল তাহলে খুব খেপবে। আসুন আল্লাহর দরবারে প্রার্থনা করি আমাদের আজ রাতের প্ল্যানে সে যেন নাক গলাতে না আসে।'

পাঁচ

সেদিন দুপুরে ড্রাকোনিসি বন্দরের পাঁচ মাইল দক্ষিণে দেখা গেল অ্যাপডকে, ছুটছে উত্তর-পশ্চিমে। কুয়াশা নেই, দৃষ্টিসীমা ভাল; চমৎকার আবহাওয়ার প্রতিশ্রুতিও আছে, তবে সাগর আবার একটু ফুলে-ফেঁপে উঠেছে। ঢেউগুলোর ওপর দিয়ে তির্যক পথ তৈরি করে এগোচ্ছে মোটর-বোট, ফলে মাঝে মধ্যে আড়ষ্ট ভঙ্গিতে ঝাঁকি খাচ্ছে। ঝাঁকিগুলো অন্তত এই ভঙ্গিতে খেত না হুইলে দক্ষ একজোড়া হাত থাকলে।

এ-ধরনের বোট চালানোর অভিজ্ঞতা ডোমিনিক ডায়াটাস-এর কমই বলতে হবে, যদিও সে তার নিজের ছোট কোস্টাল রানঅ্যাবাউট চব্বিশ ফুটি সিলিয়াকে অত্যন্ত পাকা হাতে উত্তাল সাগরেও সামাল দিতে পারে। এই মুহূর্তে তার একটাই প্রার্থনা, ভাল হতে সময় লাগে লাগুক, তার আগে যেন আবহাওয়াটা আরও খারাপ হয়ে না ওঠে। এই প্রার্থনা তার নিজের জন্যে নয়, কারণ পরবর্তী কয়েক ঘণ্টার বেশিরভাগ সময় কোন না কোন দ্বীপের আড়াল পাবে সে। চিন্তাটা আসলে সিলিয়া আর সিলিয়ার আরোহীদের নিয়ে।

সিলিয়াকে কেন তাদের দরকার হলো? তারা যাচ্ছেই বা কোথায়?

না, আগের কাজ আগে। ঠোঁটে নিঃশব্দ সন্তুষ্টির হাসি, অ্যাপডের মাথা একটা নির্দিষ্ট মাত্রায় ঘুরিয়ে অতিরিক্ত উঁচু ঢেউটাকে বাগ মানাবার ভঙ্গিতে বো-র তলায় নিয়ে এল, যাতে ঝাঁকি খাবার বা কাত হবার প্রবণতা ঠেকিয়ে দেয়া যায়। দ্রুত শিখছে সে। সব সময় শেখেও তাই। ব্যাপারটা আসলে জিন আর ইন্সটিঙ্কট্-এর, রক্তেই আছে নাবিক হওয়ার বীজ। ওর দাদু তো প্রায়ই বলতেন···থাক, এখন ওসব স্মরণ করবার দরকার নেই।

মাথা ঘামানো দরকার ওই লোকগুলোকে নিয়ে। সন্দেহ নেই, কোন বেআইনী কাজের সঙ্গে জড়িত ওরা। গ্রিক দু'জন, বুড়ো আর তার মেয়েটা—নিশ্চয় নিজের মেয়েই হবে—পরিষ্কার বোঝা যায় যে মুসলমান। মুসলমান হলেও আচার-ব্যবহারে যথেষ্ট বিনয়ী, নিরীহ ভালমানুষ বলেই মনে হয়। কিন্তু বিদেশী লোকটাকে ওর সুবিধের মনে হয়নি। অসম্ভব বেপরোয়া। যেন দুনিয়াটাকে এক হাত দেখে নেয়ার জন্যে দৃঢ় প্রতিজ্ঞ হয়ে অপেক্ষা করছে। লোকটাকে দেখবার সঙ্গে সঙ্গে চুম্বকের মত একটা টান অনুভব করেছে ডায়াটাস, সেই সঙ্গে এ-ও উপলব্ধি করেছে যে এর সম্পর্কে বেশি কিছু জানতে চেষ্টা করাটা তার জন্য শুভ হবে না।

এক ঘণ্টা আগের কথা। লোকটা সম্পর্কে এরকম একটা ধারণা হবার পর তার হাতের জিনিস দেখে একটুও অবাক হয়নি ডায়াটাস। সিলিয়ার ডেকে বস্তায় মোড়া দুটো জিনিস তুলল সে। আচ্ছা, কাউকে বলে দেয়ার দরকার আছে যে

ওগুলো কোন ধরনের আগ্নেয়াস্ত্র? ডায়াটাস সবিনয়ে পিছন ফিরে দাঁড়িয়েছে, ভান করেছে আবহাওয়ার মতিগতি বুঝতে চাইছে। সে তো আর মিছেমিছি আইওনিয়ন দ্বীপপুঞ্জের অধিবাসী নয়! আইওনিয়ানরা এভাবেই নাজুক পরিস্থিতি সামাল দেয়: মাথা খাটাও, চোখ খুলে রাখো, বন্ধ রাখো মুখ।

তাই অ্যাথেনিয়ান মুসলমান বুড়োটার শর্তসহ প্রস্তাব নিঃশব্দে গ্রহণ করেছে সে, ভুলেও একবার মুখ খোলেনি। টাকা নিয়ে দর কষা? দরকারই পড়েনি! সামান্য একটা কাজ—কমবেশি ছত্রিশ ঘণ্টার জন্যে বোট বিনিময়, মাঝখান থেকে এক হাজার মার্কিন ডলার হাতবদল। আরে, এ তো কুড়িয়ে পাওয়া টাকা রে ভাই! পাঁচশো ডলার না চাইতেই দিয়ে দিল, বলেছে বাকিটা পরে দেবে। হারবারে দাঁড়িয়ে প্রস্তাবটা শোনবার সময় তার মাথা একটু চক্কর দিয়েছিল। এত টাকা! তবে ওদেরকে সে কিছুই বুঝতে দেয়নি। এমনভাবে মাথা ঝাঁকিয়েছে, যেন এরকম প্রস্তাব প্রায়ই তাকে দেয়া হয়, আর এই পরিমাণ টাকাও সে মাঝে-মধ্যেই কামিয়ে থাকে।

তারপর বুড়ো অ্যাথেনিয়ান জানাল, অ্যাঙ্কারিজে নয়, সাগরের দক্ষিণ দিকের একটা রনদিভুতে বোট হাত-বদল হবে। আরও বলে দেয়া হলো, হারবার থেকে এক ঘণ্টা পর রওনা হতে পারবে সে, কোন অবস্থাতেই তার আগে নয়।

যেহেতু সে একজন আইওনিয়ান, তাই চেহারায় বিস্ময়ের কোন ভাবই ফুটতে দেয়নি ডায়াটাস, প্রতিবাদ করবার তো প্রশ্নই ওঠে না।

তবে শর্ত আরও ছিল, সে-সবও বিনাবাক্যব্যয়ে মেনে নিয়েছে ডায়াটাস—যেমন, বোট হাত-বদলের পরপরই আরও দক্ষিণে এগোতে হবে তাকে, আইওস দ্বীপে পৌঁছে কাল বিকেল বা সন্ধ্যা নাগাদ আবার তারা দেখা না করা পর্যন্ত ওই দ্বীপ ছেড়ে এক পা-ও নড়তে পারবে না। আনন্দে অস্থির, এক পায়ে খাড়া, দক্ষিণ দিকে রওনা হলো ডায়াটাস। ঘণ্টায় আট নট স্পীড তুলে অপেক্ষায় থাকল দিগন্তরেখা পার হয়ে কখন হারিয়ে যায় সিলিয়া। ব্যস, তারপরই অ্যাপড়ের দিক বদলে রওনা হলো উত্তর-পশ্চিমে।

কারণ? কারণ আইওস দ্বীপে যাবার কোন ইচ্ছেই তার নেই। অন্তত আজ তো নয়ই। খুব বেশি সময় লাগলে আজ সন্ধ্যা সাতটায় প্যারস বন্দরে বোট ভেড়াতে পারবে সে। তারপর কাল খুব ভোরে যদি দক্ষিণ দিকে রওনা হয়, খারাপ আবহাওয়া পিছনে ফেলে হাতে প্রচুর সময় থাকতেই আইওসে পৌঁছাতে পারবে। সরাইখানায় বসবে সে, সামনে থাকবে মদের গ্লাস। সিলিয়া আর ওটার আরোহীদের জন্যে অপেক্ষা করবে।

আপনমনে নিঃশব্দে হাসল ডায়াটাস, তারপর গলা চড়িয়ে চাচাতো ভাইটাকে ডাকল। তার বয়স মাত্র চোদ্দ, সাগরে ঘুরে বেড়ানোর শখ মেটানোর জন্যে ডায়াটাসের একমাত্র ক্রু হিসেবে কাজ করে, এই মুহূর্তে অ্যাপডের কেবিন-টপে গায়ে রোদ লাগিয়ে অলস সময় কাটাচ্ছে।

ডাক শুনে ছুটে এল ছেলেটা। প্রথমে দিক-নির্দেশনা, তারপর কিছু পরামর্শ দিল ডায়াটাস। বোটের সামনে এসে সেলুনে ঢুকল সে, হুইলের দায়িত্ব ছোট

ভাইয়ের হাতে দিয়ে এসেছে। ভ্রাকোনিসির কাছাকাছি চলে এল বোট। দ্বীপটা বাধা হয়ে দাঁড়ানোয় সাগর এখানে অনেকটাই শান্ত। এদিকের পানি অগভীরও নয়।

একটা বেঞ্চে দেশী মদ নিয়ে বসল ডায়াটাস। এটা ঠিক নেশা করবার সময় নয়, কিন্তু সে তো আসলে ছুটি কাটাচ্ছে, তাই না? গ্লাসে কয়েকটা চুমুক দিতেই দারুণ ঝরঝরে লাগল শরীরটা। মনেও ফুর্তির একটা আমেজ চলে এল।

সিগারেট ধরিয়ে অলস চোখ তুলে জানালার বাইরে তাকাল সে। ভ্রাকোনিসি দ্বীপের দক্ষিণ-পশ্চিমে যে আইলিটটা রয়েছে, একশো গজ দূর থেকে সেটাকে পাশ কাটাচ্ছে ওরা। ডায়াটাস জানে, ওখানে প্রাচীন যে দালানটা আছে—দুর্গ আর প্রাসাদের আদলে তৈরি—সেটা ভাড়া নিয়েছে সৌখিন এক বিদেশী ভদ্রলোক। গরীব, বয়স কম, মোটাতাজা মেয়েদের প্রতি তার নাকি খুব লোভ। ছি-ছি!—নিজেকে তিরস্কার করল ডায়াটাস, শোনা কথা বিশ্বাস করতে নেই, বিশেষ করে সেটা যদি কোন নিন্দা হয়। যা বলা হচ্ছে উনি হয়তো তেমন লোকই নন। হয়তো গরীব মেয়েদের প্রতি তাঁর মনে নির্মল স্নেহ-ভালবাসা আছে।

তারপর হঠাৎ ডায়াটাস দেখল, টেরেসে মাঝ-বয়েসী এক ভদ্রলোক দাঁড়িয়ে রয়েছেন, পরনে দামী সুট। কে জানে, ইনিই হয়তো সেই ভদ্রলোক। তবে আশ্চর্য তো! ভদ্রলোক যেন সরাসরি তার দিকে তাকিয়ে রয়েছেন।

ডায়াটাসকে আরও অবাক করে দিয়ে ভদ্রলোক ঝট করে ঘুরে টেরেস থেকে ঘরে ঢুকলেন, কয়েক সেকেন্ড পর আবার বেরিয়ে এলেন অন্য এক লোককে সঙ্গে নিয়ে।

দ্বিতীয় লোকটা চোখে বিনকিউলার তুলে বেশ কিছুক্ষণ অ্যাপডকে দেখল, তারপর সেটা বাড়িয়ে ধরল সুট পরা ভদ্রলোকের দিকে। এবার হুমড়ি খেয়ে পড়ে যাবার ভঙ্গিতে ছুটতে ছুটতে টেরেসে বেরিয়ে এল তৃতীয় লোকটা। তিনজনই খুব আগ্রহ নিয়ে অ্যাপডকে পাশ কাটাতে দেখছে। কী ঘটছে ডায়াটাস জানে না, তবে সে তার নিজের মত আন্দাজ করে নিল। বেঞ্চ ছাড়ল সে, সেলুন থেকে বেরিয়ে রেইল-এর সামনে এসে দাঁড়াল, তারপর মুখে অমায়িক হাসি ফুটিয়ে একটা হাত তুলে নাড়ল।

প্রতিক্রিয়া হলো অদ্ভুত। হঠাৎ তিনটে কাঠামোর শিরদাঁড়া খাড়া হয়ে গেল, অবাক হয়ে পরস্পরের দিকে তাকাল তারা, তারপর আবার একযোগে অ্যাপডের দিকে ফিরল—যেন তিনজন পুরোহিত অশোভন কোন দৃশ্য দেখে ভ্যাবাচাকা খেয়ে গেছে।

ডায়াটাস আবার হাত নাড়ল। এবার সাড়া দিল তারা—প্রথমে অনিচ্ছাসত্ত্বেও, তারপর আকস্মিক উৎসাহে অস্থির ভঙ্গিতে; পুরোহিতরা তাকে জানাবার সিদ্ধান্ত নিয়েছেন যে তাঁরা আর দশজন মানুষের চেয়ে আলাদা কিছু নন। সশব্দে হেসে উঠে সেলুনে ফিরে এল ডায়াটাস। পুরানো গ্রিক প্রবাদটা আসলে মিথ্যে নয়, ভাবল সে—সব বিদেশীই পাগল! তবে এই লোকগুলো সত্যিকার ধনী, এক মিনিট পর বাদামী রঙ করা বড়সড় মোটর বোটটা দেখে ভাবল সে। বাড়িটার নিচে

অ্যাঙ্কারিজে একটু একটু দোল খাচ্ছে ওটা। পাগলাটে ধনী। তবে অ্যাপডকে দেখে লোকগুলোর উত্তেজনার কারণ নিয়েও কিছুক্ষণ চিন্তা করল ডায়াটাস। একটু অস্বস্তি জাগল মনে। ওরা কি অ্যাপডকে একটা চুরি করা বোট বলে মনে করেছে? না কি বোটটা আসলে চিহ্নিত একদল অপরাধীর?

কিন্তু আইলিটের লোকগুলো তো বিদেশী, ট্যুরিস্ট, এ-ধরনের ব্যাপার নিয়ে তারা কখনও মাথা ঘামাতে যাবে না। চিন্তাটা বাতিল করে দিল সে।

আধঘণ্টা পর ছোট ভাইকে নিয়ে আফটার ডেকে বসল ডায়াটাস, ভাগাভাগি করে রুটি আর পনির খেলো। ভাই কফি বানাতে গেছে, নিজে বিয়ারের একটা ক্যান খুলল। এখন তার মাথায় আবার প্যারস দ্বীপ ফিরে এসেছে। আইওসে আজ না গিয়ে প্যারসে যাবার কারণ হলো, ওখানে পেট্রা পলিনি থাকে। তিন বছর ধরে প্রেম করছে ওরা, অবশেষে বিয়ের সম্ভাবনাও উজ্জ্বল হয়ে দেখা দিয়েছে। তবে সব ঠিক আছে ধরে নেয়াটা বোকামি হবে। পলিনির মা-বাবা তাকে পছন্দ করেন, জানেন ছেলেটা সৎ, কিন্তু সাতাশ বছর বয়সী একটা তরুণের যে-রকম বৈষয়িক উন্নতি হবার কথা তা তার বেলায় হয়েছে বলে তাঁরা মনে করছেন না। কাজেই ডায়াটাস সিদ্ধান্ত নিয়েছে, পলিনির গোটা পরিবারকে অ্যাপডে দাওয়াত দেবে। বলবে, তার এথেন্সের এক বন্ধু দু'দিনের জন্যে বোটটা তাকে ব্যবহার করতে দিয়েছে। সেলুনে বসিয়ে পলিনি, তার মা-বাবা আর ছোট বোনটাকে ড্রিঙ্ক অফার করবে সে। তারপর সবাইকে লবস্টার ডিনার খেতে নিয়ে যাবে। সবশেষে শহরের বড় একটা দোকান থেকে কিনে চারজনকেই কিছু না কিছু একটা উপহার দেবে।

আর এ-সব করবার সময় পলিনির সঙ্গে থাকবার সুযোগ পাবে ডায়াটাস, তার ছোঁয়া নেবে, অপলক তাকিয়ে দেখবে তাকে। তবে সে জানে, বেশিক্ষণ পরস্পরকে একা পাওয়া সম্ভব হবে না। জীবনের এরকম কিছু দিক অত্যন্ত তিক্ত ও বিরক্তিকর। শহরের মেয়েগুলো নাইট ক্লাবে রোজ রাতে বন্ধু বদলাচ্ছে। কিন্তু পলিনি পাহাড়ী গ্রামে বড় হওয়ায় তার মা-বাবা একটা ছেলের সঙ্গেও ঠিকমত মেলামেশা করতে দেবেন না। এ-ধরনের সমস্যা অবশ্য মেনে নিতে বাধ্য ডায়াটাস, কারণ শহুরে স্বৈরিণীর বদলে পলিনির মত পাহাড়ী সতীকেই বউ হিসেবে পেতে চাইছে সে

ডায়াটাস দীর্ঘদেহী, সুদর্শন, চোখ দুটো ঘন কালো; ট্যুরিস্টদের গাইড হিসেবে কাজ করায় বিদেশী বহু তরুণীর সঙ্গ পাবার সুযোগ জুটে যায় কপালে। সে-সব সুযোগ কখনোই সে হাতছাড়া করে না। বিয়ের পর? হাহ্, পলিনি অশিক্ষিত পাহাড়ী মেয়ে না! সে স্বামীর সব খবর জানতেই পারবে না কোনদিন।

পিছন দিকে চোখ পড়তে ডায়াটাসের মাথা থেকে পলিনি উড়ে গেল। একটা জলযানের আকৃতি দ্রুত স্পষ্ট হয়ে উঠছে। স্পীড খুব বেশি, তাই একটু পরই চেনা গেল। খানিক আগে এই বাদামী মোটর-বোটটাকে আইলিটের অ্যাঙ্কারিজে দেখে এসেছে ওরা, প্রাচীন পাথুরে বাড়িটার নিচে। ব্যাপারটা হতবুদ্ধিকর, খানিকটা ভীতিকরও। নিজের বিবেক আর আইনগত অধিকার বিবেচনা করল

ডায়াটাস। কাগজ-পত্রের তথ্য কিছুই মিলবে না, আপ-টু-ডেট করা নেই, তবে সরল মনে সাময়িকভাবে এক লোকের সঙ্গে বোট বদল আইনভঙ্গের আওতায় পড়ে বলে তার মনে হলো না। তাছাড়া, বিদেশী কোন লোক তাকে আইন দেখাতে আসে কীভাবে? ডায়াটাস নিজের কোর্স আর স্পীড ধরে রাখল।

কাছে চলে এল মোটর-বোট। অ্যাপডের পাশে সেঁটে থাকল, সমান্তরাল রেখায়। সেই তিনজন লোক, ডায়াটাস যাদেরকে আইলিটের বাড়িটায় দেখেছিল, এখন আবার সেই আগের মত তার দিকে কেমন অদ্ভুত ভঙ্গিতে তাকিয়ে আছে। স্পীড না কমিয়ে অপেক্ষা করছে সে, ব্যাপারটার মাথা মুণ্ডু কিছুই বুঝতে পারছে না। আধ মাইল দূর দিয়ে ওদের উল্টোদিকে চলে গেল একটা ফিশিং বোট। আরও দূরে খানিকটা ধোঁয়া দেখা গেল, বড়সড় একটা প্যাসেঞ্জার স্টীমার নিজের পথ ধরে সিকিনস দ্বীপের দিকে যাচ্ছে।

এই সময় মোটর-বোট থেকে একজন গ্রিক হাঁক ছাড়ল। 'তোমার ওটা কী জাহাজ, হে?'

'অ্যাপড়, পিরিয়াসে রেজিস্ট্রি করা,' বলল ডায়াটাস, তারপর জানতে চাইল, 'আপনাদের ওটা কী?'

তার প্রশ্ন এড়িয়ে যাওয়া হলো। 'তুমি কে?'

'ডোমিনিক ডায়াটাস, টেমপোরারি ক্যাপটেন।'

'সঙ্গে কে?'

'আমার চাচাতো ভাই, এই যে।'

মোটর-বোটে ওরা নিজেদের মধ্যে কী যেন আলাপ করল, তারপর সেই আগের গ্রিক লোকটাই চিৎকার করে জানাল, 'আমরা তোমাদের বোটে আসছি।'

'কোন্ অধিকারে?'

'আমরা কোস্টগার্ড অথরিটি।'

এ-ধরনের কোন সংস্থার কথা আগে কখনও শোনেনি ডায়াটাস, তবে আইওনিয়ান বৈশিষ্ট্য অনুসরণ করে এবার মুখ বন্ধ রাখল সে। এখন ব্যাপারটা পরিষ্কার যে নিজেকে বেশ বড় একটা ঝামেলায় জড়িয়ে ফেলেছে সে। তর্ক করে সেটাকে বিপদে পরিণত করবার কোন মানে হয় না। দেশী আর বিদেশী, দু'রকম লোকই রয়েছে মোটর-বোটে; আইনের এদিক-ওদিক যেদিকেই থাকুক, কোন সন্দেহ নেই এরা অত্যন্ত প্রভাবশালী মানুষ—আর প্রভাবশালী মানুষরা বড় বেশি স্পর্শকাতর হয়। বেফাঁস একটা শব্দও তার প্যারস যাওয়ায় বাদ সাধতে পারে।

ইঞ্জিন বন্ধ করল ডায়াটাস, ছোট ভাইকে বলল, 'স্রেফ একটা উটকো ঝামেলা। ভয় পাবার কিছু নেই, রে, ভাই। আমার ধারণা এরা এথেন্সের টপ কোন টেররকে খুঁজছে—কানকাটা বুট্রাস বা মুলোখেকো হেক্টরের মত কাউকে। ওরা শিওর হতে চাইছে আমরা তাকে কোথাও লুকিয়ে রাখিনি। এখন, লক্ষ্মী ভাইটি—ওরা বোটে আসবার পর আমি যখন আলাপ করব, তুমি হুইলে থাকবে।'

বিশ মিনিট পর। অ্যাপডের প্রতিটি ইঞ্চি সার্চ করে কিছুই তারা পেল না। এবার আফটারডেকে ডায়াটাসের মুখোমুখি দাঁড়াল তারা। তিনজনের মধ্যে

দু'জনই বিদেশী, গ্রিক মাত্র একজন। বিদেশী দু'জনকে ভাল লাগল না ডায়াটাসের, হাবভাব কেমন যেন কসাই-কসাই। তৃতীয়, অর্থাৎ গ্রিক লোকটা খুব মোটা। সুট পরা বিদেশী লোকটা ইংরেজিতে জেরা শুরু করল। গ্রিক লোকটা দোভাষীর কাজ করছে।

'কোথায় সেই বানচোত?'

ডায়াটাস এরকম বিচ্ছিরি গালি খুব কমই শুনেছে। 'জ্বী?' ভয়ে একটা ঢোক গিলল সে। 'কার কথা বলছেন?'

'কোথায় সেই বেজন্মা মাসুদ রানা?'

'এই নামে কাউকে তো আমি চিনি না।'

'তুমি ডাহা মিথ্যেকথা বলছ। সে কয়েক ঘণ্টা আগেও এই বোটে ছিল।'

কথা না বলে অসহায় ভঙ্গিতে কাঁধ ঝাঁকাল ডায়াটাস।

মোটা-তাজা দোভাষী আবার মুখ খুলল। 'জবাব না দিয়ে তুমি পার পাবে না। আজ সকালে বিদেশী এক লোক এই বোটে ছিল। একজন বাঙালী। কি, ছিল না?'

'জ্বী। কিন্তু সে আমাকে তার নাম বলেনি। তার সঙ্গে আমার কোন লেনদেন বা কথাবার্তাও হয়নি। বাঙালী কাকে বলে তা-ও আমি জানি না।'

'এখন সে কোথায়?'

'আমার কোন ধারণা নেই। সে কোথায় যাবে না যাবে আমাকে কেন বলবে!'

'তোমার মা হায়েনার সঙ্গে ইয়ে করেছে, শালা শেয়ালের বিষ্ঠাখেকো কেঁচো। ভাল চাও তো এখনও সত্যি কথা বলো। শেষবার তাকে কোথায় দেখেছ? মিথ্যেকথা বললে তার পরিণতি–থাক, বলব না, বললে কাপড় নষ্ট করে ফেলবে।'

'শেষবার,' একটা ঢোক গিলে বলল ডায়াটাস, 'তাকে দেখেছি মাইল পনেরো দূরে। সাগরে, ভ্রাকোনিসির দক্ষিণ দিকটায়। সে আর তার বন্ধুরা আমার সঙ্গে বোট বিনিময় করল।'

'কোন্‌দিকে যাচ্ছিল তারা?'

'এর জবাব আগেই তো দিলাম। আমি জানি না।'

গ্রিক দোভাষী কথাটা তখনও ভাষান্তর করতে পারেনি, বিদেশীদের একজন তার বুকে ধাক্কা দিল। ডায়াটাস পড়ে যাচ্ছিল, তবে তাকে ধরে ফেলা হলো। মুঠোয় শার্টের কলার আটকে নিয়ে ঘনঘন প্রবল ঝাঁকি দিচ্ছে লোকটা, দাঁত-মুখ খিঁচিয়ে দুর্বোধ্য ভাষায় কী বলছে কিছুই বুঝছে না সে।

অশ্রাব্য গালিগালাজ খেয়ে আইওনিয়ান ডায়াটাস তার এলাকার অনেক বৈশিষ্ট্যই ভুলে গেছে। গায়ে হাত পড়ায় বাকিটুকুও ভুলে গেল। মনে থাকল শুধু একটা কথা–সে একজন গ্রিক, আর গ্রিকরা বীরের জাত; তাদের গায়ে হাত দেয়াটা মস্ত একটা ভুল।

ডায়াটাসের মনে হলো, তার পেশীতে যে শক্তি আছে, এক এক করে এই তিনজনকে কাবু করা তার পক্ষে সম্ভব। এই কাজে সাগরই তাকে সবচেয়ে বেশি সাহায্য করবে–একবার যাকে পানিতে ছুঁড়ে ফেলবে সে, পানি সহজে তাকে বোটে

ফিরে আসতে দেবে না।

পেশীবহুল হাত দিয়ে বিদেশী লোকটার কব্জিতে আঘাত করল ডায়াটাস, নিজেকে মুক্ত করে ধাক্কা দিল তার বুকে। লোকটা ছিটকে গিয়ে মাস্তুলের সঙ্গে বাড়ি খেলো। তারপর, নিজের সবটুকু মর্যাদাবোধ জড়ো করে, ডায়াটাস বলল, 'আমাকে আপনাদের কাগজ-পত্র দেখান। তা না হলে এখনি আমি সবাইকে বোট ছেড়ে চলে যাবার নির্দেশ দেব।'

সে থামতে না থামতে উল্টো করে ধরা পিস্তলের বাড়ি পড়ল কানের পাশে, একই সঙ্গে তলপেটে ভাঁজ করা হাঁটুর প্রচণ্ড এক গুঁতো।

ডায়াটাস প্রায় অজ্ঞান অবস্থায় ডেকে পড়ে থাকল। গলা থেকে কাতর গোঙানির ক্ষীণ আওয়াজ বেরুচ্ছে। ছোট ভাইটা প্রতিবাদ করছে, শুনতে পেল সে। তারপর একটা গুলির আওয়াজ হলো। একটু পর ঝপাৎ করে কী যেন ফেলা হলো সাগরে।

মোটা লোকটা ডায়াটাসের কানের কাছে মুখ নামিয়ে জিজ্ঞেস করল, 'কোথায় সে? মাসুদ রানা? আমরা তার মাথার একটা দাম ধরেছি। জীবিত বা মৃত এনে দিতে পারলে এক মিলিয়ন মার্কিন ডলার পুরস্কার। আর যদি সন্ধান দিতে পারো, পাঁচ লাখ ডলার নগদ। আবার জিজ্ঞেস করছি। রানা কোথায়?'

'সত্যি জানি না। জানলে বলতাম।'

এরপর একটু বিরতি। কেউ একজন কাকে যেন একটা হুকুম করল। তারপর আবার বিরতি। উপুড় হয়ে আছে ডায়াটাস, কনুই আর হাঁটুর সাহায্যে উঠে বসতে চেষ্টা করছিল–লাথি খেয়ে চিৎ হয়ে গেল। তার গোড়ালি দুটো দু'দিকে টেনে ধরল দু'জন লোক। তারপর ডান হাঁটুতে এমন একটা ব্যথা বিস্ফোরিত হলো–এত কষ্ট কোন মানুষের পক্ষে সহ্য করা সম্ভব বলে বিশ্বাস করতে পারছে না। ব্যথাটা তার শরীরের পুরো ডান দিক দখল করে নিল, যেন আগুন ধরিয়ে দিচ্ছে। এই ব্যথার তুলনায় অন্য যে-কোন ব্যথা আসলে সামান্য চুলকানি বা সুড়সুড়ি, একটু খোঁচা বা হালকা গুঁতো মাত্র।

লোহার রড দিয়ে বাড়ি মেরে ডায়াটাসের হাঁটু গুঁড়িয়ে দেয়া হয়েছে। এরকম অসহ্য যন্ত্রণায় মানুষের বমি পায়। ডায়াটাসও বমি করল।

'এবার বলো। রানা কোথায়?'

'...আমি জানি না। সে আমাকে কিছু বলেনি। ওরা বোধহয় পুবদিকে ঘুরে যায়। আমি ভাল করে খেয়াল করিনি.।'

নিজেদের মধ্যে ফিসফাস আলাপ।

'ঠিক আছে। তোমার বোটের নাম বলো, তারপর নিখুঁত একটা বর্ণনা দাও।'

তাদের নির্দেশ পালন করল ডায়াটাস। এটা মুখ বন্ধ রাখবার মত পরিস্থিতি নয়। সিলিয়ার হুবহু বর্ণনা দিল সে। খুঁটিনাটি আরও কিছু তথ্য দিচ্ছে, এই সময় আবার একটা বিস্ফোরণ ঘটল। এবার সেটা ঘটল তার মাথার ভেতর। ফলে নিভে গেল সূর্যটা।

ছয়

বোট দুটো আলাদা হবার পর রানা আর ওর সঙ্গীরা পুবদিকে গেছে, ডোমিনিক ডায়াটাসের এই ধারণা ভুল ছিল না, কিন্তু র-র যে এজেন্টরা তাকে ধরেছিল তাদের জন্যে এই তথ্য কোন উপকারে আসবে না।

বোট হাতবদলের পর অ্যাপড় দিগন্তরেখার ওপারে হারিয়ে যাওয়া মাত্র ইউটার্ন নিয়ে সোজা ভ্রাকোনিসির দিকে ছুটল সিলিয়া, হুইলে রয়েছে সিকান্দার। বিকেল তিনটের দিকে দ্বীপটার দক্ষিণ তীরের ছোট একটা বে-তে নোঙর ফেলল ওরা–সাগরপথে পুব প্রান্তের আইলিট থেকে পুরো আট মাইল দূরে। বে-তে দশ-বারোটা ছোট আকারের জলযান দেখা যাচ্ছে, তীরে অল্প কিছু লোকজন।

জায়গাটাকে ঠিক বে বলা চলে না, যেন তীররেখা ভেঙেচুরে এবড়োখেবড়ো একটা গর্ত তৈরি করা হয়েছে। এক কোণে, ওয়াটার-লাইনের ঠিক ওপরে, একটা গ্র্যানিট শেলফ, সরু হলেও সমতল; ল্যান্ডিঙের সমস্যা অনেক সহজ করে দিয়েছে। ওটার পাশে নুড়ি ছাড়ানো বারো গজ লম্বা ঢালু সৈকত। ইনলেটের আরেক দিকে অদ্ভুত দর্শন রক-ফরমেশন, এদিকের প্রায় সব দ্বীপেই সাধারণ যেমনটি দেখা যায়–গুহামুখ আর অকৃত্রিম খিলান, চৌকো টাওয়ারসদৃশ পাথুরে স্তম্ভ, অদৃশ্য একটা ব্রিজ-এর ধ্বংসাবশেষের মত নিঃসঙ্গ পাথরের স্তূপ–খয়েরি, তামাটে, পাঁশুটে আর জলপাই-সবুজ রঙের। কোন কোন গুহার ভেতর প্রাচীন আমলের প্রাসাদ তৈরি করা যাবে। খিলানের ভেতর ঢুকে যাবে পাল তোলা জাহাজ। এ-সবের ওপরে জমিন বা মাটি ভ্রাকোনিসির অন্য জায়গার তুলনায় দুর্গম নয়–কিছু জায়গার মাটি কেটে সমান করবার পর আঙুরের চাষ করা হয়েছে। আরও আছে সুগন্ধ পাতা নিয়ে মারটল্ ঝোপ, চিরহরিৎ গুল্ম বা কাণ্ডহীন লতা।

আর কোথাও যাওয়া-যাওয়ি নেই, এরকম একটা ভাব দেখিয়ে ছেঁড়া-ফাটা ক্যানভাসের পর্দাটা ফেলে দিল সিকান্দার–আশপাশ থেকে তিনজনকে আড়াল দেয়া হলো, রোদও ঠেকানো গেল। 'এখানে আমরা নিরাপদ,' বলল সে। 'পুণ্যস্নানের লোভে দু'চারজন করে লোক সব সময় আসছে এখানে। আল্লাহ ওদেরকে আলো দিন–পাহাড়ের মাথায় ওদের একটা খুদে মন্দির আছে। হাঁটাচলা করায় একটা পথ তৈরি হয়েছে, ভ্রাকোনিসিতে যা প্রায় দেখাই যায় না। তবে জায়গাটা খুব ছোট।'

'মন্দির থেকে এই বে দেখা যায়?' জিজ্ঞেস করল রানা।

'না,' জবাব দিল সিকান্দার। 'এত ছোট একটা বোট, কারও বিশেষ নজরে পড়বে বলে মনে করি না। আমার চিন্তা ফুয়েল নিয়ে। যা আছে তাতে ত্রিশ মাইলের বেশি চলবে না। রাত নামবার পর আমরা কি চট করে একবার বন্দর ঘুরে আসব?'

মাথা নাড়ল রানা। 'না। আমরা ধরেই নিয়েছি হারবারে ওদের একজন লোক আছে। আজ রাতে দু'জন থাকবে। বন্দরে গেলেই কাভার নষ্ট হয়ে যাবে। তাছাড়া কাল তো যত খুশি ফুয়েল নিতে পারবই আমরা।'

মরচে ধরা ঢাকনি তুলে কুলার থেকে বিয়ারের ক্যান বের করল সিকান্দার।

ভাঁজ করা হাঁটুতে চিবুক ঠেকিয়ে ডেকে বসে রয়েছে আমিনা। ওর সামনে দাঁড়িয়ে একটা ছুরির ধার পরীক্ষা করছে রানা।

ক্যান থেকে সরাসরি দু'ঢোক বিয়ার খেয়ে সিকান্দার বলল, 'হ্যাঁ, মিস্টার রানা, আপনার ব্যাট্‌ল্‌-প্ল্যানটা আরেকবার শোনান আমাকে, প্লিজ।'

ছুরিটা জায়গামত রেখে দিল রানা, তারপর সরে এসে আমিনার পাশে ডেকে বসল, সিকান্দারের দিকে মুখ করে। 'এখান থেকে আমরা আটটার সময় রওনা হয়ে উত্তর তীর ঘুরে এগোব। তাড়াহুড়ো না করলেও সেই ছোট্ট সৈকতে দশটার মধ্যে পৌঁছে যাব আমরা...'

আগের চেয়েও চিন্তিত দেখাচ্ছে, রানার কথার মাঝখানে মাথা নাড়ল আমিনা। 'আমি আবারও বলছি, আরও দেরি করে রওনা হওয়া উচিত। ওইসময় সবাই জেগে থেকে পাহারা দেবে।'

'শুধু তখন নয়, আজ সারারাতই পাহারা দেবে ওরা। পাহারা না দিলে মনে করতে হবে আমরা যাব বলে আশা করছে না। ওদের সময়-সূচি আমরা জানি না, সেজন্যেই দেরি করাটা বোকামি হবে। আর দশটার দিকে চারদিকে অনেক বোট থাকবে, সিলিয়াকে বিশেষ কোন-বোট বলে মনে হবে না।'

এক মুহূর্ত ইতস্তত করে আমিনা বলল, 'তোমার কথায় যুক্তি আছে। ঠিক আছে, তারপর?'

'সিলিয়ার বো সৈকতে তুলে দিয়ে ওটাকে দড়িদড়া দিয়ে বাঁধতে হবে। মিস্টার সিকান্দার, ঠিক জানেন তো, এটা সম্ভব কি না?'

'সম্ভব না হলেও সম্ভব করতে হবে। অ্যাঙ্কর-চেইন নাড়াচাড়া করবার ঝুঁকি আমরা নিতে পারি না। এটা আপনি আমার ওপর ছেড়ে দিন।'

'তারপর আমরা পাহাড়ী পাঁচিল বেয়ে ওপরে উঠব। শুনে যতটা কঠিন মনে হচ্ছে ততটা কঠিন নয় আসলে। তবে সঙ্গে টমি-গান নেওয়ার জন্যে স্লিং দরকার হবে—হাত দুটো খালি থাকা চাই।'

মাথা ঝাঁকাল সিকান্দার। 'এটাও আমার কাজ। কোন ব্যাপার নয়।'

একটা চার্টের পিছনে আঁকা স্কেচ-প্ল্যানটার ভাঁজ খুলে ডেকে রাখল রানা। 'এখানে দেখুন।' স্কেচ-ম্যাপে তর্জনী রাখল ও। 'পাথরের এই শেলফটায় ভারতীয় লোকটাকে মেরেছিলেন আপনি। এরপর পড়বে যে দুর্গম জায়গাটার কথা বলেছি আপনাদের। দুর্গম, তবে অগম্য বা বিপজ্জনক নয়। তারপর...'

দশ মিনিট ধরে শত্রুদের আস্তানায় পৌঁছাবার পথ, সম্ভাব্য বাধা, চারপাশের পরিবেশ ইত্যাদি সম্পর্কে একটা ধারণা দিল রানা। 'আমরা অপেক্ষা করব এখানে,' অবশেষে বলল ও, যে াথুরে নালাটা বাড়িটার দিকে চলে গেছে সেটার শেষ বাঁকে আঙুল তাক করল। 'মিস্টার সিকান্দার আর আমি পাহাড়ের আরও

ওপরে উঠব, তারপর সরে গিয়ে এমন একটা পজিশনে পৌঁছাব যেখান থেকে এক ছুটে পিছনের টেরেসে নামা যায়।'

'সেরকম একটা পজিশনে পৌঁছাতে কতক্ষণ সময় লাগবে তোমাদের?'

'ওটাই হবে আমাদের অ্যাসল্ট স্টেশন, এই ধরো মিনিট পনেরোর মধ্যে পৌঁছে যাব। ওই সময়ের মধ্যে তুমি, আমিনা, নালা ধরে এগিয়ে যাবে, আড়াল নেবে যে তেকোনা পাথরটার কথা বলেছি সেটার পিছনে। আমরা যদি কিছু করবার সুযোগ পাই, ওখান থেকে শুনতে পাবে তুমি।'

'তারপর? আমি তখন কী করব?'

'গোলাগুলি শুরু হবার পর তোমার কাজ হবে ধীরে ধীরে গুণতে শুরু করা। বাড়ির বাইরে কাউকে যদি দেখতে পাও, সঙ্গে সঙ্গে গুলি করবে। তারপর আড়াল থেকে বেরিয়ে পাশের দরজা দিয়ে বাড়ির ভেতর ঢুকবে। পজিশন নেবে সিঁড়ির গোড়ায়, কাভার দেবে করিডরের দু'পাশের কামরাগুলো। আমরা দু'জন ওখানে দেখা করব তোমার সঙ্গে। অচেনা যাকেই দেখো, সঙ্গে সঙ্গে খুলি উড়িয়ে দেবে—তুমি নিশ্চিত থাকতে পারো, আমার বসকে ওরা বাড়ির ভেতর স্বাধীনভাবে ঘুরে বেড়াতে দেবে না।

'কিন্তু যদি বাড়ির বাইরে কাউকে দেখতে না পাও, ত্রিশ পর্যন্ত গোণার পর পাশের দরজা দিয়ে ভেতরে ঢুকবে তুমি। যদি ভেতরে গোলাগুলি চলে, তবেই। গোলাগুলি না হবার মানে দাঁড়াবে আমাদের অ্যাসল্ট ব্যর্থ হয়েছে। সেক্ষেত্রে যে পথ দিয়ে এসেছ সেই পথ ধরেই ফিরে যাবে, সিলিয়ায় উঠে পালাবে—দড়ি-দড়া খুলতে সাহায্য করবেন উনি, দেখিয়ে দেবেন কীভাবে মোটর স্টার্ট দিতে হয়। পালাবার সময় আইলিট থেকে যতটা সম্ভব দূরে থাকবে। কোন প্রশ্ন? গুড, এখন তাহলে যতটা পারা যায় বিশ্রাম।'

সিটের কুশন সাজিয়ে তৈরি করা বিছানায় আমিনার পাশে ঘুমাচ্ছে রানা। কেউ আদাজল খেয়ে তাড়া করলে ঘুম আর ভাল হয় কী করে। আকৃতিবিহীন একটা প্রাণী—আসলে কাঠামোটা এতই ফ্যানটাসটিক যে চেনা দুষ্কর। ওটার হাত থেকে বাঁচার জন্যে নিখুঁত মসৃণ মার্বেলের তৈরি একটা প্রান্তর ধরে প্রাণপণে দৌড়াচ্ছে ও। প্রান্তরের শেষ মাথায় গাছপালার জ্যামিতিক সারি, সবগুলো এক রকম দেখতে, যেন ছাঁচে ঢেলে তৈরি করা। সারির ভেতর দিয়ে রানার ছোটার সময় গাছগুলো একের পর এক নিঃশব্দে বিস্ফোরিত হয়ে শিখায় পরিণত হচ্ছে, তারপর কিছুই অবশিষ্ট থাকছে না। কে এই কাজ করছে দেখবার জন্যে পিছন ফিরে তাকাতে অদ্ভুত একটা পাঁচিল দেখতে পেল—প্রতিটি ইঁটের মাপের সঙ্গে মিল রেখে ওই একই রকম চওড়া পলস্তারা ব্যবহার করা হয়েছে। দূর থেকে ভেসে আসা একটা চাপা গর্জন কানে বাজছে, তারপরই পাঁচিলটা ওর দিকে কাত হতে শুরু করল। ওটা ধসে পড়বার আগেই নিজের ওপর জোর খাটিয়ে ঘুমটা ভাঙাল রানা, কিন্তু চাপা গর্জন তারপরও শুনতে পাচ্ছে। এই আধো ঘুমের মধ্যেও, অযৌক্তিক কাণ্ডকারখানা মেনে নিতে না পেরে, বিছানার ওপর উঠে বসল ও, পর্দাটা মুচড়ে

একপাশে সরিয়ে বাইরে তাকাল।

সামনের দৃশ্য অপ্রাসঙ্গিক মনে হলো। স্বপ্নটার স্মৃতি অস্পষ্ট হলেও মনটাকে দমিয়ে রেখেছে, চোখে ঘুম-ঘুম ভাব নিয়ে রানা দেখল বড়সড় খুব দামী একটা বাদামী মোটর-বোট বে-তে ঢুকছে। ধনী একদল লোক, সন্দেহ নেই–সমুদ্র-স্নানের জন্যে জায়গা খুঁজছে। অলস ভঙ্গিতে মোটর-বোটটার ডেকে চোখ বুলাল ও। দেখবার মত বিশেষ কিছুই নেই ওখানে। কোন রকম নড়াচড়া না, না কারও প্রকাশ্য উপস্থিতি। এতবড় জলযানটাকে যেন রিমোট কন্ট্রোলের সাহায্যে দূর থেকে চালানো হচ্ছে।

–চোখ মেলে রাখতে এখনও কষ্ট হচ্ছে, পর্দা ফেলে দিয়ে ঘুমের জগতে ফিরে গেল রানা। এরপর আবার চাপা গর্জন ছাড়ল মোটর-বোটটার ইঞ্জিন, তবে সেটা রানা শুনতে পেল না। রহস্যময় উদ্দেশ্য পূরণ হয়েছে, পিছিয়ে তীর থেকে সরে যাচ্ছে ওটা, ধীরে ধীরে অ্যাঙ্কারিজ ত্যাগ করল। দুশো গজ পুবে ছোট একটা ইনলেটে মোটর-বোটটার আগমন ঘটেছে, এটা রানার জানার কথা নয়। জানার কথা নয় বে-র ওদিকের কিনারায় স্তূপ হয়ে থাকা রঙিন পাথরের রাজ্যে একজন অবজারভারকে চারদিকে নজর রাখার দায়িত্ব দেয়া হয়েছে।

তারপর যখন রানার ঘুম ভাঙল, আলো এমন নিষ্প্রভ আর বিষাদময় হয়ে উঠেছে যে শেষ বিকেলটাকে ভোরের প্রথম প্রহর বলে ভাবতে ইচ্ছে করে। গভীর নিদ্রা থেকে চট করে পুরোপুরি সজাগ হয়ে উঠল আমিনা। ধীর ভঙ্গিতে মিট-মিট করে রানার দিকে তাকাল সে।

'এখন আমরা কী করব?'

'আমরা কী করব জানি না,' বলল রানা, কাছে টেনে এনে চুমো খেলো আমিনাকে। 'শুধু জানি আমি কী করব।'

'শুনি?'

'সাঁতার কাটব।'

'ওই কাজটা তো আমিও করব।'

সিকান্দার অঘোর ঘুমে আচ্ছন্ন, এই সুযোগে কয়েক সেকেন্ডের মধ্যে সম্পূর্ণ বিবস্ত্র হয়ে অবিশ্বাস্য পরিষ্কার ও স্বচ্ছ পানিতে ডুব দিল ওরা। তারপর পানির ওপর মাথা তুলে হাসল।

'তোমার এত সাহস?' জিজ্ঞেস করল রানা। 'আমার তো ধারণা ছিল দুনিয়ার সামনে নগ্ন হবার চাইতে গ্রিক মেয়েরা আত্মহত্যা করাটাকেই শ্রেয় বলে মনে করবে।'

মিষ্টি গলায় হাসল আমিনা। 'এ থেকেই বোঝা যায় কত কম বোঝো তুমি। গ্রিক মেয়েদের ওটা ভদ্রতা বা লজ্জা নয়, সামাজিক দায়বদ্ধতা। এখানকার কেউ জানে না আমি কে। সবাই এত দূরে যে সত্যিকার অর্থে আমার পর্দা নষ্ট হচ্ছে না–ভাল করে কেউই আমাকে দেখতে পাচ্ছে না।'

'শুধু আমি ছাড়া।'

'একটা মেয়ে আসলে দুনিয়ার সামনেও নগ্ন হতে পারে,' রানার প্রশ্নের উত্তর

না দিয়ে বলল আমিনা।

'সেটা কী রকম?' রানা অবাক হয়ে জানতে চাইল।

'সে যদি কোন পুরুষকে নিজের দুনিয়া বলে মনে করে।' কথা বলবার সময় বোটের কাছ থেকে সরে যাচ্ছিল আমিনা, এই মুহূর্তে খোলা সাগরের দিকে সাঁতরাচ্ছে–তার ব্রেস্ট-স্ট্রোক এতটাই নিয়মের ছন্দে বাঁধা আর জোরাল, দেখে মনে হলো শক্তির ব্যবহার এখানে যথাযথ ও পরিমিত। রানা মুগ্ধ না হয়ে পারল না। প্রতিটি বাঁকে মেয়েটা প্রমাণ করে দেখাল তার অঙ্গ-সঞ্চালনে সাবলীলতার কোন অভাব নেই। ওই একই সাবলীল দক্ষতার সঙ্গে তার পিছু নিল রানা, বিস্মিত হয়ে আবিষ্কার করল, আমিনার পাশে পৌঁছাতে নিজের ওপর জোর খাটাতে হচ্ছে।

পাশে পৌঁছাবার পর আমিনার স্পীডেই থাকল রানা, দু'জন এগোল আরও প্রায় একশো গজ। ওদের শরীর আর হাত-পা বরাবর পানি যেন হড়কে যাওয়া সিল্ক। নিচে আবার তার অন্য বৈশিষ্ট্য–অন্ধকার আর গাঢ়; রানা আন্দাজ করল, এরই মধ্যে গহন গভীরতার ওপরে চলে এসেছে। ওরা যখন থামছে, মুখে হিম বাতাসের ক্ষীণ একটু ছোঁয়া অনুভব করল রানা–প্রকৃতির তরফ থেকে এবছর এই প্রথম মনে করিয়ে দেয়া, গ্রীষ্ম চারদিকের সব কিছুকে রাঙিয়ে তোলে ঠিকই, কিন্তু তা আসলে চিরস্থায়ী নয়।

পরস্পরের মৌন সম্মতিতে একযোগে ঘুরে বোটের দিকে ফিরে আসছে ওরা। কঠিন ব্যায়াম করা নয়, উদ্দেশ্য ছিল শরীরটাকে জড়তামুক্ত আর সতেজ হয়ে উঠতে সাহায্য করা।

কিছুক্ষণ পর সাগরের চিকচিকে সাদা তলা আবার দেখতে পাওয়া গেল। হঠাৎ রানার প্রবল ইচ্ছে হলো সেদিকে ডাইভ দেয়–আধো অন্ধকার, ঠাণ্ডা, নিরিবিলি জলমগ্ন যে জগৎটাকে সে ভালবাসে সেখানে প্রবেশ করে।

কিন্তু না, এখন নয়। ওর ওপর দায়িত্ব চেপেছে একা পাহাড় ঠেলে সরাবার মত কঠিন একটা কাজের। এই কাজে ব্যর্থ হলে ওর বেঁচে থাকাটা অর্থহীন হয়ে যাবে। সম্ভাব্য অপরাধবোধের যে ওজন হবে, আত্মহত্যা করে ফেলাটাও বিচিত্র কিছু নয়।

ঘুম ভাঙার পর ডেকের কিনারায় আমিনার কাপড় পড়ে থাকতে দেখে বুদ্ধি করে বোটের আরেকদিকে গিয়ে বসেছে বুড়ো সিকান্দার। ওরা বোটে উঠে কাপড়চোপড় পরবার খানিক পর এগিয়ে এল সে; চেহারায় খারাপ-ভাল কোন প্রতিক্রিয়া নেই, থাকলে আছে দায়িত্ববান ও কর্মঠ লোকের ব্যস্ত ভাব। 'এখন, আমিনা,' বলল সে, 'আলো থাকতে থাকতে আবার একবার দেখিয়ে দিই টমি-গানটা কীভাবে অপারেট করতে হবে। এ-বোটের বাইক-ল্যাম্পগুলো কোন কাজের নয়।'

আটটার কিছু আগে অস্ত্র চালানোর ট্রেনিং শেষ করল আমিনা। এখন সে অন্ধকারে, শুধু স্পর্শের সাহায্যে, ম্যাগাজিন বদল করতে পারবে।

রানা ওর ব্যাটল-প্ল্যানটা ওদের মুখ থেকে বিস্তারিত আরেকবার শুনতে

চাইল, সব মনে রেখেছে কি না পরীক্ষা করবে। সিকান্দার আর আমিনা, দু'জনেই ভালভাবে উতরে গেল। এরপর সসেজ, ভেজিটেবল, ফ্রুটস সহ রুটি আর পনির দিয়ে ডিনার সারল ওরা। উঠে গিয়ে নোঙর তুলল সিকান্দার। শিফট লিভারে চোখ, আমিনার দিকে তাকাল সে–চোখাচোখি হতে দুর্বোধ্য ভাষায় কী যেন বলল।

জবাবে ডেকে বসে মাথা নিচু করল আমিনা।

'দুঃখিত,' এবার রানাকে উদ্দেশ্য করে বলল সিকান্দার। 'এটা আমাদের একধরনের ধর্মীয় সংস্কার। কঠিন কোন কাজে রওনা হবার আগে চোখ বুজে আল্লাহকে একবার স্মরণ করা।'

'এটা দুঃখ প্রকাশ করবার মত কোন ব্যাপার নয়,' বলে ওদের মত রানাও চোখ বুজে প্রার্থনা করল এক মিনিট।

শুরুটা ঘড়ির কাঁটা ধরে হলো। প্রথম পর্বের প্রতিটি ঘটনা খুঁটিনাটি সহ গাঁথা হয়ে গেল রানার স্মৃতিতে।

অন্ধকার, নিঃশব্দ বে থেকে বেরিয়ে এল ওরা। তারপর প্রথমে বাঁক নিল উত্তরে, পরে পশ্চিমে। চাঁদের আলোয় ঘটনাবিহীন দীর্ঘ যাত্রা–বিরাট পাহাড় সমান অন্ধকারের বিস্তৃতিতে ছেদ ফেলেছে ছোট্ট গ্রামের মিটমিটে আলো, খুদে অ্যাঙ্কারিজ, নিঃসঙ্গ একটা বাড়ি। মাঝে মধ্যে ওদের মত ছোট দু'একটা বোটের পাশ কাটানো, বাতাসে ডিজেল ইঞ্জিনের তৈরি একঘেয়ে কাঁপুনি। সিলিয়ার বো থেকে দু'পাশে ছড়িয়ে পড়া সাদা রঙ, অর্থাৎ ফেনা। সব কিছু যেন নির্ধারিত আর অপরিবর্তিত।

তারপর হাল ধরে সিটে বসে থাকা সিকান্দার মুখ খুলল। 'কোথায় ভুল হয়েছে জানি না, তবে সম্ভবত কেউ আমাদের পিছু নিয়েছে। নিশ্চিত হওয়া সহজ নয়। ওদিকে, ছয় কি সাতশো গজ পিছনে।' হাত তুলে দেখাল সে, সেটা অনুসরণ করে তাকাল রানা। 'বড়সড় কোন বোট। কতক্ষণ ধরে পিছু নিয়েছে বলতে পারব না। অস্বস্তিকর।'

শুধু রানিং লাইট জ্বলছে, তাসত্ত্বেও গাঢ় আকৃতিটা চিনতে অসুবিধে হলো না। তীর থেকে দূরে ওটা ছাড়া এই মুহূর্তে আর কোন জলযান নেই। শত্রু, আদৌ যদি সে শত্রু হয়, নিশ্চয়ই সময়ের সঙ্গে বাজি ধরে জিতে গেছে। হাতঘড়ির ডায়ালে চোখ বুলাল রানা, তারপর তীরের দিকে তাকাল। 'ডাঙার দিকে ঘুরুন। সবটুকু স্পীড চাই আমি,' সিকান্দারকে বলল ও। 'ল্যান্ডিং পয়েন্ট থেকে খুব বেশি হলে দু'মাইল দূরে আমরা। পানির চেয়ে ডাঙায় আমরা বেশি সুবিধে পাব।'

'যদি পৌঁছাতে পারি। দু'মাইল অনেক দূর।'

'আমাদের সঙ্গে ঘুরছে ওটা,' কাঁধের ওপর দিয়ে একবার তাকিয়ে বলল আমিনা। 'আর কোন সন্দেহ থাকল না। গতিও এখন অনেক বেড়ে গেছে।'

'হুইলটা ধরো, আমিনা,' বলল সিকান্দার। 'মিস্টার রানা, একবার আলো জ্বালতে পারি? ধন্যবাদ। এটা থেকে আমি গভর্নর খুলে নিচ্ছি।' ইঞ্জিন-কাভার খুলে টুল ট্রে হাতড়াতে শুরু করল।

স্টার্নের দিকে ফিরে অনুসরণরত গাঢ় আকৃতিটার দিকে তাকাল রানা। দূরত্ব এখন এক ফার্লং-এর বেশি হবে না, তা-ও দ্রুত কমে আসছে। ব্যথা টের পাচ্ছে না, মুঠো করা হাতের নখ তালুতে বিঁধে যাচ্ছে। ওদের সামনে আশার আলো এত ক্ষীণ যে না থাকারই মত। সিলিয়ার খোলা ডেক কোন আড়ালই দেবে না। আস্তিনেও কোন তাশ বা কৌশল নেই। কীভাবে ওদেরকে চিনতে পারল ভাবতে গিয়ে রাগে গরম হয়ে উঠল মুখ। হয়তো ডায়াটাস...

হঠাৎ ইঞ্জিনের আওয়াজ কাঁপা-কাঁপা কান্নার মত বিরতিহীন আর ঘ্যান্‌ঘ্যানে হয়ে উঠল, সেই সঙ্গে সিলিয়া যেন সামনে ঝুঁকে পানিতে নাক ডোবাল। ডেকের আলোগুলো নিভিয়ে আফট্-এ চলে এল সিকান্দার। 'এক কি দু'ঘণ্টার মধ্যে ইঞ্জিনটা বাতিল লোহা হয়ে যাবে। তবে আশা করছি অতক্ষণ ওটাকে আমাদের লাগবে না। তো করবটা কী, ক্যাপটেন? অকাতরে বিলিয়ে দেব প্রাণ?' মাথা নাড়ল সে; চোখে বেপরোয়া দৃষ্টি, মুখে ঠোঁট বাঁকানো ধারাল হাসি।

রানা তাকে মোড়ক খুলে লী এনফিল্ড রাইফেলটা বের করতে দেখল। ব্রীচ খোলবার শব্দ হলো। ম্যাগাজিনে .303-এর একটা ক্লিপ ঢোকাল সিকান্দার, ঠেলে জায়গামত বসিয়ে দিল বোল্ট। নির্ভেজাল রিফ্লেক্স, রানার ডান হাত পিছন দিকে এসে নিতম্বের কাছে ঝোলানো ওয়ালথারটা স্পর্শ করল। মাথায় কোন প্ল্যান তৈরি হয়নি, তবে হতাশা কেটে গেছে।

'সবই নির্ভর করছে ওরা কী চায় তার ওপর,' বলল ও। 'ওরা যদি স্রেফ উড়িয়ে দিতে এসে থাকে, আমাদের কিছু করবার থাকবে না। আর যদি জ্যান্ত ধরতে চায়, কিছুক্ষণ ঠেকিয়ে রাখতে পারব।'

সিকান্দারের গলার ভেতর ঘড়ঘড় আওয়াজ হলো। তারপর সে বলল, 'আসলে কী, একটু পরই জানা যাবে। ওরা তো...'

কথাটা শেষ করবার সময় পাওয়া গেল না, কারণ সেই মুহূর্তে এক ধরনের শব্দহীন বিস্ফোরণের মত ওদের চারপাশের সমস্ত কিছু লাফ দিয়ে কঠিন, চোখ-ধাঁধানো উজ্জ্বলতার উৎস হয়ে উঠল যেন। রানার অনুভূতি হলো—নির্দয়তার শিকার এবং সম্পূর্ণ অসহায়। দশ লাখ মোমবাতির শক্তি নিয়ে একশো গজ দূর থেকে তাক করা সার্চলাইটের আলো কারও আত্মবিশ্বাসে কী রকম আঘাত হানতে পারে শত্রুরা তা জানে, সেজন্যেই অসহনীয় সেই দীপ্ত উজ্জ্বলতা নিঃশব্দে স্থায়ী হলো পুরোপুরি পনেরো সেকেন্ড। সম্ভাব্য সব রকম উপায়ে পরিস্থিতির সঙ্গে লড়ল রানা—চোখ শক্ত করে বুজে থাকল, হাতড়ে থম্পসনটা খুঁজে পেয়ে গুলি করবার পজিশনে নিয়ে এল। এতক্ষণে একটা চড়া গলা শোনা গেল। স্পষ্টই বোঝা গেল যে একজন গ্রিক কথা বলছে, তবে ইংরেজিতে।

'হল্ট! এই মুহূর্তে থামুন! তা না হলে আপনারা মারা পড়বেন!'

'আপনি চান ওই আলোটা নিভিয়ে দিই, মিস্টার রানা?' জানতে চাইল সিকান্দার।

'আপাতত থাক। আপনি নিচু হন। তুমিও, আমিনা। ওরাই ঠিক করুক এরপর কী করবে।'

আরও পনেরো সেকেন্ড পার হয়ে গেল বা যাচ্ছে। তীরের দিকে ছুটছে সিলিয়া। তারপর হঠাৎ ঠাস-ঠাস চড় কষবার মত শব্দ করে গর্জে উঠল একটা সাব মেশিনগান। ওদের সামনের পানি থেকে থপ্ থপ্ আওয়াজ উঠে এল।

'এরপর আর বুঝতে বাকি থাকে না কারা আমাদের সঙ্গে লাগতে এসেছে। র–জেনারেল মাধব সিন্ধিয়ার লোকজন।'

'আপনি বলতে চাইছেন সিআইএ বা মোসাদ প্রকাশ্যে এভাবে বেরোবে না?' সিকান্দার জিজ্ঞেস করল।

মাথা ঝাঁকাল রানা। কী করতে হবে এখন ও জানে। কথা বলে গেল ঝড়ের বেগে। 'আমাদের হাতে অল্পই সময় আছে। সরাসরি আমাদেরকে গুলি করবার আগে ইতস্তত করবে ওরা, কারণ নিশ্চয়ই জীবিত অবস্থায় ধরবার হুকুম আছে ওদের ওপর–যদি সম্ভব হয়। আমরা যতক্ষণ পারি এখানে আছি। তারপর একটাই কাজ করবার থাকবে। হুইল কিছুর সঙ্গে বেঁধে কিনারা থেকে চুপিচুপি পানিতে নেমে যাব, তারপর সাঁতার কেটে উঠতে চেষ্টা করব তীরে। তীর থেকে এখনও বোধহয় দেড় মাইল দূরে আমরা। আপনি পারবেন, মিস্টার সিকান্দার?'

'পারা উচিত। এরচেয়ে বেশি দূরত্বও পেরিয়েছি।'

'আমরা আপনার জন্যে অপেক্ষা করব। রাইফেলটা রেডি রাখুন।'

'ওটা রেডিই আছে।'

আবার লাউডহেইলার থেকে চড়া কণ্ঠস্বর ভেসে এল। 'এই মুহূর্তে বোট থামান, তা না হলে এবার আপনাদেরকে গুলি লাগবে।'

'আমি ওদেরকে দেরি করিয়ে দিচ্ছি,' বলল রানা। সাহসে ভর করে যতক্ষণ পারা গেল ততক্ষণ চুপ করে থাকল ও, তারপর চিৎকার করে বলল, 'ঠিক আছে। আমরা সারেন্ডার করতে রাজি আছি। তবে এই শর্তে যে আমার সঙ্গে যে মেয়েটা আছে তাকে আপনারা ছেড়ে দেবেন। এখানে যা কিছু ঘটছে, এ-সবের সঙ্গে তার কোন সম্পর্ক নেই।'

বিরতি। এক দুই করে মূল্যবান সেকেন্ডগুলো পার হচ্ছে। তারপর জবাব ভেসে এল। 'কোন শর্ত মানা হবে না। আপনাদের সবাইকে এই মুহূর্তে সারেন্ডার করতে হবে।'

'আমার দাবি মেয়েটাকে আপনারা ছেড়ে দেবেন।'

এবার অল্প একটু বিরতির পর শোনা গেল, 'দশ সেকেন্ডের মধ্যে ইঞ্জিন বন্ধ করুন। তা না হলে সরাসরি গুলি করা হবে।'

'পাঁচ পর্যন্ত গুনুন, সিকান্দার। আমিনা, উনি লাগাতে পারলে দ্রুত হুইল ঘোরাবে তুমি।'

দম আটকে একটা চোখ আধ-খোলা রাখল রানা। আলো তীক্ষ্ণ তীর হয়ে ওর খুলির ভেতর সেঁধোচ্ছে। পাশের রাইফেল গর্জে উঠতে ওর হাতেও জ্যান্ত হয়ে উঠল থম্পসন। কাউকে লাগাতে পারবে, এরকম আশা কেউই করছে না; উদ্দেশ্য গানারদের ভয় দেখিয়ে পজিশন থেকে সরিয়ে দেয়া। সিকান্দারের দ্বিতীয় বুলেটটা

লাগল, সার্চলাইট নিঃশেষে নিশ্চিহ্ন হয়ে গেল।

দ্রুত হুইল ঘোরানোয় বুনো জন্তুর মত লাফ দিল সিলিয়া। এরপর বিরতি এত কম, একজোড়া হার্টবিটের মধ্যবর্তী সময়ের চেয়ে বেশি হবে না। কামান দাগার গম্ভীর আওয়াজে বুকের রক্ত ছলকে উঠল। গোলাটা পড়ল মাত্র কয়েক ফুট দূরে, লাফিয়ে ওঠা পানিতে রানার মাথা আর কাঁধ ভিজে গেল। এখনও আটকে রেখেছে বুঝতে পেরে হাঁপানোর শব্দ করে দম ফেলল ও।

বিজয়ের আনন্দে হেসে উঠে নেভিগেশন লাইটগুলো একের পর এক টান দিয়ে ছিঁড়ে বোট থেকে পানিতে ফেলে দিচ্ছে সিকান্দার। 'বেশ কিছুক্ষণ বাদুড়ের মত কানা হয়ে থাকবে ওরা। তবে মুশকিল হলো, ওদের কেউ যদি নিজেদের ইঞ্জিন বন্ধ করে দেয়ার কথা ভাবে, আমাদের আওয়াজ শুনতে পাবে। তার আগের সময়টা আমরা কাজে লাগাই। ফেরো, আমিনা–আগের কোর্স ধরো। এই তো!'

আরও দু'বার কামান গর্জে উঠল, তবে শেলগুলো পড়ল পঞ্চাশ আর ষাট গজ দূরে।

'স্রেফ রাগ দেখাচ্ছে। নিন, মিস্টার রানা–মেডিসিন মনে করে এক ঢোক গিলে ফেলুন। পানিতে নামবেন তো, সত্যি প্রয়োজন।'

বাড়িয়ে ধরা ব্র্যান্ডির বোতলটা নিল রানা। ওর হাত থেকে চলে গেল আমিনার হাতে। তরল আগুন সারা শরীরে শক্তি আর আরাম ছড়িয়ে দিল, মনে যোগান দিল সাহস; তবে কথা বলবার সময় কণ্ঠস্বর শোনাল তিক্ত। 'এখন আমাদেরকে নিরস্ত্রই বলা যায়। তীরে পৌঁছাবার পর এগুলো কোন কাজে আসবে না, অর্থাৎ এখনি সাগরে ফেলে দিলেও পারি। একমাত্র অস্ত্র বলতে থাকবে শুধু আমার ছুরিটা।'

'এত হতাশ হয়ো না তো।' রানার কাঁধে একটা হাত রাখল আমিনা। 'এই মুহূর্তে আমাদের প্রথম কাজ নিরাপদে তীরে পৌঁছানো। কাজটা সহজ নয়, কাজেই মনোযোগ দাবি করে। এসো, আগে হাতের এই কাজটা শেষ করি।'

'খাঁটি কথা,' বলল সিকান্দার, গম্ভীর হয়ে আছে। 'খুব সহজে ওরা সার্চলাইটটা মেরামত করতে পারবে বলে মনে করি না। আবার ওটা জ্বলে উঠলে আমরা শেষ।' অন্ধকারে চোখ বুলাল সে। 'বাহ্! ভুল কোর্স ধরে তীরের দিকে ছুটছে। রসো, দেখি···আমার মনে হচ্ছে থামছে ওরা। হ্যাঁ। ইঞ্জিন বন্ধ করে দিয়েছে। এটাই আমাদের পানিতে নামার সময়। একসঙ্গে নয়। আগে থাকবে যে সবচেয়ে ভাল সাঁতরায়।'

'রাইট,' সায় দিল রানা। 'সঙ্গে জুতো নেবে সবাই, তা না হলে হাঁটা যাবে না।' নিজের জুতো জোড়া খুলে কোমরের বেল্টে গুঁজে নিল। 'আমি চললাম।'

'তারপর আমিনা বেটি, সবশেষে আমি। বে-র কোন দিকটা কেমন ওকে আমি বুঝিয়ে দিচ্ছি। আপনি নেমে পড়ুন, মিস্টার রানা। তীরে দেখা হবে, ইনশাল্লাহ।'

'গুড লাক।' সিকান্দারের সঙ্গে হ্যান্ডশেক করল রানা, হালকা একটা চুমো

খেলো আমিনার কপালে। নিতম্বের কাছ থেকে ওয়ালথারটা নিয়ে বোটের কিনারা থেকে ফেলে দিল ও। তারপর নেমে পড়ল পানিতে।

এক মাইল বা তার কিছু কম সাঁতরাতে হবে। একটু ধীর গতিতে এগোচ্ছে রানা, আমিনাকে পাশে পেতে চাইছে, উদ্দেশ্য পথ দেখিয়ে সৈকতে নিয়ে যাওয়া।

সাগর শান্ত সমতল। ওর প্রতিকূলে কোন স্রোতও নেই। পিছিয়ে যেতে যেতে এক সময় অন্ধকারে হারিয়ে গেল সিলিয়া। সম্ভবত দুশো গজের মত এগিয়েছে, এই সময় হঠাৎ একটা মোটর-বোট চমকে দিল ওকে। ওর সামনে দিয়ে, একদিক থেকে আরেক দিকে, দ্রুত চলে গেল। আর কিছু দেখা না গেলেও, চকচকে একটা মর্টার বা রকেট লঞ্চার পলকের জন্যে ধরা পড়ল ওর দৃষ্টিতে। একটু পর ওটার তৈরি ঢেউ ওর নাগাল পেয়ে গেল। ঢেউ-এর ওপর আবার যখন মাথা তুলল, সামনে কিছুই আর দেখতে পেল না। রয়েছে শুধু দ্বীপটা—ভ্রাকোনিসি। স্কাইলাইনে একটা খাঁজ লক্ষ্য করে বুক-সাঁতার দিচ্ছে রানা, চিহ্ন হিসেবে ওটাকে বেছে নিয়ে ডানে-বাঁয়ে কোনদিকে তাকাচ্ছে না, জোর খাটিয়ে মন থেকে সরিয়ে রাখছে সমস্ত চিন্তা, সাঁতারের গতি বাড়াবার জন্যে গায়ের সমস্ত শক্তি দিয়ে হাত আর পা চালাচ্ছে—পরাজয়ের অসুস্থকর অনুভূতি যাতে ওকে বিভ্রান্ত করতে না পারে।

বিশ মিনিট পর চাঁদের তৈরি ভ্রাকোনিসির ছায়া দেখতে পেল রানা সামনে। মনে হলো কে যেন এক পাশ থেকে সাঁতরে এসে ওই ছায়ার ভেতর হারিয়ে গেল। এদিকের পানিতে যে-ই থাকুক তাকে দেখতে পাওয়া প্রায় অসম্ভব, এমন কী কয়েক গজ দূর দিয়ে একটা মোটর-বোট চলে গেলেও। থামল রানা। পশ্চিম দিকে তাকাল। কিন্তু কিছুই দেখতে পেল না।

আবার রওনা হয়ে ছায়ার ভেতর ঢুকল রানা। সৈকতটা দৃষ্টি সীমায় চলে আসছে। ওটা একটু বাঁ দিকে, তাই কোর্স সামান্য বদলাতে হলো। আর মাত্র একশো গজ। অথচ আমিনার দেখা নেই এখনও। মেয়েটা সাঁতারে এত ভাল, অন্ধকারে নিশ্চয়ই ওকে পাশ কাটিয়েছে, তারপর নিজেই সৈকতটা খুঁজে নিয়ে বালিতে শুয়ে বিশ্রাম নিচ্ছে।

বাকি আর অগভীর কয়েক গজ। সামুদ্রিক শামুক এড়াবার জন্যে পানির একেবারে কিনারা পর্যন্ত সাঁতরে এল রানা। তারপর ক্লান্ত শরীর নিয়ে ধীরে ধীরে সিধে হলো। যাক, অবশেষে তীরে পৌঁছানো গেছে। কিন্তু আমিনাকে কোথাও দেখা যাচ্ছে না। বন করে আধপাক ঘুরল ও।

কালো পানিতে ওর চোখ জোড়া তল্লাশী চালাতে শুরু করেছে, এই সময় সার্চলাইটের চেয়েও উজ্জ্বল কিছু একটা জ্বলে উঠল ওর মগজে। অনুভব করল পড়ে যাচ্ছে ও।

সাত

'ওয়ান্ডারফুল! ওয়ান্ডারফুল! অবশেষে নিজেদের মাঝে আমরা স্বনামধন্য মাসুদ রানাকে পেলাম!'

এমন চট করে পুরোপুরি চেতনা ফিরে পেল রানা, মনে হলো যেন স্বাভাবিক একটা ঘুম থেকে জাগল। মাঝারি আকৃতির, খানিক নিচু একটা আরামদায়ক চেয়ারে আধ শোয়া অবস্থায় রয়েছে ও। কামরাটায় প্রচুর আলো। বিভিন্ন মাত্রার আগ্রহ নিয়ে বেশ কয়েকজন লোক ওর দিকে তাকিয়ে আছে।'

তাদের মধ্যে তরুণীও আছে দু'জন। দু'জনেরই চোখ-ধাঁধানো রূপ। একটা ডিভানে পাশাপাশি বসে আছে তারা। এদেরকে রানা চেনে না, আগে কখনও দেখেনি।

পুরুষরা সব মিলিয়ে পাঁচজন। এদের সবাইকে রানা আগে দেখেছে। একটা টেরেস বলে মনে হচ্ছে, সেটার দিকে পিছন ফিরে দাঁড়ানো লোকটার মাথায় সোনালি চুল–এই গানম্যানকে কোয়ার্টারডেকে দেখেছে ও। আর রয়েছে সেই বয়স্ক ডাক্তার, এই মুহূর্তে হাইপডারমিক সিরিঞ্জ ভরে রাখছে কালো লেদার কেসে। দরজার পাশে চাকরবাকর টাইপের রুশ লোকটাকে কাল রাতে দেখেছে রানা। বাঁ হাতে ব্যান্ডেজ বাঁধা, কর্কশ চেহারার লোকটাকে সঙ্গে সঙ্গে চিনতে পারল ও। দীর্ঘদেহী মার্কিন লোকটা ওর দিকে ঝুঁকে রয়েছে, চোখে-মুখে এমন সব আশ্চর্য ভাবের আনাগোনা লক্ষ করা যাচ্ছে যে বিস্মিত না হয়ে পারা যায় না। লোকটার হাবভাবে সহৃদয়তার কোন অভাব নেই। তার উৎকণ্ঠা যেন ব্যাকুলতার সমস্ত সীমা ছাড়িয়ে যেতে চাইছে। চোখে মাঝে মাঝেই ফুটে উঠছে আন্তরিক কৃতজ্ঞতা, আবার কখনও চোখের তারায় ঝিক করে উঠছে কী এক উল্লাস।

রানা এ-সব গ্রাহ্য না করে তীক্ষ্ণ সুরে জিজ্ঞেস করল, 'আমার সঙ্গে যে মেয়েটা ছিল সে কোথায়?'

'খুব স্বাভাবিক প্রশ্ন।' আমেরিকান লোকটার হাসিতে প্রশংসা। 'তবে তাকে নিয়ে তোমাকে দুশ্চিন্তা করতে হবে না। তার কোন ক্ষতি করা হয়নি, আপাতত করা হবেও না।

'এবার আমাদের সবার সঙ্গে পরিচয় করিয়ে দিই। মিস হেলেন আর মিস কার্লা, আমার দু'জন প্রমীলা সাহায্যকারিণী। আমার ধারণা ম্যাকার্থিকে তুমি চেনো, একই ঘটনা থেকে ডাক্তার লেম্যানকেও। মিস্টার চেরিউসকেও তুমি দেখেছ, তবে দূর থেকে–তোমার অন্য এক সাগর অভিযানে। আমার কাছে তোমার খবর পৌঁছে দেয়ার জন্যে অমানুষিক খেটেছে বেচারা। আর এ হলো আমার পরিচারক গেরো–,' আদব-কায়দায় দুরস্ত একজন বাটলারের মত মাথা নিচু করে রানাকে সম্মান জানাল রাশিয়ান লোকটা। '–সবশেষে আমি, নামটা

ময়নিহান। সিআইএ। কর্নেল।'

রানা শুধু শুনছে। সিকান্দারের কপালে কী ঘটেছে জানবার জন্যে ছটফট করছে মনটা, কিন্তু জানে কিছু জিজ্ঞেস করাটা হবে চরম বোকামি। সিকান্দারের অনুপস্থিতি ঘনঘোর অন্ধকারে একমাত্র আশার আলো–যদি না সে এরইমধ্যে গুলি খায় বা ডুবে মরে।

এক মুহূর্তের জন্যে থেমে গদি মোড়া একটা টুলে বসল কর্নেল ময়নিহান, রানার কাছ থেকে মাত্র কয়েক ফুট দূরে। তার হাসি বদলে সহানুভূতিসূচক হয়ে উঠল। 'গোটা ব্যাপারটার মধ্যে সবার জন্যেই অশুভগ্রহের একটা প্রভাব বা ভূমিকা আছে,' আবার শুরু করল সে। 'আজ রাতে শত্রু শনি কড়ায়-গণ্ডায় তার পাওনা তোমার কাছ থেকে পুরোটাই আদায় করে নিয়েছে, রানা। এ তোমার পক্ষেও ভবিষ্যদ্বাণী করা সম্ভব ছিল না যে আমাদের উভয়ের বন্ধু ভারতীয়রা তোমার আগমন এরকম ঢাক-ঢোল বাজিয়ে আর আতসবাজি পুড়িয়ে ঘোষণা করবে।' অল্প একটু শব্দ করে হাসল কর্নেল। 'তারপর কী ঘটল? হায়, শনির দশা তখনও তোমার কাটেনি যে! তুমি বাধ্য হলে সাঁতরে তীরের দিকে আসতে। এতে তোমার সময় লাগল। আর আমার বৃহস্পতি আজ যেহেতু তুঙ্গে, সম্ভাব্য একমাত্র ল্যান্ডিং পয়েন্টে বোটভর্তি লোক পাঠাতে আমার কোন সমস্যাই হলো না। কী আর করা, বলো! এরই নাম জীবন–যার যেমন ভাগ্য।

'সে যাই হোক, আমাদের সবার তরফ থেকে আন্তরিকতাময় সাদর অভ্যর্থনা জানাচ্ছি তোমাকে। বিশ্বাস করো, তুমি আসায় আমার সহকারীরা পরম স্বস্তি বোধ করছে। জিজ্ঞেস করে দেখতে পারো, তারা তোমার প্রতি ভীষণ কৃতজ্ঞ। আসলে ওদের মনে সংশয় ছিল, এই ঘটনা আদৌ ঘটবে কি না। কিন্তু না, আমার মনে কোন সন্দেহ ছিল না। আমার ছিল বিশ্বাস। সেই বিশ্বাসের জোরেই সবাই হতাশায় মুষড়ে পড়লেও আমি টলিনি। মিস্টার ম্যাকার্থির কথাই ধরা যাক–তাঁর বক্তব্য ছিল, তোমার সার্ভিস পাবার জন্যে যথেষ্ট পজিটিভ অ্যাকশন নেয়া হচ্ছে না, আরও লোকবল চাওয়া হচ্ছে না, তুরস্কের জলসীমায় মহড়ারত মার্কিন নৌ-কমান্ডারদের সাহায্য চাওয়া উচিত ইত্যাদি। অথচ আমার ভয় ছিল উল্টোটা–অতি উৎসাহী কেউ না তোমাকে সময়ের আগে মেরে ফেলে।

'আমি প্রথম থেকেই জানতাম যে বেঁচে থাকলে তুমি নিজে থেকেই এখানে চলে আসবে। এ-ও জানতাম যে আমি যেমন একমাত্র সুপারপাওয়ারের প্রতিনিধি হওয়া সত্ত্বেও জানাজানি হয়ে যাবার ভয়ে অল্প ক'জন লোক নিয়ে বড় একটা কাজ করতে চাইছি, তেমনি বিসিআই আর রানা এজেন্সির অবিশ্বাস্য লোকবল, বিশ্বব্যাপী নেটওঅর্ক আর সহযোগী থাকা সত্ত্বেও বসকে অতিরিক্ত কোন ঝুঁকির মধ্যে ফেলতে না চাওয়ায় তুমিও একরকম একাই তাকে উদ্ধার করতে আসবে। এটা আমার কাছে মনে হয়েছে অনিবার্য। আশা করি তুমিও ব্যাপারটা এখন উপলব্ধি করছ–এটা নিয়তিরই সিদ্ধান্ত যে তুমি আর আমি মিলিত হব।'

কর্নেল ময়নিহান আরেকবার থামল। শাণিত দৃষ্টিতে চকচকে একটা ভাব

ফুটে আছে, সেজন্যেই সকৃতজ্ঞ হাসিটাকে কৃত্রিম বলে চিনতে কোন অসুবিধে হচ্ছে না রানার।

'তবে ক্ষমা করো আমাকে,' আবার বলল সে। 'এটা আমার গাফিলতি আর অভব্যতার পরিচয়–জিজ্ঞেস না করাটা। কেমন আছে তোমার মাথা? এতক্ষণে তো ব্যথাটা প্রায় না থাকারই কথা।'

'মারব শালা এক লাথ্!'

'এটা আবার তোমার অভব্যতা হয়ে গেল,' নরম সুরে অভিযোগ করল কর্নেল, মুখে আড়ষ্ট হাসি। 'জানি, মাতৃভাষা নিয়ে খুব জোরালো একটা আবেগ কাজ করে তোমাদের ভেতর, কিন্তু তোমাদের ভাষা এখানে আমরা কেউ বুঝি না।'

'মাথাটা দপ্‌দপ্ করছে, তেমন কিছু না।' রানা জোর করে শান্ত ও স্বাভাবিক থাকবার চেষ্টা করছে। এরকম একটা পরিস্থিতিতে হতাশা বা রাগ প্রকাশে ক্ষতি ছাড়া লাভ নেই।

'ওয়ান্ডারফুল! তার মানে ডাক্তার লেম্যানের লোকাল অ্যানেসথেটিকে কাজ হয়েছে। তবে এ-কথা মানতেই হবে যে মুগুর হাতে গেরো একজন শিল্পী। ভাল কথা, আশাকরি তুমি বুঝতে পারছ যে অজ্ঞান অবস্থায় তোমাকে বিবস্ত্র করা হয়েছিল কাপড়গুলো ধুয়ে শুকাবার জন্যে। আবার পরাবার আগে ইস্ত্রিও করা হয়েছে। মেহমান বলে কথা, রে, ভাই! ও, হ্যাঁ, ছুরিটা তোমার বগলের পাশ থেকে স্ট্র্যাপমুক্ত করা হয়েছে।'

'আমিও অভিযোগ করবার মত কিছু পাচ্ছি না,' শান্ত, অমায়িক হাসিটা হুবহু ফিরিয়ে দিয়ে বলল রানা। 'ও, থাকলে সামান্য একটু হুইস্কি চাই আমি।'

'অবশ্যই, মাই ডিয়ার ফেলো, আ প্লেজার। বিশেষভাবে শুধু এই অনুষ্ঠানের জন্যে আমি এক বোতল শিভাস রিগ্যাল আলাদা করে রেখেছি। সঙ্গে বরফ আর পানি দিতে বলি?'

'নির্জলা, প্লিজ।'

গেরোর দিকে ফিরে মাথা ঝাঁকাল কর্নেল, এই প্রথম রানার ওপর থেকে এক মুহূর্তের জন্যে চোখ সরাল। 'তাহলে সামান্য অস্বস্তি আর ক্লান্তি ছাড়া তোমার শারীরিক অবস্থা বেশ ভালই বলতে হবে।'

'আমার কোন সমস্যা নেই।' ভিজে বিড়াল সাজা লোকটার একঘেয়ে কথাবার্তা রাগিয়ে দিচ্ছে রানাকে, তবে ওকে দেখে সেটা বোঝা যাচ্ছে না।

'পরম স্বস্তিবোধ করছি। তোমার অসাধারণ শারীরিক সামর্থ্যের তুলনায় ক্লান্তিটুকু কিছুই নয়। এরচেয়ে স্বস্তিকর কিছু হতে পারে না।'

হুইস্কি পৌঁছাল, লম্বা একটা গ্লাসে প্রায় ভর্তি হয়ে। মধু রঙা তরল আগুনে দীর্ঘ একটা চুমুক দিল রানা। এই মুহূর্তে জিনিসটার প্রয়োজন একা শুধু ও-ই বুঝবে। দীর্ঘ সাঁতারজনিত অবসাদ, মাথায় মুগুরের বাড়ি খেয়ে জ্ঞান হারানোর ধকল, তারপর লোকাল অ্যানেসথেটিকের প্রভাব ওর শারীরিক ও মানসিক অবস্থাকে বিপর্যস্ত করে তুলেছে–মুখে যতই অস্বীকার করুক। কোন সন্দেহ নেই, এরপর যেটা ঘটবে তার তুলনায় এগুলো কিছু নয়, একটু পরেই শুরু হবে

ইন্টারোগেশন-এর নামে অমানুষিক টরচার। কাজেই বৈরী পরিবেশে যতটা পারা যায় নিজেকে প্রস্তুত করতে হচ্ছে রানাকে। ছোট্ট করে আরও দু'বার চুমুক দিল গ্লাসটায়। কর্নেল তাকিয়ে আছে, দৃষ্টিতে মনোযোগ। এরপর যখন কথা বলল, কণ্ঠস্বর একটু তীক্ষ্ণ শোনাল।

'এটা আমার একটা অ্যাসাইনমেন্ট, তুমি জানো। স্বভাবতই আমার একটা লক্ষ্য আছে। সেই লক্ষ্য পূরণ করতে হলে তোমার পরিপূর্ণ সহযোগিতা না পেলে আমার চলবে না। তোমার এই সহযোগিতা আমাকে পেতে হবে, এই ধরো–,' হাতঘড়ির ওপর চোখ বুলাল ময়নিহান, '–কমবেশি পাঁচ ঘণ্টার মধ্যে। এই সময়সীমার পর সহযোগিতা করবার ক্ষমতা তোমার থাকবে না।'

'আমি তোমাকে কথা দিচ্ছি,' বলল রানা। 'তোমার লক্ষ্য যাই হোক, আমার কোন সহযোগিতা তুমি পাবে না। জবরদস্তি করলে যতক্ষণ পারা যায় বাধা দেব আমি।'

'স্বীকার করছি, কথাটা সাহসের সঙ্গে বলা। তবে–এ-ও স্বাভাবিক–তুমি আমার বক্তব্য বুঝতে ভুল করেছ। তোমার দেয়া বাধাটাই তো আসলে সহযোগিতা। সেজন্যেই তো তোমার প্রতিরোধ-শক্তি অটুট রাখবার জন্যে এতটা ব্যাকুল হয়ে আছি আমি। যাই হোক, এ-প্রসঙ্গে পরে বিস্তারিত ব্যাখ্যা দেয়া যাবে। এখন আমি আমার লক্ষ্যগুলোর কথা বলি,' টান টান নিঃশব্দ হাসি ফুটেই নিভে গেল, 'সম্ভাব্য সহজবোধ্য ভাষায়। তোমার জন্যে জানা খুবই প্রয়োজন, ঠিক কী আছে তোমার কপালে।

'কিছুক্ষণের মধ্যে তোমাকে সেলারে নিয়ে যাওয়া হবে। সেটা এই বাড়ির কিচেনের নিচে। ওখানে আমার নিজের তৈরি কিছু ইকুইপমেন্ট আছে, ইন্টারোগেশনের সময় কাজে লাগে। এর মধ্যে লুকোছাপা কিছু নেই, আমি বরং গোপন করে রাখাটাকেই ঘৃণা করি–তোমাকে টরচার করা হবে যতক্ষণ না মৃত্যু হয়। তবে এটা তোমাকে বুঝতে হবে, রানা, সাধারণত ইন্টারোগেশন বলতে যা বোঝায় এটা সেরকম কিছু নয়। যেমন, ধরো–তোমাকে কোন প্রশ্ন বা জেরা করা হবে না। স্বেচ্ছায় তুমি যত তথ্যই ফাঁস করো, যত প্রতিশ্রুতিই দাও, ও-সবে চলমান ইন্টারোগেশন প্রক্রিয়া থামবে না। পরিষ্কার হয়েছে, রানা?'

'পুরোপুরি।'

'ভেরি গুড। সবার উপস্থিতিতে স্বীকার করতে আমার বাধছে না যে অন্তত এই ব্যাপারটায় আমাকে যে নির্দেশনা দেয়া হয়েছে তা থেকে আমি সামান্য একটু সরে আসছি। কিংবা–সত্যি কথাটা স্বীকার করতে অসুবিধে কী? আসলে, ধরতে গেলে হেডকোয়ার্টার ল্যাংলির নির্দেশ আমি অমান্যই করছি।

'আমাকে শুধু বলা হয়েছে, খুন করবার আগে স্বাভাবিক পন্থায় যতটা পারা যায় তোমার কাছ থেকে বিসিআই-এর গোপন তথ্য সংগ্রহ করতে হবে। হোয়াট আ সারপ্রাইজ! স্বাভাবিক পন্থায়? এই শব্দ দুটো কেন ব্যবহার করা হলো?' কর্নেল ময়নিহানের হাসি কুৎসিত, নির্দয় আর অশ্লীল হয়ে উঠল; এই মুহূর্তে লোকটাকে ছদ্মবেশী একজন জল্লাদ মনে হচ্ছে রানার। 'শব্দদুটো ব্যবহার করা হয়েছে এই

জন্যে যে ল্যাঙলির সবাই জানে ইন্টারোগেশনে কখনোই আমি স্বাভাবিক পন্থা ব্যবহার করি না। অর্থাৎ আমাকে সাবধান করে দেয়া হয়েছে, এবার যেন নিজের পন্থা ব্যবহার না করি। কিন্তু তোমার জন্যে এটা একটা দুঃসংবাদ, নিজের পদ্ধতিই ব্যবহার করব আমি। কেন? কারণ আমি একজন দেশপ্রেমিক আমেরিকান। আমার সন্দেহ, একমাত্র সুপারপাওয়ারের বিরুদ্ধে বিসিআই-এর অনেক গোপন প্ল্যান আছে, আর সেগুলো অবশ্যই আমাকে জানতে হবে।'

বন্দির অসহায় অবস্থার সুযোগ নিয়ে ভয় দেখিয়ে মজা পাচ্ছে কর্নেল ময়নিহান, ব্যাপারটা সেরকম নয়। সে তার বিকৃত রুচি, মানসিক অসুস্থতার কথা অকপটে স্বীকার করছে; এবং মুখে যা বলছে কাজেও তা করে দেখাবে।

রানা বাকি সবার ওপর পালা করে একবার চোখ বুলাল। নৃশংস নির্যাতনের বিরুদ্ধে কারও কোন অনুভূতি নেই? কিংবা ওর সম্ভাব্য বীভৎস পরিণতি সম্পর্কে সামান্য একটু সহানুভূতি?

চোরাচোখে এরপর মেয়ে দুটোর দিকে তাকাল রানা। তামাটে ত্বক নিয়ে একহারা গড়নের মেয়েটা অন্যদিকে তাকিয়ে আছে, কারণটা সম্ভবত নির্লিপ্ততা, যতটা না বিরূপ মনোভাব। ভারী বুক নিয়ে তার সঙ্গিনী মেয়েটা ওর দিকে তাকিয়ে আছে গাঢ় বাদামী চোখ মেলে; বিছানায় খুব ছটফটে, আন্দাজ করল ও, তবে ওটার বাইরে একটা গাইগোরুর মতই কুঁড়ে। গ্রিক লোকটা একঘেয়েমির শিকার, রাশিয়ানটা পুরোপুরি উদাসীন। টেরেসের দিকে পিছন ফিরে দাঁড়ানো লোকটা, যার নাম ম্যাকার্থি, কর্নেলের দিকে তাকিয়ে নিঃশব্দে হাসছে–হাসিতে তিরস্কার, এবং প্রশংসা দুটোই আছে, তবে ভালভাবে প্রকাশ পাচ্ছে শুধু প্রশংসাটুকু। ব্যতিক্রম মনে হলো ডাক্তারকে। লোকটা ঘামছে আর দাঁত দিয়ে ঠোঁট কামড়াচ্ছে। এ-সবই তার মানসিক অস্থিরতার লক্ষণ। এর সমর্থন যদি পাওয়াও যায়, কোন কাজে আসবে বলে মনে হয় না।

'তো যা বলছিলাম,' হাত নেড়ে নিজের অবাধ্যতা হালকা করতে চাইল কর্নেল ময়নিহান। 'আমার কাজ হলো, সবচেয়ে বেশি কষ্ট দেয় এমন ব্যথার সঙ্গে তোমার পরিচয় করিয়ে দেয়া–তবে ভোর পর্যন্ত বাঁচিয়ে রেখে। খুবই সূক্ষ্ম একটা কাজ, আমার দক্ষতার প্রতি রীতিমত একটা কঠিন চ্যালেঞ্জ। তোমার সহিষ্ণুতার প্রতিও একটা কঠিন চ্যালেঞ্জ, রানা। শুনেছি তুমি নাকি একজন বীর। বিশেষভাবে অনুরোধ করছি, সেটা যেন আবার মিথ্যে প্রমাণ কোরো না। কষ্ট দিয়ে আমাকে মজা পেতে দিয়ো। তুমি যদি নেতিয়ে পড়ো, প্রতিহত না করো–এত আয়োজন সব বিফলে যাবে।

'সবশেষে কী ঘটবে? একটা নির্দিষ্ট সময়ে তোমার মৃত্যুর কারণ সৃষ্টি করব আমি। সেটা এমন এক পদ্ধতি, আমার জানামতে এর আগে কেউ ব্যবহার করেনি। এই পদ্ধতিটা একটু ব্যাখ্যা করা দরকার। প্রথম কাজ হবে তোমার হাত ও পায়ের বারোটা প্রধান হাড়ই ভেঙে ফেলা। দ্বিতীয় কাজ এমন একটা ইঞ্জেকশন দেয়া, তোমার শরীরে প্রবল খিঁচুনি উঠে যাবে।

'তোমাকে একটু আভাস দিলে কল্পনা করতে সুবিধে হবে ঠিক কী ধরনের

নরকযন্ত্রণা ভোগ করতে যাচ্ছ। পেশীগুলোর ওপর কোন নিয়ন্ত্রণ থাকবে না। ভেঙে চুরমার হওয়া হাত আর পা মোচড় খাবে, ফুলে উঠবে, দিক্‌বিদিক্‌ ছুটবে জ্যান্ত প্রাণীর মত। এর কয়েক মিনিট পর শক-এ মারা যাবে তুমি। এই পর্যায় থেকে তুমি আর সরাসরি আমার কোন উদ্বেগ হিসেবে গণ্য হবে না। আমার এক কলিগের তত্ত্বাবধানে তোমার ডেডবডি, তোমার বসের ডেডবডির সঙ্গে, চমকপ্রদ একটা রাজনৈতিক পরিকল্পনার অতীব গুরুত্বপূর্ণ হাতিয়ারে পরিণত হবে।

'একটা জোট তৈরি হতে যাচ্ছে, সেটা আমরা ভেঙে দেব। ইউরোপিয়ান ইউনিয়নের মত এশিয়ান ইউনিয়ন তৈরি হলে এলাকার প্রাকৃতিক সম্পদ এলাকাতেই থেকে যাবে, এটা বিশ্বায়ন নীতিমালা আর মার্কিন স্বার্থের বিরুদ্ধে চলে যায়। তারপর দেখা যাবে ছোট্ট চারা গাছটি একদিন মহীরুহ হয়ে উঠেছে, চ্যালেঞ্জ করছে একমাত্র সুপারপাওয়ারকে। সিআইএ এই ঝুঁকি নিতে পারে না, তাই শুরুতেই শিকড় কাটতে এসেছি আমরা। বিসিআই তথা বাংলাদেশকে বলির পাঁঠা বানাতে হচ্ছে, সেজন্যে ব্যক্তিগতভাবে আমি দুঃখিত। পরিকল্পনাটা আমার নয়। এটা বেরিয়েছে তিনটে মাথা থেকে, সেগুলোর একটা থাকে হোয়াইট হাউসে, একটা ল্যাংলিতে আর একটা পেন্টাগনে। এবার, প্লিজ, আমার সঙ্গে এসো। নাকি কোন প্রশ্ন আছে?'

গ্লাসে শেষ চুমুক দিয়ে রানা ভান করল চিন্তা করছে। 'না, কোন প্রশ্ন নেই,' সহজ সুরে বলল ও। 'সবই তো পরিষ্কার।'

'ওয়ান্ডারফুল। তাহলে চলো যাই। আমি পথ দেখাচ্ছি।'

চেয়ার ছেড়ে সিধে হতে যাচ্ছে রানা, মরিয়া হয়ে ভাবল আসুরিক একটা প্রলয়কাণ্ড বাধিয়ে দেবে কি না; যদিও তাতে শুধু ইচ্ছেশক্তি অটুট থাকবার প্রমাণ মিলবে, প্রতিরোধ সফল হবার কোন সম্ভাবনা নেই। লাল গলার দূরত্ব তখনও মাপা শেষ করেনি, এই সময় পিছন থেকে ওর ডান হাত চেপে ধরল ম্যাকার্থি, হ্যাঁচকা টান দিয়ে বাঁকা করে তুলে ফেলল শোল্ডার-ব্লেডের কাছে। অসহ্য ব্যথায় চোখের সামনে অন্ধকার দেখল রানা। এই সুযোগে গেরো চেপে ধরল ওর বাম হাতটা।

'আমরা ধীরে-সুস্থে যাব, রানা,' উৎফুল্ল দেখাচ্ছে ম্যাকার্থিকে, সোনালি চুল ঝাঁকিয়ে সহাস্যে কথা বলছে। 'কিন্তু তুমি যদি কিছু করতে যাও, এখনি তোমার হাত ভেঙে ফেলব আমি। কোয়ার্টারডেকে এ-ধরনের পদ্ধতি ব্যবহার করবার অনুমতি ছিল না। এখনকার পরিস্থিতি আলাদা। ওই হাতটা ঘণ্টা কয়েকের মধ্যে এমনিতেই ভাঙা হবে। এবার,' হাতটার ওপর চাপ একটু কমল, 'হাঁটো। যেমন বলেছি, আমরা ধীরে-সুস্থে এগোব।'

কামরা থেকে হল-এ বেরিয়ে এল ওরা। হলের সিলিং বেশ নিচু, দেয়াল বেয়ে লতানো গাছের বহুরঙা ডাল ওপর দিকে উঠে গেছে। রানার মনের সবগুলো জানালা যেন এই মুহূর্তে বন্ধ, সিঁড়ির ধাপ বেয়ে উঠবার সময় শুধু নিজের শারীরিক নড়াচড়া সম্পর্কে পূর্ণ সচেতন। সিঁড়ির মাথায় পৌঁছে ডান দিকে এগোল ওরা। ছোট একটা প্যাসেজ, মেঝেতে কার্পেট নেই। ওর বুকের ভেতরটা ধুক ধুক

করছে। শব্দটা ছোট্ট একটা পাখির ডানা ঝাপটানোর মত। কোথায় নিয়ে যাওয়া হচ্ছে ওকে? সেখানে পৌঁছে কিছু কি দেখতে পাবে ও? আশা আর নিরাশার দোলায় দুলছে ওর মন।

ওপর আর নিচের দুটো ভারী বোল্ট সরাল কর্নেল ময়নিহান। দেখলেই বোঝা যায় নতুন, সম্প্রতি ফিট করা হয়েছে। প্যাসেজের এটা শেষ মাথা। এদিকে এই একটাই দরজা।

কর্নেল ময়নিহানই প্রথমে ভেতরে ঢুকল। তারপর পিঠে দু'হাতের ধাক্কা খেয়ে চৌকাঠে পৌঁছাল রানা।

হাত দুটো পিছনে বেঁধে আড়ষ্ট হয়ে দাঁড়িয়ে আছেন তিনি। ম্লান দেখাচ্ছে, চোখ দুটো গর্তে ঢোকা–শত্রুর হাতে ধরা পড়বার পর থেকে গত চারদিন কিছুই যেন খাননি বা একরাতও বোধহয় ঘুমাননি। কিন্তু দাঁড়িয়ে আছেন যেন প্রকাণ্ড এক মহীরুহ, ভঙ্গিটা যেমন ঋজু তেমনি অটল, মনে দুর্বলতার লেশমাত্র নেই।

'গুড ইভনিং, মাই বয়,' শান্ত, ভারী কণ্ঠস্বর; ইংরেজিতেই বললেন।

'ইভনিং, সার।' রানাকে আড়ষ্ট দেখাল, প্রথমে আবেগ আর তারপরই প্রচণ্ড রাগ ওকে অস্থির করে তুলছে।

আহ্লাদে প্রায় আটখানা হলো ময়নিহানের অবয়ব। 'গুরু-শিষ্য দু'জনের পেটেই অনেক কথা জমেছে। আমাদের উপস্থিতি তোমাদেরকে বিব্রত করুক তা আমরা চাই না, কাজেই চলে যাচ্ছি। না, আড়িপাতার কোন যন্ত্র এই কামরায় রাখা হয়নি। ভাল কথা–জানালা নিয়ে অযথা সময় নষ্ট কোরো না, ওটা ভাঙতে পারবে না। তোমাদের কিছু লাগবে?'

'যেতে চাইলে বেরোও,' রাহাত খানের কণ্ঠস্বর কর্কশ।

'অবশ্যই, জেনারেল,' কৃত্রিম বিনয় দেখিয়ে বলল কর্নেল।

সেই মুহূর্তে আন্দাজে ম্যাকার্থির হাঁটুর নিচে লক্ষ্যস্থির করল রানা, লম্বা হাড়ে জুতোর গোড়ালি দিয়ে বাড়ি মারল। কিন্তু রোপ সোল আর ক্যানভাস দিয়ে তৈরি জুতোর পিছনটা কোন অস্ত্র নয়। লাভ তো কিছু হলোই না, ভাঁজ খেয়ে পিঠের ওপরদিকে উঠে যাওয়া ডান হাতে একটু চাপ পড়ায় প্রচণ্ড ব্যথায় জানটা যেন বেরিয়ে যাবার উপক্রম করল। দু'জন লোক আরও শক্ত করে ধরল ওকে। রাহাত খানের দিকে পিছন ফিরে কর্নেল ময়নিহান ওর দিকে এগিয়ে এল। ওকে পাশ কাটিয়ে কামরা থেকে বেরিয়ে যাবে, এই সময় হাতঘড়ি তুলে সময় দেখল–ক্ষীণ একটু কুঁচকে উঠল ভুরু জোড়া। যত সামান্যই হোক, যেভাবেই হোক, সময়-সূচিতে কিছুটা হেরফের দেখা দিয়েছে।

পিঠে আরেকটা ধাক্কা খেয়ে কামরার ভেতর ঢুকল রানা। সঙ্গে সঙ্গে বন্ধ হয়ে গেল দরজা, ঘটাং-ঘটাং ধাতব শব্দ তুলে বোল্ট দুটো জায়গামত লেগে গেল।

'দুঃখিত, সার। আমি আপনার কোন কাজে এলাম না।'

চরম ক্লান্তি উপেক্ষা করে মাথা নাড়লেন রাহাত খান। 'আমি জানি, এর বেশি কেউ কিছু করতে পারত না। খুঁটিনাটি সব বলবার দরকার নেই, তুমি শুধু আমাকে জানাও, এখান থেকে পালাবার কোন উপায় কি আছে আমাদের?'

'এই মুহূর্তে না থাকারই মত। আমি পাঁচজন সুস্থ লোককে দেখেছি, বাকি একজন আহত হলেও অস্ত্র চালাতে পারবে। এরা ছাড়া আর কেউ আছে কি না আপনি বলতে পারবেন, সার?' দু'জনেই প্রফেশন্যাল, সময় নষ্ট না করে কাজের কথা শুরু করে দিয়েছে।

'না, আমার জানা নেই। ওরা সারাক্ষণ এই জায়গায় আমাকে আটকে রেখেছে। ওই সিআইএ-র স্যাডিস্ট কর্নেলকে দেখেছি, আর দেখেছি এক চাকরকে–আমাকে খাবার দিয়ে যায়, বাথরুমে পৌঁছে দেয়।' মাথা নাড়লেন আবার। 'আমি কোন উপকারে আসব না।'

বসের শেষ কথাটায় এমন এক হতাশার সুর শুনতে পেল রানা, জীবনে কখনও এরকম শুনতে হবে বলে ভাবেনি ও। ইতোমধ্যে আগোছাল বিছানার কিনারায় সাবধানে বসেছেন তিনি। হঠাৎ তাঁর গলা থেকে দম আটকানোর মত একটা শব্দ বেরিয়ে এল। 'লোকটা কি আপনাকে টরচার করেছে, সার?'

'একটু, রানা। বেশিরভাগই গরম ছ্যাঁকা। কিছু ফোস্কা পড়েছিল পিঠে আর বুকে। ওগুলো ড্রেস করার জন্যে এক ডাক্তারকে একবার নিয়ে আসে। একটু আগে ভুল করেছি–সব মিলিয়ে তাহলে তিনজন লোককে দেখেছি আমি।'

'কিন্তু টরচার করল কেন? আপনার কাছ থেকে কোন তথ্য...'

জোর করে একটু হাসলেন বিসিআই চীফ। 'কত কথাই তো জানতে চাইছে, আমি কী বলি! তবে এই টরচারের ব্যাপারটা একটু অদ্ভুতই বলতে হবে। কর্নেল খুব ভাল করে জানে এভাবে টরচার করে কোন তথ্য আদায় করতে পারবে না, তারপরও চালিয়ে গেছে সে–যেন প্রয়োজনীয় একটা কাজ এটা। প্রথম দিকে টরচারের সঙ্গে সম্ভাব্য সব রকম হুমকি দিচ্ছিল। সে আমাকে মৃত্যু চেয়ে প্রার্থনা করতে বাধ্য করবে, আরও কত কী। কিন্তু সে-সব কিছুই ঘটল না। আমার ধারণা হয়েছে, ওদের আসল টার্গেট তুমি।'

'আমারও তাই মনে হয়েছে।'

'গোটা ব্যাপারটা কি নিয়ে তুমি জানতে পেরেছ?' কয়েক সেকেন্ড চুপ করে থাকবার পর মুখ তুলে জিজ্ঞেস করলেন রাহাত খান। 'ওরা আমাকে কিছুই বলেনি।'

'ওরা না বললেও, একটা সূত্র দিলেই ব্যাপারটা কী নিয়ে তা আপনি পরিষ্কার বুঝতে পারবেন,' বলল রানা। 'পাহাড়ের উল্টোদিকে চীন, ভারত, বাংলাদেশসহ এশিয়ার কয়েকটা রাষ্ট্র একটা গোপন মীটিঙে বসতে যাচ্ছে।'

'হোয়াট! এশিয়ান ইউনিয়নের তৃতীয় মীটিং এখানে! এই গ্রিসে? বাট হোয়াই?' সত্যি আকাশ থেকেই পড়লেন রাহাত খান। 'আর জায়গা পেল না ওরা?'

'এশিয়া হলো সবচেয়ে বড় মহাদেশ, সেখানে তো জায়গার অভাব হবার কথা নয়। কিন্তু চীন আর ভারত দুই রাষ্ট্রই দাবি করে বসল তৃতীয় মীটিঙে যেহেতু খসড়া চুক্তি অনুমোদন করা হবে, তাই সেটা বসতে হবে তাদের দেশে। কেউ যখন নিজের দাবি ছাড়তে রাজি হলো না, মাহাথির মহম্মদ তখন বাধ্য হয়ে

গ্রিসের এই ড্রাকোনিসি দ্বীপটাকে নিরাপদ মনে করে একটা আপস প্রস্তাব দিলেন—মীটিংটা এখানে হবে, সিকিউরিটির দায়িত্ব পালন করবে ভারতীয় ইন্টেলিজেন্স।'

'চীন তাতে রাজি হলো?'

'হলো এই জন্যে যে মাহাথির বললেন এশিয়ান ইউনিয়নের হেডকোয়ার্টার থাকবে সাংহাইয়ে,' বলল রানা। 'যাই হোক, মীটিংটা হবার কথা গোপনে, একদম টপ সিক্রেট—কিন্তু কীভাবে যেন সিআইএ জেনে ফেলেছে...'

'জানতেই পারে,' বললেন রাহাত খান। 'ভারতের সিকিউরিটি বা ইন্টেলিজেন্স কোন কালেই এ-প্লাস ছিল না। জেনে সিআইএ-র কী লাভ? ওরা আমাদের দু'জনকে চাইছে কেন?'

বসের দিকে তাকিয়ে আছে রানা। যেন অপেক্ষা করছে।

চার কি পাঁচ সেকেন্ডের নীরবতা ভেঙে রাহাত খান চাপা কণ্ঠে বললেন, 'নো! দ্যাটস নট পসিবল!' রানার অনড় ভাব দেখে হঠাৎ থেমে বিড়বিড় করলেন, 'ওহ্, গড! ইট'স ট্রু! কনফারেন্সটা ওরা শুধু বানচাল করতে চাইছে না! সবাইকে খুন করে দোষ চাপাবে বিসিআই-এর ঘাড়ে। তারপর? আল কায়েদার সহযোগী হিসেবে বিচার করবে আমাদের? নাকি বলবে সবাইকে খুন করে পালাতে গিয়ে গুলি খেয়ে নিজেরাও মারা গেছি?'

'কনফারেন্সটা বসবে পাহাড়ের উল্টোদিকের একটা বাড়িতে, সার,' বলল রানা। 'ওটা ওরা উড়িয়ে দেয়ার ব্যবস্থা করে রেখেছে। আমার ধারণা, এমন পদ্ধতি ব্যবহার করা হবে, দেখে যাতে মনে হয় এটা বাংলাদেশের কাজ।'

'তারমানে অ্যাটমিক কিছু বাদ। বাদ জেট প্লেন, হেলিকপ্টার গানশিপ, যুদ্ধজাহাজ বা মিসাইল।'

'জ্বী, সার। ধোঁয়া কেটে যাবার পর আপনাকে আর আমাকে ওই অস্ত্রের কাছে পড়ে থাকতে দেখা যাবে। লাশ, তবে চিনতে কোন অসুবিধে হবে না।'

রানা থামতে গভীর একটা দীর্ঘশ্বাস নিলেন রাহাত খান। 'এশিয়ান ইউনিয়নকে ভয় পাচ্ছে আমেরিকা। পাওয়ারই কথা। অত্যাচারী চিরকাল ভেতরে ভেতরে কাপুরুষ হয়, অন্য কাউকে মাথা তুলতে দেখলে ভয়ে কাণ্ডজ্ঞান হারিয়ে ফেলে। রানা?'

'সার!'

'ওদের এই নৃশংস ষড়যন্ত্র ঠেকাতে হবে,' বললেন বিসিআই চীফ। 'আর শোনো। এটা আমার নির্দেশ। পালাবার এতটুকু সুযোগ পেলেও সেটা তুমি গ্রহণ করবে। আমি তোমার সঙ্গে যাব না, গেলে পিছিয়ে দেব তোমাকে।'

'দুঃখিত, সার,' রানার তাৎক্ষণিক জবাব। 'এক্ষেত্রে আপনার আদেশ আমাকে অমান্য করতে হবে। হয় আমরা দু'জন এখান থেকে বেরুব, নয়তো কেউ বেরুব না। তাছাড়া, আরও একজনকে আমার মুক্ত করতে হবে। একটা মেয়ে।'

বিছানা থেকে গম্ভীর মুখে রানার দিকে তাকিয়ে আছেন রাহাত খান। 'কে সে?'

'গ্রিক মেয়ে, সার। আমিনা। আমরা একসঙ্গে কাজ করছিলাম; দু'জন কয়েক মিনিটের ব্যবধানে ধরা পড়ি। সবটুকু শুনলে বুঝতে পারবেন কী তার গুরুত্ব। সে...'

'ঠিক আছে, এখনই সব আমাকে শোনাতে হবে না,' বিড়বিড় করে বললেন রাহাত খান। হঠাৎ করে তাঁর মুড যেন বদলে গেছে। হাত দুটো মুঠো পাকালেন, আবার খুললেন। রানা তাঁর ঢোক গেলবার শব্দ শুনতে পেল। তারপর তিনি বললেন, 'একসময় তো জানতে হবেই। একবারও ভুলতে পারছি না। খাদেম আর শান্তা, রানা। ওরা কি...'

'মারা গেছে, সার। দু'জনেই। খুব কাছ থেকে গুলি করা হয়, দু'জনের কেউই কষ্ট পেয়ে মরেনি।'

রানার প্রথম দুটো শব্দ শুনেই রাহাত খান তাঁর একটা হাত এমন ভঙ্গিতে তুললেন, যেন কারও ঘুসি ঠেকাতে চাইছেন। আবেগ চেপে রেখে বললেন, 'ওদেরকে ঠেকাবার আরেকটা কারণ।'

আবার নীরবতা নেমে এল কামরার ভেতর। খানিক পর সিঁড়ি থেকে পায়ের আওয়াজ ভেসে এল। প্যাসেজ ধরে এগিয়ে আসছে। থামল দরজার সামনে। বোল্ট সরাবার আওয়াজ। কবাট খুলে ভেতরে ঢুকল কর্নেল ময়নিহান। কী কারণে কে জানে একটু চটপটে আর আত্মবিশ্বাসী লাগছে তাকে।

'বাধা দেয়ার জন্যে দুঃখিত। কিন্তু পরবর্তী পর্যায়ের কাজ শুরু করতে আর আমরা দেরি করতে পারি না। রানা, তোমার জন্যে একটা দুঃসংবাদ আছে।'

দুঃসংবাদটা কী রানা জানতে চাইছে না দেখে কাঁধ ঝাঁকাল ময়নিহান। তারপর আবার বলল, 'তোমার পুরুষ সঙ্গীটিকে কাবু করা যাচ্ছিল না বলে একটু দেরি হলো আর কী।'

'তার কী দশা করেছ তোমরা?' খবরটা শুনেই তলপেটের ভেতরটা মোচড় দিয়ে উঠল রানার, সেই সঙ্গে উপলব্ধি করল সিকান্দার এদের নাগালের বাইরে আছে ভেবে গোপন একটা আশা লালন করছিল ওর মন। সেই আশাটা ভেঙে চুরমার হয়ে গেল।

'লড়তে চাইলে তো খেসারত দিতেই হবে। তবে গুরুতর কিছু না। এখানেই আছে সে, ইঞ্জেকশন দিয়ে ব্যথা ভুলিয়ে দেয়া হয়েছে। দেখি কোন কাজে লাগানো যায় কি না। ভুলে যাও তার কথা। তোমরা দু'জন বেরিয়ে এসো।' সঙ্গীদের ইঙ্গিত করে ফিরে গেল সে।

সম্ভবত অবসাদের কারণেই, আজ রাতের কিছু অভিজ্ঞতাকে ঝাপসা স্বপ্ন বলে মনে হচ্ছে রানার। ম্যাকার্থি আর গেরো ওর দু'পাশে উদয় হলো; খুলি থেকে ঝরা রক্তের স্রোত বয়ে যাচ্ছে শরীরে, সিকান্দারকে ঠেলে আর একজন রাহাত খানের পাশের কামরায় ঢুকিয়ে দিল। ওরা নিচতলায় ফিরে এল আবার; মেজর আবসালাম ইয়াহুদ মিক নামে ইজরায়েলি তরুণকে সম্মান দেখানোর ভঙ্গিতে একটা ড্রিঙ্ক হস্তান্তর করছে।

মেয়েগুলো নেই। কথা বলছে কর্নেল।

'...হলো আমার লক্ষ্য। এ-সম্পর্কে তোমাকে ভাল ধারণা দিতে পারবে আমার ইজরায়েলি বন্ধু মেজর ইয়াহুদ। মেজর ইয়াহুদ, আমি আপনাকে মাত্র পাঁচ মিনিট সময় দিলাম।'

মোসাদ এজেন্ট চেয়ারে হেলান দিয়ে গভীর চিন্তায় ডুবে গেল, যেন শুরু করবার আগে গুছিয়ে নিচ্ছে নিজের বক্তব্য। কথা বলবার সময় তাড়াহুড়ো করল না, কণ্ঠস্বর আর বাচনভঙ্গিতে আগ্রহ জাগাবার মত কী যেন একটা আছে। 'আমাদের একটা টেকনিক্যাল সমস্যা ছিল। লোহার মত শক্ত পাথর দিয়ে তৈরি দালান ভেঙে গুঁড়িয়ে দিতে পারে, এমন একটা অস্ত্র চাই। অস্ত্রটাকে হতে হবে অনায়াসে পরিবহন যোগ্য, গোপন করা সহজ, এবং বাংলাদেশে পাওয়া যায়।

'আইলিটের ওই বাড়ির স্ট্রাকচার ইনভেস্টিগেট করা হলো, উত্তরও পেয়ে গেলাম সঙ্গে সঙ্গে। এই এলাকার এ-ধরনের সব বাড়ির দেয়ালই অস্বাভাবিক পুরু, এতটাই যে একটা ফিল্ড-গানও হয়তো পেনিট্রেট করতে পারবে না। তাহলে কী দরকার? দরকার মিসাইল। কিন্তু এত স্বল্পপাল্লার মিসাইল বাংলাদেশের নেই। ছোট আকৃতির গাইডেড মিসাইল? না, তাও নেই। কী কী আছে জানবার পর জ্ঞান হারাবার অবস্থা হলো আমাদের, কিন্তু সেই সঙ্গে এ-ও বুঝলাম যে ওগুলো আমাদের কোন কাজেই আসবে না—অন্যতম কারণ, ও-সব সাদামাঠা অস্ত্র সবার চোখ ফাঁকি দিয়ে বাংলাদেশ এত দূর গ্রিসে নিয়ে এসেছে বা আসতে পেরেছে, এটা কাউকে বিশ্বাস করানো যাবে না। তাহলে উপায়?

'তদন্ত করে আরও জানা গেল, দেয়াল অসম্ভব পুরু হলেও ছাদ কিন্তু তা নয়। ওটা সমতলও; ফলে ওপর থেকে নেমে আসা প্রজেক্টাইল পিছলে, হড়কে বা ড্রপ খেয়ে অন্য দিকে ছুটবে না। এসব শর্ত পূরণ করতে পারবে, আবার আকারও ঠিক আছে, এরকম অস্ত্র মাত্র একটাই পাওয়া যায়। এর আরও একটা গুণ হলো, টার্গেট এরিয়া থেকে দেখতে পাওয়া যাবে না।'

'ট্রেঞ্চ মর্টার!' নিজের অজান্তেই কথাটা রানার মুখ থেকে বেরিয়ে গেল। এই মুহূর্তে ও যেন এক ধরনের অপার্থিব বিস্ময়ে অভিভূত, যেন কোনও দুর্বোধ্য ধাঁধার সমাধান করে ফেলেছে। আপাতঃদৃষ্টিতে সম্পর্কহীন তিনটে খুদে ঘটনা অকস্মাৎ চেতনার সামনে বেরিয়ে এসে একটা সত্যের দিকে অঙ্গুলি নির্দেশ করছে: কাল সন্ধ্যায় শত্রুপক্ষের সম্ভাব্য অস্ত্র নিয়ে আমিনার ধারণা—প্রায় সত্যের কাছাকাছি পৌঁছেছিল সে; অদ্ভুতদর্শন, বেঢপ আকৃতির স্পোর্টস ব্যাগ রানা নিজে যেগুলো আসতে দেখেছে এখানে; ঘণ্টা ছয়েক আগে ওর দুঃস্বপ্ন, যাতে একটা দেয়াল কাত হয়ে ওর গায়ে পড়তে যাচ্ছিল। শেষটা আসলে কোন ক্লু নয়, তবে সমস্যার জবাব বটে, উঠে এসেছিল ওর অবচেতন মনের গহন প্রদেশ থেকে, ওই সময় তখনও ওর সচেতন মন সংগ্রাম করছিল যুক্তি, অঙ্ক আর বাস্তব সম্ভাবনা নিয়ে। ও যদি শুধু সেই দেয়ালটার সত্যিকার তাৎপর্য দেখতে পেত! তবে, না, দেখতে পেলেই বা কী হত?

'বাহ্! দশে দশ!' ময়নিহানের মত ইয়াহুদও অতিরিক্ত বিনয়ী আর অমায়িক ভাব দেখাচ্ছে, যা কিনা নার্ভাসনেসেরই অন্য রকম প্রকাশ। অভিজ্ঞতা থেকে রানা

জানে, পরিস্থিতি নিজেদের অনুকূলে ধরে নিয়ে অ্যাকশনে যাবার আগে এই ভাব দেখা যায় যোদ্ধাদের মধ্যে। 'হ্যাঁ, মিস্টার রানা। খুলে বললে, হেভী কিং স্টর্ক মর্টার, থ্রী ইঞ্চ ক্যালিবার। এটা সম্পূর্ণ নতুন একটা আবিষ্কার–বানানো সহজ, খরচ কম, অনায়াসে বহনযোগ্য, স্বল্প পাল্লার–অথচ যেমন সফিসটিকেটেড, তেমনি অব্যর্থ। এবং,' নাটকীয় ভঙ্গিতে শ্রোতাদের কয়েক সেকেন্ড অপেক্ষা করিয়ে রাখল ইয়াহুদ, 'এটা একটা বাংলাদেশী আবিষ্কার। কাজেই এ-প্রশ্ন উঠতেই পারে, যারা ইহুদি রাষ্ট্রের অস্তিত্বে বিশ্বাসী নয়, সেই বাংলাদেশীদের জিনিস মোসাদের হাতে এল কী করে?

'সেটা খুব বড় কাহিনী, আমি সংক্ষেপে সারছি। অস্ত্রটা অত্যন্ত কাজের জিনিস, ইজরায়েলের সাজ্ঘাতিক দরকার; কারণ ফিলিস্তিনিরা আমাদের খুব কাছাকাছি থাকে। তাই মোসাদকে নির্দেশ দেয়া হয়, বাংলাদেশী কিং স্টর্ক মর্টারের নকশা সংগ্রহ করো।

'বহু চেষ্টার পর কাঁড়ি কাঁড়ি টাকা খরচ করে নকশাটা আমরা সংগ্রহ করতে পারি ঠিকই, কিন্তু শুধু মর্টারের–গাইডেন্স সিস্টেমের নকশা পাওয়া যায়নি। যাই হোক, ইজরায়েলে বসে ওই মর্টার আর শেলই শুধু তাড়াহুড়ো করে তৈরি করলাম আমরা। পরীক্ষা করা হলো। সব ঠিক আছে, আবার কিছুই ঠিক নেই। মর্টারে রয়েছে বিল্ট-ইন রেঞ্জিং অ্যান্ড অ্যাকিউরেন্সি স্কেল, অর্থাৎ নির্দিষ্ট দূরত্ব সেট করে মর্টার ছুঁড়লে ঠিক জায়গা মতই পড়বে শেলগুলো–মাঝখানে যদি কোন বাধা না থাকে। কিন্তু এখানে বাধা আছে–পাহাড়। কিং স্টর্ক-এর মূল বৈশিষ্ট্য ছিল গাইডেন্স সিস্টেমটা, ওটার সাহায্যে টার্গেট দেখা না গেলেও লক্ষ্যভেদ করা কোন সমস্যা নয়। ওই সিস্টেম না থাকায় আমরা পাহাড় পার করে টার্গেটে শেল লাগাতে পারিনি।

'তবে এতে কারও উল্লসিত বা হতাশ হবার কোন কারণ নেই। গাইডেন্স সিস্টেম না পাই, আমরা মর্টারের শেলগুলোকে রিমোট কন্ট্রোলের সাহায্যে নিয়ন্ত্রণ করার উপায় বের করেছি–প্রায় ওই একই কাজ করবে। মর্টার থেকে যেভাবে একটা শেল ছোটে সেভাবেই ছুটবে। মর্টারের গায়ে লেখা আছে, ওটা বাংলাদেশে তৈরি। শেল মর্টার থেকে বেরিয়ে পাহাড়-চূড়া টপকাবে। ওখান থেকে রিমোট কন্ট্রোলের সাহায্যে শেলগুলোকে তেরছা ভাবে নয়, খাড়া ভাবে নিচে ফেলা হবে আইলিটে–পাথরের বাড়িটার ছাদে। বলাই বাহুল্য যে পাহাড় চূড়ায় থাকবে আমার সহকারী মিক।

'এই মর্টারের ফায়ারিং রেট খুব বেশি। একজন এক্সপার্ট প্রতিবার একসঙ্গে বিশটা করে শেল ছুঁড়তে পারবে। প্রতি দশ রাউন্ড-এর পর একটা করে স্মোক রাউন্ড। আক্রমণ শুরু হলে ভারতীয় ইন্টেলিজেন্স র-র সদস্য আর কনফারেন্সে আসা ডেলিগেটরা কী রকম দিশেহারা হয়ে পড়বে কল্পনা করুন। আরও কল্পনা করুন: জান-মালের কী বিপুল ক্ষতি হবে। কিছুই তো থাকবে না ওখানে। কেউ বলবে না যে এখানে কিছু ছিল। আমার ওপর কর্নেলের নির্দেশ আছে, পাথরের স্তূপগুলোকে পর্যন্ত ধুলো করে বাতাসে উড়িয়ে দিতে হবে।

'গোলাবর্ষণ অর্থাৎ কামান দাগা শুরু হবে ভোরবেলা। এই কাজটা শেষ হবার পর মঞ্চে উদয় হবেন আপনি, মিস্টার রানা, এবং আপনার বস্। ইনভেস্টিগেটররা ফায়ারিং পয়েন্টে আপনাদের লাশ–আসলে ল্যাশের অবশিষ্টাংশ–আবিষ্কার করবেন। আপনাদের দু'জনের একজন অ্যামিউনিশন নাড়াচাড়া করবার সময় যথেষ্ট সাবধানতা অবলম্বন না করায় বিস্ফোরণটা ঘটেছে বলে ধরে নেয়া হবে। এটা সহজেই বিশ্বাস করবে ইনভেস্টিগেটররা, যেহেতু বোমার পেছনে বসানো ডিটোনেশন ক্যাপ অত্যন্ত সেনসিটিভ। এরকম একটা গোলা বুক সমান উঁচু থেকে হাত ফসকে শক্ত পাথরে পড়লে তার পরিণতি বীভৎস আর রক্তাক্ত হতে বাধ্য। বলাই বাহুল্য যে আসল ঘটনা বইবে অন্য খাতে।

'পিছনের আড়াল থেকে আমি স্রেফ একটা বোমা ছুঁড়ে দেব ফায়ারিং-পয়েন্টে–ওখানে আপনি আর আপনার বস্ বাধ্য হয়ে শুয়ে থাকবেন।

'অপারেশনের এই পর্যায়টা নিয়ে আমাদেরকে রীতিমত গবেষণা চালাতে হয়েছে, মিস্টার রানা। আপনাদের শরীরে এমন কোন ক্ষত বা জখম থাকা চলবে না যা দেখে মনে হতে পারে মারা যাবার আগে আপনাদের ওপর শারীরিক নির্যাতন চালানো হয়েছে। লাশ সনাক্ত করতেও যেন কোন অসুবিধে না হয়। সেজন্যে তেল আবিবে এক্সপেরিমেন্ট করতে হয়েছে আমাকে। উপকরণ হিসেবে আমাকে ব্যবহার করতে দেয়া হয়েছে গোটা দশেক লাশ। আসলে তাজা লাশের খুব ভাল সাপ্লাই রয়েছে প্যালেস্টাইনে।' শেষ কথাটায় যেন বিষম কৌতুককর কিছু আছে, গলা ছেড়ে হেসে উঠল মেজর ইয়াহুদ; তারপরই আবার কর্মকর্তাসুলভ গাম্ভীর্য চলে এল চোখে-মুখে। 'এই অপারেশনে আমার উপস্থিতি আর সামরিক বৈশিষ্ট্যের ব্যাখ্যা এখানেই শেষ করছি।' হাতঘড়ির দিকে না তাকিয়ে আবার বলল, 'কাঁটায় কাঁটায় পাঁচ মিনিটের মধ্যে, কর্নেল ময়নিহান।'

'ধন্যবাদ, মেজর ইয়াহুদ।' এরপর কর্নেল রাহাত খান ও রানার দিকে তাকাল। 'আপনাদের আর কিছু জানার আছে?'

মুখ খুললেন বিসিআই চীফ। 'ধরে নিচ্ছি জাল ডকুমেন্টেরও ব্যবস্থা করে রেখেছ তুমি?'

'মাথা বটে! প্রতিভাই বলতে হয়! ইয়েস, মাই ডিয়ার মেজর জেনারেল। বাংলাদেশ সেনাবাহিনীর সীল-ছাপ্পড় মারা ফুল অপারেশন্যাল অর্ডার তেল আবিব থেকেই তৈরি করে এনেছি আমি। ওগুলোর অবশিষ্টাংশ আপনার লাশের পকেটে পাওয়া যাবে। আপনাদের সরকার ওগুলোকে ভুয়া, জাল ইত্যাদি বলে দাবি করবে, স্বভাবতই। কিন্তু যতভাবেই পরীক্ষা করা হোক, কেউ বলবে না ওগুলো আসল নয়–সেভাবেই তৈরি করা হয়েছে।'

রানা জানতে চাইল, 'তোমরা এই কনফারেন্স সম্পর্কে এত খুঁটিনাটি তথ্য জানলে কীভাবে?'

'র-র হেডকোয়ার্টারে বসে সতর্কতার সঙ্গে কনফারেন্সের সিকিউরিটি প্ল্যান তৈরি করছিল বিশেষজ্ঞরা। এই সময় ছোটখাট এক অফিসার ক্যান্টিনে লাঞ্চ খেতে এসে অসতর্কতার কারণে আমাদের একজন এজেন্টকে বলে ফেলে, এরপর

তার ডিউটি পড়বে গ্রিসে। ব্যস, এইটুকুই। সামান্য এই আভাস পেয়েই দিল্লিতে হাজির হই আমি। অফিসারের সঙ্গে আমার ইন্টারভিউ-এর ব্যবস্থা করা হয়। আমি তাকে সতর্কতার সঙ্গে ঝেড়ে কাশতে অনুরোধ করি–লাস ভেগাসে প্রাসাদ আর রোলস-রয়েসের বিনিময়ে। তাকে আমরা এ-ও বলি যে এ-সব সে তার বস্ বা আর কাউকে বলে দিলে আমরা তা জানতে পারব, পরিণতি হবে একমাত্র কন্যাকে চিরকালের জন্যে হারানো–স্ত্রী সহ নিজে হারিয়ে যাবার আগে। আর কোন প্রশ্ন?'

রাহাত খান কিছু বলছেন না, কারণ কিছু জেনেও এখন আর কোন লাভ নেই। রানা চুপ করে আছে নিজের আর নিয়তির ওপর রাগে–অ্যাকশন শুরু করবার কোন সুয়োগ নেই বলে।

'আমি বলি কী, তোমার বসের কাছ থেকে এখনি বিদায় নিয়ে নাও, রানা,' বলল কর্নেল। 'কারণ আবার যখন তাকে দেখবে, বিদায় নিতে পারবে বলে মনে হয় না।'

আট

সেলারটা ছোট–বারো ফুট লম্বা, দশ ফুট চওড়া, সাড়ে ছ'ফুট উঁচু। মেঝে কোথাও ফোলা, কোথাও ঢালু, এক কোণে এবড়োখেবড়ো অমসৃণ নগ্ন পাথরের একটা স্তম্ভ কাত হয়ে আছে। সম্পূর্ণ খালি একটা কামরা, ঝাড়ু দিয়ে আর মুছে মেঝেটা পরিষ্কার করা। সিলিঙে একটা ট্র্যাপ-ডোর আছে, কাঠের মই বেয়ে ওঠা যায়। একদিকের দেয়াল ঘেঁষে ফেলা হয়েছে লম্বা বেঞ্চ, যেমনটা সাধারণত স্কুলরুমে দেখা যায়। কলাপসিবল্ টেবিলটা আরেক দেয়ালের কাছাকাছি; সঙ্গে একটা কিচেন টেবিল। শেড নেই, তবে বালবটা ঘোলাটে, বসানো হয়েছে একটা ব্র্যাকেটের ভেতর তৃতীয় দেয়ালে।

ধস্তাধস্তি করে কোন লাভ হয়নি, বেরিয়ে থাকা পাথুরে জিভের উল্টোদিকের কোণে ফেলা মান্ধাতা আমলের ভারী একটা ডাইনিং চেয়ারের সঙ্গে শক্ত করে বাঁধা হয়েছে রানাকে। বাঁধার কাজে ব্যবহার করা হয়েছে ফালি করা তোয়ালে। ম্যাকার্থি, গেরো আর মিকের সঙ্গে বৃথা মারপিট করার সময় কর্নেল ময়নিহানের কয়েকটা কথা ওর কানে এসেছে–পাটের রশি বা নাইলন কর্ড কব্জির চামড়ায় অবাঞ্ছিত দাগ আর ক্ষত সৃষ্টি করবে, সেটা ওদের কাম্য নয়। সিমেন্টের দেয়াল আর মেঝেতে গাঁথা রিঙ বোল্ট থেকে বেরুনো লোহার মোটা চেইন চেয়ারটাকে বিশেষ নড়াতে পারবে না, ওটায় বসা বন্দি যতই মোচড় খাক বা হাত-পা ছুড়ুক।

আপাতত একা ফেলে রেখে যাওয়া হয়েছে, রানা অপেক্ষায় আছে কর্নেল ময়নিহান কখন ফিরবে। অনেক দিন হলো ছেড়ে দিয়েছে, তবে এই মুহূর্তে একটা সিগারেটের জন্যে ছটফট করছে মনটা। তালগোল পাকানো কিছু প্রতিচ্ছায়া

বৃত্তাকারে ঘুরছে ওর মাথায়: আমিনার নারীসুলভ কমনীয় অবয়ব, আর তার গালের মনোহর রঙ; দশ মিনিট আগে করমর্দনের সময় বসের হাতের দৃঢ় চাপ আর পলকহীন সস্নেহ দৃষ্টি; মারা যাবার আগে ভগৎসিং আচারিয়ার নিঃশব্দ আবেদন; সিকান্দারের মাথায় রক্ত; সোহেলকে পাশে নিয়ে সানিংডেল ক্লাবের গলফ কোর্সে হাঁটাহাঁটি–যেন পঞ্চাশ বছর আগের ঘটনা; রাইফেলের বুলেট লাগার পর ভারতীয় ইন্টেলিজেন্স র এজেন্টের হতবিহ্বল প্রতিক্রিয়া; প্যালেস্টাইনে লাশের সাপ্লাই সম্পর্কে আবসালাম ইয়াহুদের কৌতুক; কোয়ার্টারডেকের কিচেনে পড়ে থাকা মুক্তিযোদ্ধা দম্পতি খাদেম আর শান্তা আলির লাশ; আক্তার আমিনা। তারপর কর্নেল ময়নিহানের কাঠামো, নড়াচড়ায় শিথিল অথচ বিপুল শক্তির প্রকাশ, নীলচে ইস্পাতের মত চোখ, মুখে অমায়িক হাসি। এই লোক ওকে কষ্ট দেবে। মানুষকে যন্ত্রণা দেয়া এর একটা মানসিক ব্যাধি। খুন করা যাবে, এমন কোন সাবজেক্ট হাতে পেলে বীভৎস, কুৎসিত, অশ্লীল আর নৃশংস সব পরীক্ষা-নিরীক্ষা চালায়। রানা উপলব্ধি করল, ভয়ে ঘামছে সে।

মাথার ওপর ঘরের ছাদে পায়ের শব্দ। গভীর করে কয়েকটা শ্বাস নিতে নিজেকে বাধ্য করল রানা। ট্র্যাপ-ডোরের দরজা টেনে একপাশে সরাল গেরো, মই বেয়ে নেমে আসছে। তার হাতে কাঠের একটা ট্রে, নামিয়ে রাখল ছোট টেবিলটায়। রানার দিকে একবারও না তাকিয়ে মই বেয়ে আবার উঠে গেল সে। ট্রেতে কী আছে দেখছে রানা: মাংসে গেঁথে ঝোলাবার জন্যে লোহার দুটো সরু সিক, একটা ছোট, অপরটা বড়; এক বোতল রঙবিহীন তরল পদার্থ; কফি কাপ আকারের একটা চোঙ, সম্ভবত ঝাঁটার এক গোছা কাঠি; ছয় ইঞ্চি ব্লেড সহ একটা ছুরি, কয়েক বাক্স দেশলাই। ঘন-ঘন শ্বাস ফেলছে রানা।

নিস্তব্ধতার ভেতর নীরব অপেক্ষা স্নায়ুকে পীড়ন করছে। মাত্র এক মিনিটকে মনে হলো এক ঘণ্টা। মই বেয়ে নেমে এসে রানার চোখে সরাসরি তাকাল কর্নেল, বিনয়ের চরম প্রকাশ ঘটিয়ে ছোট্ট করে মাথা ঝাঁকাল, তারপর চেহারায় ভদ্র হাসি টেনে টেবিলের পাশে বসল ধীরে-সুস্থে।

'তুমি শুরু করার আগে, ময়নিহান,' বলল রানা, 'আমার একটা অনুরোধ আছে।'

'নিঃসংকোচে বলে ফেলো, মাই ডিয়ার রানা। তুমি জানো, তোমার কোন অনুরোধ আমি ফেলতে পারব না।'

'মেয়েটা। তাকে নিয়ে কী করেছ তোমরা?'

'মেয়েটা? আমার ধারণা, এই মুহূর্তে তার সঙ্গে সময় কাটাচ্ছে ম্যাকার্থি। ম্যাকার্থি না হলে গেরো। কিংবা হয়তো দু'জনেই। বাকি দুটো মেয়েও ওদের সঙ্গে থাকতে পারে। আজকের মত এরকম একটা বিশেষ রাতে কিছুটা স্বাধীনতা তো পেতেই পারে ওরা।'

রানা উত্তেজিত হতে চাইছে না। 'সকালে ওকে চলে যেতে দিয়ো। অন্য কোন দ্বীপে নামিয়ে দিলেই হবে। পরে সে যাই বলুক, তোমার প্রজেক্টের বিরুদ্ধে সেটা হুমকি হবে না, ততক্ষণে লোকজন নিয়ে বহু দূরে সরে যাবে তোমরা।'

'দুঃখিত,' বলল কর্নেল ময়নিহান, মাথা নাড়ছে আর শব্দ করে দীর্ঘশ্বাস ফেলছে। 'বিশ্বাস করো, আমার মন চাইছে তোমাকে সাহায্য করি, কিন্তু কোনভাবেই তা সম্ভব নয়। আমার অসহায়ত্ব তোমাকে বুঝতে হবে। এরকম সিরিয়াস অপারেশনের পর একজন সাক্ষীকে ছেড়ে দিলে গোবরভর্তি মাথা নিয়ে আমার বস্ কী বলবে ভাবো একবার। নিয়মের কেতাবে লেখা আছে, এরকম কিছু ঘটা চলবে না। কাজেই আমি দুঃখিত–মেয়েটাকে মরতে হবে। তবে এটাকে খাটো করে দেখো না–মরবার আগে ফুর্তি করবার ভাল সুযোগ দেয়া হচ্ছে তাকে।'

এরকম নির্দয় বিদ্রূপ শুনেও শান্ত থাকতে পারছে রানা। 'সেক্ষেত্রে কথা দিতে পারো পরিচ্ছন্ন মৃত্যু হবে তার? দ্রুত?' ও খেয়ালই করছে না ওর কণ্ঠস্বরে অনুরোধ আর আবেদন কী রকম–প্রায় মিনতির মত শোনাচ্ছে। 'এটা তো অসম্ভব নয়, ইচ্ছে করলেই পারো, তাই না?'

'হ্যাঁ, অবশ্যই। তুমি যাই ভাবো না কেন, আমি তো সত্যি সত্যিই আর বর্বর নই। কেউ কাউকে অহেতুক কষ্ট দিচ্ছে, এটা আমি সব সময় খারাপ চোখে দেখি। ব্যাপারটা আমি দেখব। ম্যাকার্থি এসব ব্যাপারে এক্সপার্ট, তাকে বলব সে যেন মাথার পিছনে গুলি করে। মেয়েটা কিছু টেরই পাবে না। আমি নিজে নাহয় ব্যাপারটা সুপারভাইজ করব। অন্তত এটা নিয়ে কোন রকম দুশ্চিন্তা করবার দরকার নেই তোমার।'

'ধন্যবাদ।' লোকটার কথা বিশ্বাস করছে রানা, কৃতজ্ঞ বোধ করছে। পরমুহূর্তে ক্রোধ আর ঘৃণায় ছেয়ে গেল অন্তরটা। 'এবার তোমার স্যাডিস্টিক কুকর্ম শুরু করো। এটা তোমার কঠিন একটা ব্যাধি, চিকিৎসা না করিয়ে আরও মারাত্মক করে তুলছ, ভাবছ...'

'স্যাডিজম সম্পর্কে তোমার কোন ধারণাই নেই, রানা,' বাধা দিয়ে বলল কর্নেল ময়নিহান। 'আসলে...'

'এত প্যাঁচাল পেড়ো না। থাম্-স্ক্রু আর হট আয়রন নিয়ে এসো। তোমার কথার চেয়ে ওগুলো বেশি কষ্ট দেবে না।'

এই প্রথম শব্দ করে হেসে উঠল ময়নিহান। 'তোমার চ্যালেঞ্জ সত্যি প্রশংসনীয়। তবে তুমি জানো না কী জিনিসকে চ্যালেঞ্জ করছ। ব্যাপারটা যখন শুরু হবে, তোমার গোটা অস্তিত্ব আকুল হয়ে প্রার্থনা করবে আমি যেন কয়েক সেকেন্ডের জন্যে থামি–যেন একটু হাসি, একটা কথা বলি।

'এবার, রানা...' দাঁড়াল কর্নেল, রানার চেয়ারের সামনে ছোট্ট জায়গাটায় পায়চারি শুরু করল। ভুরু কুঁচকে চিন্তা করছে। 'দেখি তোমার আন্দাজ কী রকম। বলো, তোমার শরীরের কোথায় আমি আঘাত করব? এবং কী দিয়ে?'

'তোমার মানসিক অবস্থা খুব বোরিং লাগছে আমার। একজন পাগলের মধ্যে আগ্রহ জাগাবার মত কিছু থাকে না।'

'আচ্ছা, আমিই বিবেচনা করি। ঠিক জায়গামত ব্যবহার করতে পারলে ইলেকট্রিসিটি মারাত্মক যন্ত্রণা দিতে পারে। কিন্তু এটা একটা পরিচিত পদ্ধতি,

সহজও, সূক্ষ্ম কাজ দেখাবার কোন সুযোগ নেই। তাছাড়া, ইউরোপের এই অঞ্চলে ইলেকট্রিসিটির সাপ্লাই বিশ্বস্ততাও অর্জন করতে পারেনি। আমি ব্যবহার করব কিচেন থেকে যা পাওয়া যায়–ছুরি, হুক, ঝাঁটার কাঠি ইত্যাদি।

'ফাইনাল যে ইঞ্জেকশনটা তোমাকে দেয়া হবে, যদি কিছু মনে না করো তো ওখানে তোমার সঙ্গে খানিকটা প্রতারণা করব আমি। ওই ইঞ্জেকশনের কাজ হবে তোমার শরীরে খিঁচুনি তোলা। কেমিকেলটা সংগ্রহ করা হয় শুধু চিন দেশে পাওয়া যায় এমন একধরনের ব্যাঙের ছাতা থেকে। কাজেই কেউ যদি বলে যে ওই ছাতার এসেন্স একটা কিচেনে পাওয়া সম্ভব, তুমি অস্বীকার করতে পারো না।

'সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ প্রশ্ন হলো, কোত্থেকে শুরু করব। এর উত্তর, জানা কথা–জেনিট্‌ল্ অরগ্যান। আমি শিওর, অভিজ্ঞতা থেকে তুমি জানো ওখানে কী প্রচণ্ড ব্যথা দেয়া যায়। পুরুষত্ব হারাবার ভয় থাকায় ভিক্টিম মানসিকভাবেও বিপর্যস্ত হয়ে পড়ে। কিন্তু না, এটা তোমাকে খুব বেশি ভোগাবে না। ইতোমধ্যে তুমি বুঝে ফেলেছ, রানা–আমি তোমাকে পুরুষত্ব থেকে বঞ্চিত করতে চাইছি না, কেড়ে নিতে চাইছি তোমার প্রাণবায়ু আর আত্মা। তাছাড়া, জেনিট্‌ল্ অ্যাসল্ট, কী বলব–কোনমতেই সফিসটিকেটেড বলা যায় না।'

স্বস্তিকর খানিক বিরতি। রানার কানে রক্ত ছলকাচ্ছে। স্ল্যাকস থেকে বেনসন অ্যান্ড হেজেস-এর একটা প্যাকেট বের করে ওর দিকে বাড়িয়ে ধরল কর্নেল।

'না, ধন্যবাদ।'

'ঠিক জানো? এটা হবে তোমার জীবনের শেষ ধূমপান।'

'বললাম তো, না।' রানা নিজেও জানে না নিকোটিনের নেশা কখন ছেড়ে গেছে ওকে।

'বেশ, তুমি যা বলো।' লাইটার জ্বেলে নিজেই সিগারেট ধরাল ময়নিহান। 'তাহলে? কোথায়? একজন মানুষ কোথায় বাস করে? একজন মানুষের সবচেয়ে ভেতরের জিনিসটা কোথায়–আত্মা, পরিচয়, সত্তা?

'উদাহরণ হিসেবে ধরো, একজন লোকের নখ নিয়ে অত্যন্ত অপ্রীতিকর ঘটনা ঘটানো যায়। কিংবা যেমন আমরা বলছিলাম, জেনিট্‌ল্ নিয়ে। হাঁটুর জয়েন্টে নার্ভ আছে, ফলে ওখানে কিছু বেঁধালে বা গাঁথলে অসহ্য ব্যথার সৃষ্টি হবে। কিন্তু এসবই অন্য কোথাও ঘটছে, তাই না? একজন মানুষ নিজেকে টুকরো টুকরো হতে দেখতে পারে, ব্যথার সঙ্গে ভয়ঙ্কর আতঙ্কও বোধ করতে পারে–কিন্তু এসবই তার কাছ থেকে একটু দূরে ঘটবে। এমন জায়গায় ঘটছে না…যেখানে সে আছে।'

এগিয়ে এসে রানার চেয়ারের পাশে হাঁটু গাড়ল ময়নিহান। প্রায় ফিসফিস করে কথা বলছে। কণ্ঠস্বর কাঁপা-কাঁপা। 'একজন মানুষ তার মাথার ভেতর বাস করে। ওখানে রয়েছে তার সত্তা আর আত্মার আসন। সত্যিকার সারবস্তু ওখানেই পাবে তুমি। আমি একবার এক বন্দিকে দেখেছিলাম। তার চোখ কেড়ে নেয়া হয়েছিল। ফলে অত্যাশ্চর্য একটা ব্যাপার ঘটল। সেখানে সে আর থাকলই না। কী বলছি বুঝতে পারছ, রানা? সে নেই হয়ে গেল, অথচ তখনও বেঁচে আছে। তার খুলির ভেতর কেউ ছিল না। ভারী অদ্ভুত, বিশ্বাস করো।

'তো, রানা, আমি পেনিট্রেট করতে যাচ্ছি যেখানে তুমি আছ, তোমার মাথার ভেতর। আমরা পথ হিসেবে প্রথমে বেছে নেব কান।' সিধে হয়ে টেবিলের দিকে হেঁটে এল কর্নেল। 'চোখা লোহার সিকটা নিচ্ছি। এটা তোমার খুলিতে ঢোকানো হবে।' ঘোলাটে আলোয় সরু এক প্রস্থ লম্বা মেটাল চকচক করছে। 'প্রথমে তুমি কিছুই অনুভব করবে না। উত্তেজিত করতে যাচ্ছি টেমপ্যানি মেমব্রেনকে, ওটার পেইন রিসেপটর আছে, কিন্তু টাচ রিসেপটর নেই। কাজেই প্রথম তুমি টের পাবে যখন...থাক, কী অভিজ্ঞতা হয় দেখে পারো তো নিজেই ওটার একটা নাম দিয়ো।'

জুতোর নিচে সিগারেট থেঁতলে রানার দিকে নেশাতুর দৃষ্টিতে তাকাল কর্নেল। 'আর মাত্র একটা কথা, রানা। এই পাথরের নিচে সেলারকে তুমি প্রায় সাউন্ডপ্রূফই বলতে পারো। মাথার ওপর মেঝেতে কম্বল আর তেরপল বিছানো হয়েছে, আরও সীল করবার উদ্দেশে। এক্সপেরিমেন্ট করে দেখেছি আমরা, এখানে যত জোরেই কেউ চিৎকার করুক, একশো গজ দূর থেকে কিছুই শোনা যায় না। কাজেই যত খুশি চিৎকার করতে পারো তুমি—কাউকে ডিসটার্ব করা হবে না।'

'আল্লাহ্ তোমাকে জাহান্নামে পাঠান।'

'তা সে পারবে না, রানা। সে তো আমার নাগালই পাবে না। জাহান্নামে আমি পাঠাচ্ছি তোমাকে, দেখো কীভাবে।'

তারপর, জরুরী কাজে দেরি করা উচিত নয় এরকম ব্যস্ত ভাব নিয়ে চেয়ারটার দিকে এগিয়ে এল ময়নিহান। প্রচণ্ড শক্তি আর দক্ষতার সাহায্যে রানার মাথাটা সে তার বাম হাত আর বুক দিয়ে চেপে ধরল। হাড় ও মাংসের আঙটা থেকে মাথাটা মুক্ত করতে সাধ্যমত চেষ্টা করল রানা, কিন্তু বৃথাই। দু'সেকেন্ড পরই লোহার সরু শিকের ছুঁচালো ডগার স্পর্শ পেল ও, বাম কানের গহ্বর দিয়ে অতি সতর্কতার সঙ্গে ভেতরে ঢুকছে। দাঁতে দাঁত চেপে অপেক্ষায় থাকল ও।

হঠাৎ বিনা নোটিশে এল—নিদারুণ যন্ত্রণার হতবুদ্ধিকর প্রথম আলোড়ন, পিস্তল থেকে বুলেট বেরোনোর তাৎক্ষণিক প্রচণ্ডতা নিয়ে। নিজের ফুঁপিয়ে উঠবার অস্পষ্ট আওয়াজ শুনতে পেল রানা। বিরতি মিলল কয়েক সেকেন্ড। মনে হলো, এই ব্যথা থেমে গেলে চরমানন্দের চেয়েও সহস্রগুণ তীব্র উত্তেজনা আর রোমাঞ্চ অনুভব করা যায়। এরপর ব্যথা এল বিস্ফোরণ ঘটিয়ে, প্রচণ্ড সংঘর্ষ বাধিয়ে, দাউ-দাউ আগুন জ্বালিয়ে আর আতঙ্কের বন্যা বইয়ে দিয়ে। ব্যথা...সাগরের মত উত্তাল, ব্যথা...মরুভূমির মত বিস্তৃত। আরেকটা বিরতি, আরেকটা চিন্তা: মৃত্যু এরচেয়ে কোটিগুণ কাম্য। তারপর আরও ব্যথা। কার উদ্দেশে যেন অভিমান জাগছে। শ্বাস টানো, ফোঁপাও; শ্বাস টানো, ফোঁপাও...

আওয়াজটা থেমে গেল। রানার নেতিয়ে পড়া অনুভব করে ওকে ছেড়ে দিল কর্নেল ময়নিহান। মাথা আর কপালের প্রতিটি লোমকূপ থেকে ঘাম বেরুচ্ছে, স্রোতের মত নেমে এসে ভিজিয়ে দিচ্ছে তার বুক। বড়রা কোন বাচ্চাকে আদর করবার সময় যা করে, নিজের ভেজা চুল হাত দিয়ে এলোমেলো করে দিল সে।

তারপর হঠাৎ ঘুরল, মই বেয়ে ওপরে উঠে হাত দিয়ে প্রচণ্ড ঠেলা দিল ট্র্যাপ-ডোরে। কয়েক ইঞ্চি উঁচু হলো সেটা।

ভোঁতা একটা কণ্ঠস্বর শোনা গেল। 'ইয়েস, কর্নেল?'

'ডাক্তার এখন নামতে পারে, মিস্টার ইয়াহুদ।'

কয়েক সেকেন্ডের বিরতি। তারপর, 'ইয়েস, কর্নেল। নামছেন উনি।'

প্রৌঢ় ডাক্তার তার কালো লেদার কেস নিয়ে মই বেয়ে নেমে এল। তার পিছু নিয়ে এল ইয়াহুদ আর মিক।

'আমরা নামায় আপনি কিছু মনে করলেন না তো, কর্নেল?'

'আরে না, মিস্টার ইয়াহুদ। আমি আপনাদের আগ্রহ দেখে খুশি। দেখতেই পাচ্ছেন, দর্শকদের জন্যে ব্যবস্থা করা আছে। আপনারা বসুন।'

'এ তো...' গলা পরিষ্কার করে আবার শুরু করল ডাক্তার। 'এ লোক তো জ্ঞান হারিয়ে ফেলেছে, মিস্টার ময়নিহান।'

'আমার সঙ্গে আপনার ধারণা মিলে যাচ্ছে দেখে আমি বড্ড আনন্দিত, ডাক্তার। এবার বসে পড়ে ভাল করে দেখার প্রস্তুতি নিন। এটা আপনার জন্যে অত্যন্ত উপকারী একটা ট্রেনিং। আপনি যদি আমার অধীনে সিআইএ-তে কাজ করতে চান, নৈতিকতা বিরোধী বলে কোনও কাজ থেকে নিজেকে দূরে সরিয়ে রাখার প্রবণতা অবশ্যই আপনাকে ত্যাগ করতে হবে। কি বলছি বুঝতে পারছেন তো? আপনার তালিকায় নিষিদ্ধ বলে কিছু থাকা চলবে না। এ-ও মনে রাখতে বলি যে সিআইএ-র ডিরেক্টর হওয়া আমার জন্যে স্রেফ সময়ের ব্যাপার।'

দীর্ঘ এক মুহূর্ত ইতস্তত করে মাথা ঝাঁকাল ডাক্তার লেম্যান, তারপর মিকের পাশে বেঞ্চে বসল।

'তা আমাদের জন্যে রেখেছেনটা কী, মিস্টার ময়নিহান?' জানতে চাইল ইয়াহুদ। 'আপনার কাছ থেকে আমরা অনেক বড় কিছু আশা করি। অনেকেই আমাকে বলেছে, তালেবানদের টরচার করে ল্যাঙলির কর্মকর্তারা এমন হাত পাকিয়েছে, এ-লাইনে তারাই এখন দুনিয়ার সেরা।'

কর্নেল মাথাটা একটু কাত করল, প্রশংসা শুনে খুশি, তবে সত্য প্রকাশে ব্যগ্র। 'আসলে এর ভিত্তি গড়ে ওঠে আরও অনেক আগে–ভিয়েতনামে। তখন এ লাইনে অনেক ভাল কাজ হয়েছে। শুনেছি লোহার সিক দিয়ে গেঁথে আগুনের আঁচে ভাজা-ভাজা করা হত কমিউনিস্টদের–আঁচ কমানো-বাড়ানোর ব্যবস্থা ছিল, যাতে অন্তত দিন পনেরোর আগে ভিক্টিম মারা না যায়। এরকম একটা এক্সপেরিমেন্ট করবার ইচ্ছে আমারও আছে।'

এগিয়ে এসে রানার চিবুকটা দু'আঙুলে ধরে উঁচু করল কর্নেল। রানার চোখের পাতা কাঁপছে। তারপর বার কয়েক খুলল আর বন্ধ হলো। অবশেষে স্থির হলো দৃষ্টি। 'মর শালা, ময়নিহান!' কর্কশ, অস্পষ্ট শোনাল গলার আওয়াজ।

'চমৎকার। আমরা শুরু করতে পারি। আমি ওর মাথা নিয়ে কাজ করছিলাম, মিস্টার ইয়াহুদ। এ বিষয়ে আগেই তো আপনাদের জানিয়েছি। এ পর্যন্ত সহ্য করতে পেরেছে, তবে এটা তো সবেমাত্র শুরু। এক সময় ট্রিটমেন্টের জন্যে আমি

ওর দিকে এগোচ্ছি দেখলেই চিৎকার করে এই পাথরের ঘর ফাটিয়ে ফেলতে চাইবে।

'এখন আমি ওর সেপট্যাম উত্তেজিত করবার প্রস্তাব রাখছি। নাকের ভেতর গর্তটাকে যে এক ফালি হাড় আর কোমলাস্থি বিভক্ত করেছে, ওটাকে। সবাই কি দেখতে পাচ্ছে? আচ্ছা, বেশ।'

আরও ব্যথা। শুরুতে প্রথমটার চেয়ে অন্য রকম, তারপর আলাদা করা অসাধ্য। মনের ভেতর একটা জায়াগা তৈরির চেষ্টা করল রানা, যেখানে শুধু ব্যথাই নেই, তার সঙ্গে আছে চিন্তা; এভাবে অনেক নির্যাতন থেকে সামান্য আর সাময়িক হলেও রেহাই পেয়েছে অতীতে। কিন্তু আজ সেই জায়গাটা দ্রুত দখল করে নিচ্ছে শুধু ব্যথা। মাত্র একটা চিন্তা পেয়েছে, পাবার পর ধরে রেখেছে–এবার চিৎকার করেনি সে। করবেও না। করবেও না...

পরে কখন যেন মুহূর্তের জন্যে ব্যথাটা সরে গেল। কোথায় যেন রয়েছে ও। নিজের অস্তিত্ব টের পাচ্ছে। শুধু এটুকুই বোধগম্য ঠেকছে। তবে বোঝবার মত নিশ্চয়ই আরও অনেক কিছু আছে। চিৎকার। ও কি চিৎকার করেছে? মনে পড়ছে না। তবে এখনও চেষ্টাটা থাকা উচিত–চিৎকার না করবার।

লোকজন কথা বলছে। কোথাও, সম্ভবত মাথার ভেতরই, খরস্রোতা নদীর শব্দ হচ্ছে। সেটাকে ছাপিয়ে ওঠা কিছু আওয়াজ চিনতে পারছে ও। ওর বিপদ। কারণ ওকে একটা ইঞ্জেকশন দেয়া হবে। আতঙ্ক, ভয়, ঘৃণা। হাতে পিন ফোটানোর মত অনুভূতি।

ফের ব্যথা। আরও ব্যথা। ব্যথা ছাড়া বাকি সব মিথ্যে। চিন্তা বলে দুনিয়ার কোথাও কিছু নেই।

আরও অনেক পরে নিজেকে ফিরে পেল। আবার চিন্তা এল। বরং বলা উচিত প্রকাণ্ড একটা চিন্তা সবকিছুকে ঢেকে ফেলল, সবকিছু হয়ে উঠল। অসম্ভব ভারী আর পুরু একটা কম্বলের মত ওর গোটা অস্তিত্বে চেপে বসল সেটা। সাগরতলের ঠাণ্ডা পলি যেন, ধীরে-ধীরে তার ভেতর সেঁধিয়ে যাচ্ছে ও। এরকম অভিজ্ঞতা আগে কখনও হয়নি রানার, তাসত্ত্বেও একটু পরেই চিনতে পারল কী সেটা। চরম হতাশা, প্রাণ ত্যাগের ঠিক আগের মুহূর্তে যেটা অনুভব করে মানুষ। এই সর্বগ্রাসী হতাশার তুলনায় নাক ও মুখের ভেতর তীব্র জ্বালা আর রক্তপাত, মাথার ভেতর অসহ্য দপদপে যন্ত্রণা আর খুলিতে আগুন ছড়াবার অনুভূতি কিছুই নয়।

চোখ খুলল। দৃষ্টিশক্তি খারাপ নয়। ময়নিহানের মুখ এক ফুট দূরে। তবে শেষবার দেখবার পর কিছু একটা ঘটেছে ওখানে। লাল মুখটাকে কিছু যেন এমন শুকিয়ে দিয়েছে, রঙ হারিয়ে পুরানো বইয়ের পাতার মত লাগছে চামড়া। চোখ দুটো লাল আর ঝাপসা, ঠোঁট জোড়া বিবর্ণ। ছোট-ছোট নিঃশ্বাস ফেলছে সে, একঘেয়ে শব্দ করে। ঢোক গিলছে খানিক পর-পর। রানার মনে হলো, লোকটা ওর মতই ক্লান্ত আর অসুস্থবোধ করছে। এটা একটা রহস্য হলেও, তার কোন গুরুত্ব নেই। এখন কোন কিছুরই আর কোন গুরুত্ব নেই।

মই বেয়ে কেউ নামছে। আগ্রহ নেই, তারপরও মুখ তুলে তাকাল রানা। দুই

তরুণীর একজন, যার গায়ের রঙ গাঢ় তামাটে। রানার দিকে একবার তাকাল, তবে চট্ করে আবার চোখ সরিয়ে নিল। তার শরীরের ভাষা পড়া যায়–ঘৃণা আর ভয় গোপন করে রাখছে। ধীরে-ধীরে সিধে হয়ে তার দিকে ঘুরে দাঁড়াল কর্নেল ময়নিহান।

দম আটকাল মেয়েটা। 'আপনি অসুস্থ, সার?'

'না। এটা অসুস্থতা নয়। এ হলো আমার অভিজ্ঞতার প্রতিক্রিয়া।' ময়নিহানের কণ্ঠস্বরও বদলে গেছে–কর্কশ আর ভাঙা ভাঙা, সুরটা এমন একঘেয়ে যেন ঠিকমত না বুঝেই একটা পড়া মুখস্থ করা হচ্ছে। বেশ কয়েক সেকেন্ড পর আবার মুখ খুলল সে, 'এ-ধরনের অভিজ্ঞতা মানুষের মধ্যে পরিবর্তন তো আনবেই।'

'ও। আপনি আমাকে ডেকেছেন···এখানে আমার কী কাজ, সার?'

যান্ত্রিক পুতুলের মত কাঁপা কাঁপা মাথা ঘুরিয়ে ইঙ্গিতে রানাকে দেখাল ময়নিহান। 'এই লোক···মৃত্যুর খুব কাছে চলে এসেছে। জীবনে ওর সবচেয়ে প্রিয় আনন্দ ছিল সেক্স, অর্থাৎ মেয়েমানুষ। তোমার সাহায্য নিয়ে ওকে আমি উপলব্ধি করাতে চাই চিরকালের জন্যে সেক্স থেকে বঞ্চিত হলে কেমন তেতো লাগে বেঁচে থাকাটা।'

কর্নেলের কথার মধ্যে জোর বা বিশ্বাস বলে কিছু নেই। আড়ষ্ট ভঙ্গিতে থামল সে, যেন মনের ভেতর একটা পাতা ওল্টাল। তারপর আবার শুকনো খনখনে কণ্ঠে বলল, 'আমার দেয়া মৃত্যুর মুখোমুখি দাঁড়াবার সময় মাসুদ রানার মানসিক অবস্থা হওয়া চাই চরম হতাশার গভীরে নিমজ্জিত, সীমাহীন শোকে কাতর, গোটা অস্তিত্বে শুধু হাহাকার আর হাহাকার।'

মেয়েটা বিড়বিড় করল, 'আপনি আমাকে কী করতে বলেন, সার?'

'বিবস্ত্র হয়ে ওর সামনে দাঁড়াও,' বলল ময়নিহান, যেন একটা মেসেজ পড়ে শোনাচ্ছে। 'ওকে তোমার শরীর দেখাও। একজন কামুকীর মত আচরণ করো। আদরে আদরে অতিষ্ঠ করে তোলো ওকে।'

এখনও মেয়েটা একদৃষ্টে তাকিয়ে, কিন্তু ভয়ের সঙ্গে এবার তার চেহারায় রাগ আর বিদ্রোহের ভাব স্পষ্ট। 'না!' এরপর বলবার মত শব্দ সহজে খুঁজে পাচ্ছে না। 'কেন? এ অন্যায়···এ আমি পারব না।'

'পারবে গো, মেয়ে, পারবে। করতেও তোমাকে হবে। আমার অধীনে সিআইএ-তে থাকতে হলে তালিকায় নিষিদ্ধ বলে কিছু রাখতে পারবে না। যা বলেছি–শুরু করো।'

'না!'

মড়ার মত নিষ্প্রভ সাদাটে হয়ে গেল কর্নেলের মুখ। 'তোমার এত বড় স্পর্ধা আমার নির্দেশ অমান্য করো! বেশ, বেশ, বেশ। এমন জেদ ভাঙতে পারাতেই তো আমার আনন্দ। এখন তোমার স্তন কাটা হবে। একটা। ওই অবস্থায় নাচতে বললে কেমন লাগবে, সুন্দরী? তখন যদি না নাচো, দ্বিতীয়টাও।' হাত দিয়ে ছুরি চালাবার ভঙ্গি করল সে। 'তোমার লাশ কোন

সমস্যা নয়। ফেরবার পথে সাগরে ফেলে দিলেই হবে।'

নীরবতা রানার কানে ঝড়ের শন-শন আর বজ্রের কড়াৎ-কড়াৎ গর্জন হয়ে বাজছে। মেয়েটার চেহারা আবার বদলে গেল। আর হঠাৎই, নিজেও কোন কারণ খুঁজে পেল না, অস্বাভাবিক সজাগ হয়ে উঠল রানা। প্রতিটি ঘটনা গভীর একাগ্রতার সঙ্গে লক্ষ করছে।

'ঠিক আছে,' অবশেষে বলল মেয়েটা, প্রজাপতির ডানার মত ঘন ঘন চোখের পাতা ঝাপটে কামরার চারদিকে তাকাল। 'কিন্তু প্লিজ...কেউ তাকাবেন না।'

'না, কেন দেখব? তোমার বিব্রত বোধ করবার কোন কারণ নেই। আমাদের বন্ধু মিস্টার লেম্যান একজন ডাক্তার। ওঁকে দেখেও তো মনে হচ্ছে না যে উনি তোমাকে দেখতে চাইছেন।'

বেঞ্চে একা বসে দু'হাত দিয়ে মুখ ঢেকে রেখেছে ডাক্তার লেম্যান। তার সামনের মেঝেতে পরিষ্কার করা বমির ভেজা দাগ দেখা যাচ্ছে। এক কি দু'সেকেন্ডের জন্যে তার দিকে একবার তাকাল রানা, তারপর চোখ ঘোরাল বাকি দু'জনের দিকে। মেয়েটার গায়ে আসমানী রঙের জ্যাকেট আর সবুজ স্ল্যাকস, হেঁটে টেবিলের সামনে গিয়ে দাঁড়াল। কর্নেল রানার দিকে ফিরে ওর প্রতিক্রিয়া বোঝবার চেষ্টা করছে। রানার চোখ আধ খোলা, মেয়েটাকে ঝট করে একবার কাঁধের ওপর দিয়ে তাকাতে দেখল, তারপর টেবিলের জিনিসগুলো বোধহয় একটু ছুঁলো।

ঘুরল মেয়েটা। কথা বলছে।

'আমার নিজস্ব একটা ধরন আছে। প্রথমে ওকে আমি চুমোয় চুমোয় অস্থির করে তুলব। তারপর কাপড় খুলব। কেউ কিন্তু তাকাতে পারবেন না।'

'ঠিক আছে। কীভাবে কী করলে ভাল হয় তুমিই জানো। আমি শুধু রেজাল্ট চাই।'

রানা মেয়েটাকে এগিয়ে আসতে দেখল, তার ডান হাত অদ্ভুত এক ভঙ্গিতে নড়ছে। মুখ নামিয়ে রানার ঠোঁটে ঠোঁট বুলাল সে। চোখের কোণ দিয়ে রানা দেখল, ময়নিহানের চেহারায় অসহিষ্ণুতা বা বিতৃষ্ণার একটা ভাব ফুটে উঠল, তারপর ওদের দিকে পিছন ফিরে দাঁড়াল সে। এই সময় ঠোঁটে ঠোঁট বুলানো বন্ধ করে আরেকবার কাঁধের ওপর দিয়ে পিছন দিকে তাকাল মেয়েটা। রানা অনুভব করল ওর ডান কব্জির চারধারে কী যেন নড়ছে।

ব্যাপারটা পরিষ্কার বুঝতে আরও কয়েক সেকেন্ড সময় নিল রানা। ধারাল একটা ছুরি দিয়ে তোয়ালের ফালি কাটা হচ্ছে। এই ফালিগুলোই চেয়ারটার সঙ্গে বেঁধে রেখেছে ওকে।

নয়

'এখানে মারাত্মক কিছু একটা ঘটে গেছে, সার। আমার মনে হচ্ছে এই লোক…বেঁচে নেই।'

মেয়েটার বুদ্ধি আছে। তোয়ালের কাটা ফালিগুলো দ্রুত আবার রানার কব্জিতে জড়িয়ে রেখেছে, স্বাভাবিক দৃষ্টিতে তাকালে ফাঁকিটা ধরা পড়বে না। ছুরিটা রানার শক্ত মুঠোয়, ওপর থেকে তাকালে দেখা যাবে না। লাশের অভিনয় করতে হচ্ছে–চিবুক নেমে এসে বুকে ঠেকেছে, খোলা চোখে স্থির অপলক দৃষ্টি।

'কী! বেঁচে নেই? তা কী করে সম্ভব? কখন মরল?' প্রায় উড়ে চেয়ারটার কাছে চলে এল কর্নেল ময়নিহান। মেয়েটা জায়গা ছেড়ে দিয়ে সরে গেল এক পাশে। ময়নিহানের শরীর রানার ওপর ঝুঁকল। সে-ও ঝুঁকছে, রানার হাতও পাশ থেকে উঠে আসছে। ঘ্যাচ করে বিঁধল ছোরা। হ্যাঁচকা টান দিয়ে খুলল রানা। আবার মারল। আবার।

শেষবার দু'হাত দিয়ে হাতলটা ধরতে চেষ্টা করল ময়নিহান, সেই সঙ্গে সিধে হচ্ছে। তাকে সিধে হতে বাধা না দিয়ে হাতলটা ছেড়ে দিল রানা। ময়নিহান সিধে হচ্ছে আর রানাকে দেখছে। তার চেহারায় আক্রোশ বা ঘৃণা কিছুই খুঁজে পেল না রানা। হদ্দ বোকা লাগছে তাকে, বিস্ময়ে স্রেফ হাবা হয়ে গেছে। সিধে হয়েও থামল না ময়নিহান, উল্টোদিকে কাত হয়ে পাথুরে মেঝেতে সটান আছাড় খেলো। তারপর আর নড়ল না।

মেয়েটা ফোঁপাচ্ছে। শরীরটা কোমরের কাছে ভাঁজ হয়ে আছে, একটা হাত দিয়ে শক্ত করে চেপে রেখেছে মুখটা। ঠক-ঠক করে কাঁপছে ডাক্তার লেম্যান, বেঞ্চ থেকে নিচে নামল। পালা করে দু'জনকে দেখছে রানা।

'ছুরিটা দাও আমাকে,' বলল ও। গলার আওয়াজ অস্বাভাবিক মোটা আর ভাঙা, তবে নিজের বলে চেনা যায়।

উন্মত্তের মত মাথা নেড়ে ঘুরল মেয়েটা, টেবিলের পাশের চেয়ার লক্ষ্য করে হাতড়াবার ভঙ্গিতে এগোল, তারপর হুড়মুড় করে পড়ল সেটার ওপর, মুখটা হাত দিয়ে আড়াল করা। লেম্যান ইতস্তত একটা ভাব নিয়ে এগোল, ঝুঁকল, ময়নিহানের বুকে গাঁথা ছুরির হাতল ধরে টান দিল।

ফলাটা কর্নেলের শার্টে ঘষে-ঘষে মুছল ডাক্তার। তারপর রানার বাম কব্জির তোয়ালের ফালিটা কাটতে শুরু করল। কাজ করবার ফাঁকে কথা বলছে সে, প্রায় হাঁপাতে হাঁপাতে।

'আমার ইচ্ছে ছিল আপনাকে আরও আগে সাহায্য করি। কিন্তু ভয়ে পারিনি। ওটা মানুষ নয়, পিশাচ। আপনাকে নিয়ে কী করবে আমাকে তা দেখতে বাধ্য করছিল। আমি মুখ ফিরিয়ে নিলেই মেরে ফেলার হুমকি দিয়েছে।

'আমি কল্পনাও করিনি যে এখানে এরকম কিছু ঘটবে। আমাকে বলা হয়েছিল, স্রেফ মেডিকেল সুপারভিশান। লোকজনকে ঘুম পাড়িয়ে রাখতে হবে। রাজি না হবার কোন কারণ দেখিনি। মেয়েটা–ওকে দেখে বুঝতে পারি শেষ পর্যন্ত কিছু একটা ঘটবে আজ।'

মুক্ত হয়ে দাঁড়াল রানা, টলে পড়ে যাচ্ছে দেখে তাড়াতাড়ি চেয়ারটা ধরে ফেলল। মাথার ভেতর কিসের একটা গুঞ্জন। খুলিটা যেন তরল কিছুর ভেতর সাঁতরাচ্ছে। চেষ্টা করে, জোর করে কথা বলতে পারল। 'ক'টা বাজে?' মন থেকে কে যেন স্মরণ করিয়ে দিচ্ছে নিজের শরীর বা সুস্থতা নয়, প্রথম বিবেচনা অ্যাসাইনমেন্ট।

'ওরা ফায়ার ওপেন করবে এখন থেকে ঠিক বত্রিশ মিনিট পর।' ডাক্তারের কাঁপুনি এতক্ষণে থেমেছে। আচরণে ব্যস্ততা লক্ষ করা যাচ্ছে। 'রিমোট কন্ট্রোল ডিভাইস নিয়ে পাহাড় চূড়ায় উঠবার জন্যে রওনা হয়ে গেছে মিক। ফায়ারিং-পয়েন্টে রয়েছে ইয়াহুদ, মর্টার ঠিকমত ফিট হয়েছে কি না শেষবারের মত দেখে নিচ্ছে।'

'বাকি সবাই কোথায়?'

লেম্যান জবাব দিল না। রানার পালস্ দেখছে সে। তারপর দ্রুত পরীক্ষা করল ওকে। 'আপনার যে অবস্থা, এখনই কঠিন কোন কাজই করতে পারবেন না,' বলল সে। 'আমি একটা ইঞ্জেকশন দিচ্ছি এক পলকে সমস্ত দুর্বলতা কাটিয়ে উঠবেন।' রানার দিকে পিছন ফিরে নিজের লেদার কেসটা খুলছে সে।

'আমি আপনাকে বিশ্বাস করব কেন?'

'কারণ আপনার বোঝা উচিত যে আমি দল বদলেছি। আপনার বাম হাতের বাঁধন কে কাটল? তবে আপনার জন্যে নয়, দল বদলেছি নিজের প্রাণের ওপর মায়া আছে বলে। এখানকার কাজ শেষ হলে শয়তানের বাচ্চাটা আমাকে মেরে ফেলত। এ-ব্যাপারে আমি নিশ্চিত। নিন।' রানাকে একটা হাইপডারমিক দেখাল ডাক্তার লেম্যান। 'এই ওষুধ এক ঘণ্টা তাগড়া ঘোড়া বানিয়ে রাখবে আপনাকে। তারপর আপনি ঢলে পড়বেন। তবে ততক্ষণে বাঁচুন-মরুন যা ঘটবার ঘটে যাবে।'

'বাকি সবাই কোথায়?' আবার জানতে চাইল রানা, ডাক্তারকে বিশ্বাস করবে কি না এখনও বুঝতে পারছে না।

'প্রথমে আপনার বয়স্ক বন্ধুর কথা বলি। তাকে ওষুধের সাহায্যে আপনার বসের পাশের কামরায় ঘুম পাড়িয়ে রাখা হয়েছে–যে কামরাটায় আপনাকে রাখার কথা ছিল। তার আঘাত গুরুতর নয়। চাবির দরকার হবে না। শুধু বোল্ট আছে দরজায়।'

'ওষুধ খাইয়েছে···ঘুম ভাঙাবার উপায় কী?'

'ওষুধটা কড়া কিছু নয়। এরকম একটা ইঞ্জেকশন দিলেই জেগে উঠবে। সঙ্গে করে নিয়ে যান। এই সেলার ছেড়ে কোথাও আমি যাচ্ছি না, আগে আপনি ফিরে এসে জানান যে ওপরে ওঠাটা নিরাপদ হবে কি না। লড়াই-টড়াই আমার দ্বারা হয় না।' একটা কার্ডবোর্ড বাক্সে ভরে হাইপডারমিকটা রানার হাতে ধরিয়ে দিল ডাক্তার।

ব্যাপারটা হয়তো কল্পনা, তবে ইঞ্জেকশন নেয়ার পর এক মিনিটও পার হয়নি অথচ মাথাটা আগের চেয়ে পরিষ্কার লাগছে, শরীরের দুর্বলতাও যেন ধীরে ধীরে কেটে যাচ্ছে। 'আর মেয়েটা?' লেম্যানকে জিজ্ঞেস করল ও।

'প্যাসেজের একটা কামরায় পাবেন তাকে, ল্যান্ডিঙের উল্টোদিকে–বাঁয়ে, প্রথম দরজা।'

'ম্যাকার্থি?'

'কার্লাকে ডাকতে গিয়ে ম্যাকার্থিকেও ওই কামরায় দেখেছি আমি,' বলল ডাক্তার, চেহারা থমথম হয়ে উঠল। 'ওদের সঙ্গে হেলেনও আছে। তবে গেরোস্কি কোথায় জানি না। আপনার দেরি করা উচিত হচ্ছে না, মিস্টার রানা। গেরোকে নিয়ে ম্যাকার্থির এখানে নামার কথা–আপনাকে ফায়ারিং পয়েন্টে নিয়ে যাবে।'

'হ্যাঁ, ঠিক। আরেক লোক–হাতে ব্যান্ডেজ বাঁধা, গ্রিক। সে কোথায়?'

'আপনার বসের উল্টোদিকের কামরায়। তাকেও ঘুম পাড়িয়ে রাখা হয়েছে, কাজেই সে কোন সমস্যা নয়।'

'এদের মধ্যে কার কার কাছে অস্ত্র আছে?'

'ম্যাকার্থির পিস্তল সব সময় হিপ-পকেটে থাকে, ডানদিকে। গেরোস্কির কাছে কোন অস্ত্র আমি দেখিনি। ইয়াহুদের কথা বলতে পারব না।'

'মিক?'

লেম্যান ইতস্তত করছে। 'তার ব্যাপারটাও আমি জানি না। তবে তাকে নিয়ে আপনার দুশ্চিন্তা না করলেও চলবে। সে পাহাড়ের চূড়ায় উঠে বসে আছে।'

'হয়তো। ময়নিহানকে আপনি একবার পরীক্ষা করবেন না?'

হাঁটু গেড়ে কর্নেলের পাশে বসল লেম্যান। 'এখনও বেঁচে আছে, তবে না থাকবারই মত। জীবনে আর লড়তে পারবে বলে মনে হয় না। রক্ত ক্ষরণেই মারা যাবে। নাকি আপনি চান নিজের হাতে শেষ করবেন?'

রানার হাতে ছুরিটা রয়েছে। সেটার দিকে তাকিয়ে মাথা নাড়ল। 'না। মেয়েটা…কার্লার দিকে নজর রাখবেন,' বলল ও, 'আমি ফিরে আসব।'

'হ্যাঁ, প্রার্থনা করি। আমরা বোল্ট লাগিয়ে দিচ্ছি। গুড লাক।'

এবার যেতে হয়, তা না হলে মারাত্মক দেরি হয়ে যাবে। কিন্তু পাশ কাটাবার সময় কার্লাকে কিছু না বললেই নয়। এই অচেনা মেয়ে ওর প্রাণ বাঁচিয়েছে। চেয়ারে পা তুলে কুঁকড়ে বসে আছে সে, ভাঁজ করা হাঁটুর মাঝখানে মুখ ঢেকে। তার মাথার পিছনে একটা হাত রাখল রানা। 'ধন্যবাদ, কার্লা।'

মুখ তুলে তাকাল মেয়েটা। এখন সে কাঁপছে না বা কাঁদছেও না।

'কি কারণে কাজটা করলে তুমি?'

'ও…' কর্নেল ময়নিহানের দিকে তাকাল না, শুধু হাত তুলে দেখাল কার্লা, '…আমাকে মেরে ফেলত। আমাদের সবাইকে মেরে ফেলত। কারণ ও তার অপকর্মের সাক্ষী রাখতে চাইত না। এ-কথা ও ম্যাকার্থিকে বলেওছে। আর আপনি…ভাল।'

তার ঠাণ্ডা কপালে হালকা একটা চুমো খেয়ে মই বেয়ে উঠতে শুরু করল

রানা। খুব খারাপ একটা সময় গেল ট্র্যাপ-ডোর ঠেলেও যখন নড়ানো গেল না। ওটার মাথায় খুব ভারী কিছু যদি রাখা হয়ে থাকে তাহলে খেলা শুরু করবার আগেই হেরে গেছে রানা। তারপর ওর মনে পড়ল ময়নিহান কী বলেছিল। সেলারের মাথার ওপর মেঝেতে কম্বল আর তেরপল বিছিয়ে রাখা হয়েছে, নিচের চিৎকার যাতে বাইরে বেরুতে না পারে।

আরও জোরে ঠেলল রানা। ধীরে ধীরে উঁচু হচ্ছে কবাটটা। শরীরে ব্যথা পাচ্ছে রানা, তবে অসহনীয় কিছু নয়।

কিচেনে কাউকে পাওয়া গেল না। জানালা দিয়ে পাথুরে একটা ঢাল দেখা গেল, হাতির পেটের রঙ পেতে যাচ্ছে। লেম্যানের হিসেবে যদি ভুল না হয়, কাল রাতে পৌঁছানো ডেলিগেটদের খুন করবার জন্যে আইলিটের বাড়ি লক্ষ্য করে কামান দাগা শুরু হবে এখন থেকে বিশ মিনিট পর। এই সময় রানার জন্যে যথেষ্ট, যদি অপ্রত্যাশিত কোন ঝামেলা সৃষ্টি না হয়।

কিচেনের বাইরে প্যাসেজটাও অন্ধকার আর খালি। তবে শেষ মাথার হলরুমটা আলোকিত। হাতে ছুরি, প্যাসেজের বাঁকে এসে সাবধানে উঁকি দিল রানা।

বাড়ির পাশের খোলা দরজার সামনে কোমরে হাত দিয়ে দাঁড়িয়ে রয়েছে গেরো। তার পিঠ প্রায় পুরোপুরি রানার দিকে ফেরানো, সম্ভবত ফায়ারিং-পয়েন্টে আবসালাম ইয়াহুদকে কাজ করতে দেখছে বা তাকে সাহায্য করবার জন্যে তৈরি হয়ে অপেক্ষা করছে ওখানে। রুশ লোকটা যতই অসতর্ক হোক, এই পরিস্থিতিতে তাকে নিঃশব্দে খতম করা সম্ভব নয়। চোখ দিয়ে বাঁক থেকে সিঁড়ির নিচেটা মাপল রানা। আঠারো কদম। ধরা যাক বিশ।

উজ্জ্বল আলোয় উদ্ভাসিত হলরুম ধরে তিন পা এগিয়েছে রানা, দেখল হাতঘড়ির ওপর চোখ বুলাতে যাচ্ছে গেরো। লোকটা সময় দেখবার আগেই পিছিয়ে প্যাসেজে ফিরে এল ও। হাতটা আবার কোমরে চলে এল। হলরুম পেরিয়ে দ্রুত সিঁড়ির দিকে এগোল রানা।

নির্জন ল্যান্ডিঙে নিঃসঙ্গ একটা বালব জ্বলছে। ইতস্তত না করে ডান দিকে ঘুরল রানা, শেষ দরজার আগেরটার সামনে থামল। বোল্ট খুলতে কোন সমস্যা হলো না। কবাট ফাঁক হলো নিঃশব্দে। নাক ডাকার শব্দ গাইড করছে ওকে। ওর বাম হাত মুখে পৌঁছে গেল, ডান হাত ছুরি নিয়ে তৈরি; বলা তো যায় না, এখনও একটু সম্ভাবনা আছে ডাক্তার হয়তো...তাগাদার সুরে কানের কাছে ফিসফিস করল ও, 'মিস্টার সিকান্দার। সিকান্দার, আমি রানা।'

ঝাঁকি খেলো লোকটা। গুঙিয়ে উঠল। এক মুহূর্তের ধস্তাধস্তি। তারপর শান্ত। সাবধানে হাতটা এক ইঞ্চি সরাল রানা।

'মিস্টার রানা,' পরিচিত কণ্ঠ ফিসফিস করে উঠল। 'ওদের হাতে আমি ধরা পড়ে গেছি–বুঝতেই পারছেন।'

'আপনার শরীর কেমন?'

'মাথায় খুব ব্যথা, অথচ এত ঘুম পাচ্ছে যে চোখ খোলা রাখতে পারছি না।'

'একটা ইঞ্জেকশন দিলে আচ্ছন্ন ভাবটা অন্তত কেটে যাবে। হাতটা দিন।' কথা বলবার ফাঁকে হাইপডারমিকটা বের করে ফেলেছে রানা। 'শয়তানের ধাড়ি আমেরিকানটা অচল হয়ে পড়ে আছে সেলারে। বাড়িতে আরও দু'জন লোক আছে, সামলাতে হবে এক এক করে। এই ফ্লোরের আরেক দিকে একটা বেড়রূমে আছে একজন।'

হাতে সুই ফুটতে গাল কোঁচকাল সিকান্দার। 'আপনি কোনদিনই ভাল ডাক্তার হতে পারবেন না। হ্যাঁ, বলুন।'

'লোকটা ডাক পাবার অপেক্ষায় আছে। আমি নক করব। সে বেরিয়ে এলে–না এলে মুশকিল–আপনার কাজ হবে তাকে চিৎকার করতে না দেয়া। সে যদি হাঁক-ডাক শুরু করে, আমরা শেষ। তারপর যা করার আমি করব।'

'আপনার সঙ্গে কী?'

'একটা ছুরি। আপাতত আপনাকে কিছু দিতে পারছি না। শুনুন। কামরাটায় তার সঙ্গে আমিনা ছাড়াও একটা গ্রিক মেয়ে আছে। তারমানে ঝামেলা বাধতে পারে। দেখতে হবে ঠিক কী ঘটে।'

'ঠিক আছে।'

'ওষুধের কোন প্রভাব টের পাচ্ছেন?'

'বোধহয় নড়াচড়া করলে দ্রুত কাজ করবে। আমি তৈরি।'

প্যাসেজ হয়ে সিঁড়ির মাথায় চলে এল ওরা। নিচে তাকিয়ে কাউকে দেখতে পেল না রানা, এক মুহূর্ত কান পেতে কিছু শুনতেও পেল না। লেম্যানের বলে দেয়া দরজাটার দু'পাশে পজিশন নিল দু'জন। মৃদু শব্দে নক করল রানা।

'আরে বাবা, কে?' ঘুম জড়ানো একটা কণ্ঠস্বর ভেসে এল।

'লেম্যান,' ডাক্তারের কণ্ঠস্বর নকল করল রানা।

নীরবতা দীর্ঘ হচ্ছে দেখে ঠোঁট কামড়াল ও। তারপর ভেসে এল, 'আসছি।'

কামরার ভেতর বিছানার স্প্রিং ক্যাঁচ-ক্যাঁচ করে উঠল। মেঝেতে ঘষা খেলো এক পাটি জুতো। একটা নারীকণ্ঠ বিড়বিড় করে কী বলল বোঝা গেল না। লোকটা সশব্দে হাই তুলল। আধ মিনিট আর কোন আওয়াজ নেই। তারপর পায়ের শব্দ দরজার দিকে এগিয়ে এল। তালায় চাবি ঢোকবার পর ঘুরছে। ঘরের আলো লাফ দিয়ে প্যাসেজে পড়ল। শার্টের বোতাম লাগাতে লাগাতে ঘর থেকে বেরিয়ে এল ম্যাকার্থি, চেহারায় সন্দেহের লেশমাত্র নেই।

সিকান্দারের বয়স হলে কী হবে, তার ক্ষিপ্রতা যেমন অবিশ্বাস্য, তেমনি দীর্ঘ শরীরে শক্তিরও কোন অভাব নেই। ম্যাকার্থি ঝাপসা একটা ঝলকের মত নড়ে উঠতে দেখল তাকে। চোখের পলকে এক হাত দিয়ে পেঁচাল তাকে সিকান্দার, অপর হাত দিয়ে মুখ চেপে ধরেছে। পরমুহূর্তে আধ মন ওজনের একটা ঘুসি খেলো ম্যাকার্থি সরাসরি নাকে। ওটা ভেঙে গেল, হড়হড় করে রক্ত বেরুচ্ছে। 'এটা খাদেম আর শান্তা আলির প্রতিশোধ,' হিসহিস করে বলল রানা, হাতের ছুরি পাঁজরার ফাঁক গলিয়ে সরাসরি হৃৎপিণ্ডে গেঁথে দিল। একবার মাত্র ঝাঁকি খেয়ে স্থির হয়ে গেল শরীরটা। ম্যাকার্থির লাশকে পাশ কাটিয়ে ঘরের ভেতর ঢুকল রানা।

গায়ে চাদর জড়িয়ে মেঝেতে শুয়েছিল আমিনা, ঝট করে উঠে বসে বিহ্বল দৃষ্টিতে তাকিয়ে থাকল রানার দিকে। কিন্তু রানা তাকিয়ে আছে বিছানায়, স্বর্ণকেশিনীর দিকে। সে-ও উঠে বসেছে, অন্তত কোমর পর্যন্ত দেখা যাচ্ছে নগ্নই। সেটা রানা প্রায় খেয়ালই করল না। বিস্ফারিত চোখ দুটোর দিকে তাকিয়ে থেকে হাতের ছুরিটা সামনে আনল ও, এগোচ্ছে। 'একটা শব্দ করে দেখো, এখনি খুন হয়ে যাবে।'

'না…না, আমি চুপ করে আছি।' আত্মরক্ষার ভঙ্গিতে একটা তালু সামনে বাড়াল সে, হাতটা কাঁপছে। অপর হাত দিয়ে চাদর তুলে বুক ঢাকল।

রানা তার কাছাকাছি বিছানার মাথার কাছে দাঁড়িয়ে থাকল। মেঝেতে সিধে হলো আমিনা, তার বুকে ব্রেসিয়ার আর কোমরে প্যান্টি রয়েছে। এগিয়ে এল সে। পরস্পরের হাত এক হলো।

'তোমার কিছু হয়নি তো, রানা?' জিজ্ঞেস করল সে। 'গলার আওয়াজ কেমন অদ্ভুত শোনাচ্ছে।'

'আমি ভাল আছি।' কত কথা বলতে চাইছে রানা, কিন্তু সময়ের অভাবে পারছে না। 'তুমি কেমন আছ?'

'তোমাকে ফিরে পাবার পর আমার চেয়ে ভাল আর কে আছে। এই ডাইনীটার মুখে পট্টি বাঁধো। সিদ্ধান্ত নেয়ার মালিক আমি হলে ওর মুখ আমি চিরকালের জন্যে বন্ধ করে দিতাম। সিকান্দার চাচা, আপনি কেমন আছেন? আমি তো ধরেই নিয়েছিলাম আপনাকে ওরা মেরে ফেলেছে।'

'একরকম মেরেই ফেলেছিল, আল্লাহর দয়ায় এখনও টিকে আছি।' ম্যাকার্থির শরীরটা বয়ে এনে কামরার এক কোণে নামিয়ে রাখল সিকান্দার। তার হাতে এখন একটা পিস্তল দেখা যাচ্ছে–ব্যারেল কাটা স্মিথ অ্যান্ড ওয়েসন। 'আমাদের উচিত–' হঠাৎ থেমে গেল সে।

ভারী পায়ের আওয়াজটা সবাই ওরা শুনতে পেল। পাথর দিয়ে বাঁধানো হলরুমের মেঝে ধরে হেঁটে এসে সিঁড়ির ধাপ বেয়ে ওপরে উঠছে।

'ও-ই আমাদের দ্বিতীয় লোক,' বলল রানা।

ওর নয়, অকস্মাৎ বিদ্যুৎ খেলে গেল আমিনার শরীরে। ধাঁই করে হেলেনের চিবুকের নিচে বিশ কেজি ওজনের একটা ঘুসি বসিয়ে দিল সে। হেলেনের মাথা খাটের পিছনের উঁচু কাঠে ঠুকে গেল। পাঁচ সেকেন্ডের মধ্যে তার অচেতন শরীরটা চাদরে ঢেকে দিল আমিনা। সিকান্দার তোবড়ানো একটা ওয়ার্ড্রোবের আড়ালে নিজেকে লুকিয়ে ফেলল। রানা সরে গেছে দরজার পিছনে।

গেরো কোন সুযোগই পেল না। চৌকাঠ পেরোল সে, এক কোণে ম্যাকার্থিকে পড়ে থাকতে দেখে বিস্ময়ে 'আরি!' বলে উঠল, এক মুহূর্ত থেমে দ্রুত এগোল সেদিকে, সেই সঙ্গে ছুরির ফলাটা সেঁধোতে দিল স্তনের নিচে, রানার বাম হাত মুখটা চেপে রেখেছে।

'গ্রেট!' বলল আমিনা, লাশ দুটোর ওপর চোখ। 'এখানে খুব তাড়াতাড়ি মারা গেল, আশা করি নরকে গিয়ে খুব কষ্ট পাবে।'

আবার তার একটা হাত ধরল রানা। 'ওদের কথা বাদ দাও। আমি কী বলি শোনো। বাড়িটা আপাতত খালি। আমি আমার বসকে এখানে আনতে যাচ্ছি। এই কামরার চাবি কোথায়?'

'লম্বা কুকুরটার পকেটে।'

'আমার বস্ আর তুমি তালা লাগিয়ে ঘরের ভেতর থাকবে, যতক্ষণ না আমি ফিরে আসি। চুপ!' আমিনা প্রতিবাদ করতে যাচ্ছে দেখে চোখ রাঙাল। 'আমাদের কাছে শুধু একটা পিস্তল আর একটা ছুরি আছে, নিরস্ত্র কাউকে সঙ্গে রাখাটা বোকামি হবে। সিকান্দার সব ব্যাখ্যা করবে। মেয়েটার মুখে কাপড় গুঁজে হাত-পা বেঁধে ফেলো। পারবে?'

'আনন্দের সঙ্গে।'

রাহাত খানকে নিয়ে ফিরে এসে রানা দেখল, অজ্ঞান হেলেনের মুখে কাপড় গোঁজা আর হাত-পা বাঁধা শেষ করে তাকে চাদর দিয়ে ঢাকছে আমিনা। সিকান্দারও লাশ দুটো চাদর দিয়ে ঢেকে ফেলেছে। রাহাত খান একটা ঘোরের মধ্যে রয়েছেন, পরিষ্কার ধারণা নেই চারপাশে কী ঘটছে। রানার নরম ডাক শুনে কামরা থেকে বেরিয়ে এসেছেন তিনি, প্যাসেজ ধরে হাঁটার সময় কোন শব্দ করেননি। এই মুহূর্তে বিছানার কিনারায় ধপাস করে বসে পড়লেন। ঘাড়ের একটা নার্ভ তিড়িক তিড়িক করে বার কয়েক লাফাল। তাঁর দিকে ব্যগ্র-ব্যাকুল দৃষ্টিতে তাকিয়ে আছে রানা।

ওর এই দৃষ্টি আমিনার চোখে পড়ে গেল। 'উনি ভাল থাকবেন, কথা দিচ্ছি আমি।' রানার একটা হাত ধরে মৃদু চাপ দিয়ে আশ্বস্ত করল। 'এখন যাও ওদেরকে খতম করে এসো।'

'এরপর কী?' কামরা থেকে বেরুবার সময় রানাকে জিজ্ঞেস করল সিকান্দার।

'ট্রেঞ্চ মর্টার অপারেট করবে ইয়াহুদ। তার সহকারী মিক পাহাড়ের মাথায় উঠে অপেক্ষা করছে। ইয়াহুদ শেল ছুঁড়লে সেগুলোকে রিমোট কন্ট্রোলের সাহায্যে আইল্লিটের বাড়িটার ছাদে ফেলবে সে।'

'বুদ্ধি আছে, তাই না? যদিও কামানের গোলা রিমোট কন্ট্রোলের সাহায্যে নিয়ন্ত্রণ করা যায়, এমন কথা বাপের কালেও শুনিনি। টার্গেটে লাগাতে পারবে তো?'

'পারবে। অনেক আগে থেকে প্র্যাকটিস করছে। দাঁড়ান—ওই দেখুন।'

ল্যান্ডিঙের একটা জানালা থেকে ফায়ারিং-পয়েন্টের অংশবিশেষ দেখা যাচ্ছে। ইতোমধ্যে অ্যাসম্বল করা ট্রেঞ্চ-মর্টারের পরিচিত আকৃতি দেখতে পাবার মত ভোরের আলো যথেষ্টই ফুটেছে—বেস-প্লেটটা চৌকো, তাতে ক্ল্যাম্প দিয়ে কাত করে আটকানো হয়েছে আড়াই ফুট স্টোভ-পাইপ। গাইডেন্স সিস্টেমসহ যে ট্রেঞ্চ-মর্টার বাংলাদেশ আবিষ্কার করেছে সেটা দেখতে যেমন সাদামাঠা, খরচ যেমন কম, লক্ষ্যভেদেও তেমনি অব্যর্থ। আংশিক চুরি করা নকশার সাহায্যে ইজরায়েল কী জিনিস বানিয়েছে তারাই ভাল বলতে পারবে। ফায়ারিং-পয়েন্টের কাছে, ছায়ার ভেতর, নড়াচড়ার অস্পষ্ট আভাস পাওয়া যাচ্ছে। আবসালাম ইয়াহুদ

ছাড়া আর কে হবে।

সম্ভাব্য প্ল্যান মাত্র কয়েকটা। রানা বেছে নিল যেটা সবচেয়ে দ্রুত কাজ করবে। 'পিস্তলটা নিয়ে টেরেস হয়ে বাড়ির পিছনে বেরিয়ে যান, মিস্টার সিকান্দার। একটা পথ তৈরি করে লোকটার মাথার ওপরদিকে পৌছাবেন। আমি এগোব সাগরের দিক থেকে। ঝাঁপিয়ে পড়বার মত কাছে যদি না-ও পৌছাতে পারি, আপনার দিক থেকে তার চোখ অন্তত সরিয়ে রাখতে পারব।'

'সেক্ষেত্রে সাবধানে থাকতে হবে আপনাকে। এই ব্যারেল কাটা পিস্তল নিয়ে খুব কাছে থেকে গুলি করতে হবে আমাকে, তা না হলে আপনাকে না লাগিয়ে বসি। ওর কাছে পিস্তল আছে?'

'জানি না।'

'আপনি আমাকে পাঁচ মিনিট সময় দেবেন।'

'তার বেশি নয়, সময়ের খুব টানাটানি।'

হলরুমে নেমে নিঃশব্দে করমর্দন করে বিচ্ছিন্ন হলো ওরা। সিটিং রুমের ভেতর দিয়ে হনহন করে এগোল রানা–এখানেই প্রথম জ্ঞান ফিরে পেয়েছিল ও। টেরেসে বেরিয়ে এল, সেখান থেকে বাড়ির পশ্চিম কোণে। উঁকি দিয়ে সামনেটা ভাল করে দেখে নিচ্ছে।

ফায়ারিং-পয়েন্টে দাঁড়িয়ে কাজ করছে ইয়াহুদ। দেখে মনে হলো অ্যামিউনিশনের একটা বাক্স খুলছে সে। হ্যাঁ, তাই। প্রকৃতির তৈরি একটা উঁচু প্ল্যাটফর্মে রয়েছে মোসাদ এজেন্ট, রানার কাছ থেকে মাত্র বিশ গজ দূরে। দু'জনের মাঝখানে ভাঙাচোরা আর এবড়োখেবড়ো পাথুরে জমিন, তবে আড়াল নিয়ে সরাসরি এগোবার কোন উপায় নেই। একটাই পথ খোলা দেখছে রানা–সাগরের সঙ্গে সমান্তরাল একটা রেখা ধরে এগিয়ে পাহাড়-প্রাচীরের তৈরি আড়ালে পৌছানো। কিন্তু তাতে অসুবিধে হলো, খোলা একটা জায়গা পেরুতে হবে, কেউ ওদিকে তাকিয়ে থাকলে তার চোখের সামনে দিয়ে। এই মুহূর্তে ইয়াহুদ যেখানে রয়েছে, ওই খোলা জায়গায় কিছু নড়লে তার চোখের কোণে ধরা পড়বার প্রচুর সম্ভাবনা আছে।

তবে লোকটা পিছন ফিরতে বাধ্য, পাহাড় চূড়ায় উঠে যাওয়া মিকের দিকে তাকাতে হবে না! ইয়াহুদকে অবশ্য ব্যস্ত মনে হচ্ছে না। এক মিনিট পার হয়ে গেল। এক সারি গোলা মাটিতে সাজিয়ে রাখল সে। মর্টারের মুখ থেকে ক্যানভাসের কাভারটা সরাল। সিধে হয়ে আড়মোড়া ভাঙল। তারপর একটা সিগারেট ধরাল। অবশেষে ঘুরল সে, মুখ তুলে খুঁটিয়ে পরীক্ষা করছে স্কাইলাইন। রানা ছুটল।

পাহাড়-প্রাচীরের কোণে পৌছাতে চাইছে ও। দূরত্বটুকু তিন চতুর্থাংশ পার হয়েও এসেছে। হঠাৎ ছোট্ট আলগা পাথরটায় পা লাগতে সশব্দে গড়াতে শুরু করল সেটা। অমনি ঝট করে ঘুরেই দেখে ফেলল ওকে ইয়াহুদ। ছোটার গতি এতটুকু না কমিয়ে রানা শুধু দিক বদল করল, সোজা ফায়ারিং-পয়েন্টের দিকে যাচ্ছে। উঁচু-নিচু পাথুরে জমিনের ওপর হোঁচট খাচ্ছে, ভয় পাচ্ছে যে-কোন

মুহূর্তে একটা বুলেট এসে থামিয়ে দেবে ওকে। কিন্তু যেটা আশা করেনি সেটাই ঘটল। চারদিক থরথর করে কাঁপিয়ে দিয়ে গর্জে উঠল কামান। কানের পর্দা যেন ফেটে যাবে। একটা গোলা ছুটল। দুটো। তিনটে। তারপর ঘুরল ইয়াহুদ, সরে এসে রানার জন্যে অপেক্ষা করছে, হাত দুটো নিজের সামনে বাড়িয়ে রেখেছে–উঁচু জায়গায় গর্তে পা বাধিয়ে দাঁড়াবার সবটুকু সুবিধে সে একাই পাচ্ছে।

কিন্তু তার এই সুবিধেজনক পজিশন অর্থহীন হয়ে গেল তাকে বাদ দিয়ে রানা কামানটাকে টার্গেট করায়। শেষ মুহূর্তে ডাইভ দিল রানা, কামানের ব্যারেল ও বেস-প্লেট সহ যা কিছু আছে সব এক ধাক্কায় কাত করে প্ল্যাটফর্ম থেকে ফেলে দিল। অন্তত কিছুক্ষণ হামলা করবার আর কোন সম্ভাবনা নেই। মাথায় একটা ব্যথা লাগল। মাটি থেকে সিধে হচ্ছে, মনে হলো খুলির ভেতর সব কিছু গলে তরল হয়ে যাচ্ছে, তারপর মুছে যাচ্ছে। সব কিছু স্থির আর অন্ধকার হয়ে গেল। তারপর আর কিছু মনে নেই।

এখানে সিকান্দার আছে। অদৃশ্য একটা দেয়ালের ওদিক থেকে ভেসে এল তার কণ্ঠস্বর। 'মিস্টার রানা। চোখ খুলুন। কত কাজ পড়ে রয়েছে বলুন তো!'

'কতক্ষণ…?'

'বড় জোর এক মিনিট। পিশাচটা আপনাকে লাথি মারল, আপনি পড়ে গেলেন। শালা বেজন্মা একটা ভারী পাথর তুলে আপনার খুলি ফাটাতে যাচ্ছিল, কাজেই বাধ্য হয়ে গুলি করতে হলো আমাকে। রেঞ্জ খুব বেশি হলেও গুলিটা নিশ্চয়ই খুব কাছ দিয়ে গেছে। কপাল ভাল যে আপনাকে লাগেনি। আপনার কথা ভুলে ছুটে গিয়ে বাড়ির ভেতর ঢুকেছে সে। আপনি সুস্থ?'

নিজের পায়ে দাঁড়িয়ে শরীরটাকে সিধে করল রানা। 'হ্যাঁ। চলুন ব্যাটাকে ধরি। এবার একসঙ্গে।'

'তবে সামনে আমি থাকব। ভুলবেন না, তাকে আমি মারব।'

পাশের দরজা দিয়ে ভেতরে ঢুকল ওরা। প্যাসেজের সঙ্গে কামরাগুলো খালি। সিঁড়ির দিকে সাবধানে এগোচ্ছে, হঠাৎ অ্যাঙ্কারিজে মোটরের শব্দ হতে থমকে দাঁড়িয়ে পড়ল।

পড়িমরি করে টেরেসে বেরিয়ে এল ওরা, সামনে রয়েছে সিকান্দার। আউটবোর্ড মোটর লাগানো ডিঙ্গিটা সরে যাচ্ছিল, কিন্তু টিলারে অনভিজ্ঞ হাত পড়ায় ওটার পিছন দিক আর গুড়ি মেরে থাকা একমাত্র আরোহী প্রায় ওদের পায়ের নিচে চলে এল। ছোট্ট একটা লাফ দিয়ে বোটে নামতে সিকান্দারের কোন অসুবিধেই হলো না। সে কথা বলছে ওপর দিকে না তাকিয়েই। হাতের ব্যারেল-কাটা পিস্তল ইয়াহুদের বুকে তাক করা।

'মেজরকে নিয়ে একটু হাওয়া খেয়ে আসি, মিস্টার রানা। এখন আর খুব একটা তাড়া নেই আমাদের। কাজ বলতে মেজরের সহকারী ছোকরাটাকে সামলানো, তবে পাহাড় থেকে নামতে সময় লাগবে তার। আমি ফিরে এসে কাজটায় আপনাকে সাহায্য করতে পারব বলে মনে হয়।'

মোটর বন্ধ করে দিয়ে মাথাটা ঘোরাল ইয়াহুদ। ভোরের ম্লান আলোয় ক্ষতিগ্রস্ত

চামড়া বীভৎস দেখাচ্ছে, যেন ঘৃণ্য কোন রোগের উপজাত। 'ভাবসাব দেখে মনে হচ্ছে, এই লোক আমাকে খুন করতে চায়,' খন্‌খনে গলায় বলল সে। 'আপনি দেখতেই পাচ্ছেন, আমি নিরস্ত্র এবং অসহায়। কোমল মনের অধিকারী বলে আপনার খ্যাতি আছে, মিস্টার রানা। এটা আপনি অনুমোদন করবেন?'

'তুমি সমস্ত আইনের বাইরে চলে গেছ, ইয়াহুদ,' ধীরে-ধীরে বলল রানা। 'বিশেষ করে বসনিয়া হার্জেগোভিনায় তুমি যা করেছ, তারপর।'

'বোঝা গেল তর্ক করা বৃথা। আবেগ সব গিলে ফেলেছে ব্যাটা।' ইয়াহুদ কাঁধ ঝাঁকাবার হালকা ভঙ্গি করল। 'তা বেশ। চলো তাহলে হাওয়া খেতেই যাই।'

বোট আবার স্টার্ট নিয়ে চলতে শুরু করল। ক্রমশ দূরে সরে যাচ্ছে ওটা। দু'মিনিট তাকিয়ে থেকে দেখল রানা, তারপর ঘুরে বাড়িতে ফিরে এল। রক্তের দাগগুলো চোখে পড়ল হলরুমে ঢোকবার পর।

প্যাসেজের বাঁকে অনেকগুলো ফোঁটা, এখানে কেউ যেন কিছুক্ষণ বিশ্রাম নিয়েছে। সাইড ডোর-এর কাছেও খানিকটা দেখা গেল। ঘুরল রানা, ছুটে কিচেনে চলে এল।

ট্র্যাপ-ডোরের কবাট এক পাশে ছুঁড়ে ফেলা হয়েছে। নিচের সেলারে চিৎ হয়ে শুয়ে রয়েছে কার্লা, চোখ দুটো খোলা, লোহার একটা সরু সিক হৃৎপিণ্ডে গাঁথা। দেয়ালে পিঠ ঠেকিয়ে মেঝেতে বসে রয়েছে ডাক্তার লেম্যান, হাঁটু দুটো বুকের কাছে তোলা। কালো লেদার কেসটা পাশেই পড়ে রয়েছে, সঙ্গে ভাঙা একটা হাইপডারমিক। লোকটার মুখে এতটুকু রঙ নেই। চোখ খুলল সে, কথা বলল তোতলানোর ভঙ্গিতে।

'লো-লোকটা ভুলে গে-গেছে,' বলল সে। 'ভুলে গেছে যে পেটে যতই গর্ত থা-থাক, মারফিয়া একজন লোকের কতটুকু উপকারে লাগতে পা-পারে। হয়তো জা-জানেই না সে।'

আতঙ্ক, সেই সঙ্গে চরম অবিশ্বাস রানার মুখে লাগাম পরিয়ে রেখেছে। কথা বলতে সময় নিল ও। 'কিন্তু কীভাবে…এত কিছু করল? বিশ মিনিট আগে আপনিই তো বললেন, জীবনে আর নড়তে পারবে না।'

'ওরকম গুরুতর জখম নিয়ে সাধারণ কোন মানুষ সত্যি নড়তে পারবে না। অথচ এই লোক আমাকে লক্ষ্য করে লাফ দিয়েছে!' শিউরে উঠল লেম্যান, হাঁপাচ্ছে। 'সুপারন্যাচারাল ভাইটালিটি। মেডিকেল জুরিসপ্রুডেন্সে এরকম কেসের দেখা পাওয়া যায়…তবু, অত রক্তক্ষরণের পর…লোকটা মানুষ নয়।'

'আপনার জন্যে আমার কিছু করার আছে?' তেমন উৎসাহ বোধ করছে না রানা, স্রেফ দায়িত্ববোধ থেকে জানতে চাওয়া।

'না। সরু সিক দিয়ে দশ কি বারোবার আমার নাড়িভুঁড়ি আর হৃৎপিণ্ড ফুটো করেছে। বেঁচে আছি আর দুই কি এক মিনিট। মরফিয়াকে ধন্যবাদ, শেষ সময়টা প্রায় কোন কষ্টই পাচ্ছি না। এটা জানলে স্যাডিস্ট লোকটা খুশি হবে? না। আচ্ছা, বলুন, বাকি সবাইকে শেষ করেছেন তো?'

'শুধু মিককে বাদে।'

'মিককেও আপনি একটা লাশ ধরে নিন। প্রস্তাবটা তুলেছিল ময়নিহান, ইয়াহুদ সেটা সমর্থন করে। ওরা হিসেব করে বের করে পাহাড় থেকে নেমে বোটে পৌঁছাতে মিকের সময় লাগবে বিশ মিনিট। ওরা বলল, বড্ড বেশি। আমাকে বলল, শক্তি আর তেজ বাড়াবার একটা ক্যাপসুল দাও, রওনা হবার আগে খেয়ে যাবে মিক। ওরাই বলে দিল ক্যাপসুলে কী থাকতে হবে। অর্গানো-ফসফরাস কমপাউন্ডস। এতক্ষণ ওটার প্রাথমিক লক্ষণ প্রকাশ পাবার কথা। আপনাকে আমি আগেই বলেছি, তাকে নিয়ে দুশ্চিন্তা করতে হবে না। কাজেই, নিশ্চয় বুঝতে পারছেন, আমার জন্যে দুঃখ পাবার কোন কারণ নেই।'

রানা কিছু বলল না। আড়ষ্ট ভঙ্গিতে এক মুহূর্তের জন্যে লেম্যানের কাঁধে একটা হাত রাখল, তারপর দ্রুত মই বেয়ে উঠে এল ওপরে।

পাশের দরজা দিয়ে বাড়ি থেকে বেরুবার পরও রক্তের দাগ ধরে এগোতে পারছে রানা। ফায়ারিং-পয়েন্টের ওপর দিয়ে চলে গেছে ট্রেইলটা, তারপর আঁকাবাঁকা নালাটায় পৌঁছেছে–যে নালা বেয়ে চব্বিশ ঘণ্টার কিছু বেশি আগে এখানে নেমে এসেছিল রানা। যতটা সম্ভব সাবধানে এগোচ্ছে ও, চোখ দুটো সতর্ক, কান খাড়া, ছুরি ধরা হাত কোমর সমান উঁচুতে। প্রতি মুহূর্তে আলো কমছে। তবে এগোতে কোন সমস্যা হচ্ছে না। তারপর সেই জায়গাটায় পৌঁছাল, দু'দিকের দেয়াল যেখানে পরস্পরের দিকে কাত হয়ে পড়েছে–ডাঙার দিকটা ক্রমশ উঁচু হচ্ছে, নিচু হচ্ছে সাগরের দিকটা। একটা বাঁক ঘুরল ও। দেখল ময়নিহান দশ ফুট দূরেও নয়।

রানার ডান দিকে একটা গ্র্যানিট পাথরের ঠেক বা অবলম্বনে হেলান দিয়ে দাঁড়িয়ে রয়েছে সে। দেখে মনে হলো শরীরটা তার ছোট হয়ে গেছে। পায়ের কাছে ধুলো ভরা পাথরে রক্ত জমেছে, জমাট বাঁধতে শুরু করেছে এরই মধ্যে। ওই রক্ত অনুসরণ করে লোকটার কাপড়চোপড় হয়ে মুখে এসে স্থির হলো রানার দৃষ্টি। ডান হাতটা দেখা যাচ্ছে না। তার সাদা মোচড়ানো ঠোঁটে অদ্ভুত এক হাসি ফুটল।

'আমার বিশ্লেষণই তাহলে নির্ভুল প্রমাণিত হলো।' যতই অবিশ্বাস্য মনে হোক, কর্নেল ময়নিহানের কণ্ঠস্বর দৃঢ় এবং ভরাট। 'আমি জানতাম তুমি আসবে, রানা। জানি নিজেকে নিয়ে অত্যন্ত গর্বিত বোধ করছ। এ-ও বুঝতে পারছি যে আমাকে বাদে বাকি সবাইকে মেরে রেখে এসেছ। তাই না?'

'হ্যাঁ, তাদের সবার ব্যবস্থা করা হয়েছে।'

'ওয়ান্ডারফুল। তারমানে ব্যাপারটা এখন তোমার আর আমার মধ্যে এসে ঠেকেছে। সেলারের ঠিক উল্টো, এখানকার পরিস্থিতি তুমি নিজের অনুকূলে ভাবছ, তাই না? কিন্তু তা ভাবলে তুমি বোকামি করবে।'

ডান হাতটা সামনে নিয়ে এল ময়নিহান। শক্ত করে ধরে আছে কামানের একটা গোলা। 'দেখলে? এখনও আমিই নিয়ন্ত্রণ করছি। বলে রাখা ভাল, রানা, হঠাৎ যদি কিছু করতে যাও তুমি, কিংবা অ্যাক্সিডেন্টালি আমি যদি এটা ফেলে দিই, দু'জনেই আমরা মারা যাব। আমি তো এমনিতেই মারা যাচ্ছি। কাজেই এক অর্থে, সেটা তোমার মৃত্যু ডেকে আনবে। হ্যাঁ, একটু পর এই শেলের পিছনটা

আমি আমার পাশের পাথরে খুব জোরে ঠুকব। আসলে বিধাতার কী পরিহাস দেখো, আমাদের নিয়তি একই সুতোয় বাঁধা। কি, ঠিক বলিনি? আমার মত তুমিও ব্যাপারটা অনুভব করছ না?'

'কি চাও তুমি, ময়নিহান?' সেকেন্ডের ভগ্নাংশ আর ফুট নিয়ে হিসেব কষছে রানা, কল্পনার চোখে দেখবার চেষ্টা করছে ওর পিছনের বাঁকটা কী আকৃতির, ভাবছে লাফ দিয়ে বাঁ দিকের নিচু পাঁচিলটা টপকাবার ঝুঁকি নেয়া উচিত হবে কি না।

'স্বীকার করো, রানা। স্বীকার করো, আমিই তোমার জীবনের সবচেয়ে যোগ্য প্রতিদ্বন্দ্বী। তোমার ওস্তাদ হবার সমস্ত গুণ একমাত্র আমার ভেতরই দেখেছ তুমি। আমার সঙ্গে লাগতে এসে প্রতিটি পর্যায়ে হেরে গেছ। স্বীকার করো!'

'কেন স্বীকার করব? তা তো সত্যি নয়। তোমার লোকবল বেশি ছিল, চুপিচুপি ষড়যন্ত্র পাকাবার জন্যে হাতে প্রচুর সময় পেয়েছ। এত রকম সুবিধে কী কাজে লাগল তোমার? নিজেই তো খুন হয়ে গেলে!'

ময়নিহানের ঝকঝকে দু'সারি দাঁত বেরিয়ে পড়ল, পরস্পরের সঙ্গে চেপে আছে। 'আমি তোমাকে হুকুম করছি! তা না হলে কিন্তু–' এই সময় চোখের পাতা ঝাপটাতে শুরু করল, সেই সঙ্গে মুখ থেকে ফিনকি দিয়ে রক্ত বেরুল খানিকটা। বাঁ দিকের পাঁচিল লক্ষ্য করে আগেই লাফ দিয়েছে রানা, পাঁচ ফুট নিচের কর্কশ শুকনো ঘাসের চাপড়ায় হাঁটু আর কনুই দিয়ে পড়ল, তারপর ক্রল করে চলে এল একটা বিরাট বোল্ডারের পিছনে।

'কোথায় তুমি, রানা?' মাথার ওপর দিক থেকে ময়নিহানের দুর্বল কণ্ঠস্বর ভেসে এল। 'তবে প্রশ্নটার উত্তর একজন বোকাও দিতে পারে। আমার উচিত ছিল বোমাটা এক মুহূর্ত আগে ফাটিয়ে দেয়া, তাই না? আসলে কী হয়েছে জানো? তুমি হেরে গেছ, তোমার মুখ থেকে এটা শোনবার ইচ্ছে আমার আঙুলগুলোকে দেরি করিয়ে দিয়েছে। বলতে পারো, এটা নিয়ে এখন কী করব আমি? এর উত্তর অবশ্য সহজ। এটাকে আমি নিজের পাশে ফাটাব। একটা বিগ ব্যাঙের সঙ্গে বিদায় নেই। দুনিয়াটাই তো একদিন এভাবে শেষ হবে।

'এর আগে তোমাকে আমি ভুল বলেছি। ম্যাকার্থি আমাকে বিভ্রান্ত করেছিল। কিংবা তোমার সম্পর্কে ফাইলটা আমি ভাল করে পড়িনি। সেলারে যখন টরচার করছিলাম, নিজেকে একজন গডের মত মনে হয়নি। অসুস্থ, অপরাধী আর লজ্জিত লাগছিল। শুধু ছেলেমানুষি নয়, পাকা শয়তানের মত আচরণ করেছি। গোটা ব্যাপারটাই তো অন্যায়, বিদঘুটে আর অর্থহীন–তাই আমি ক্ষমা প্রার্থনা করবার একটা সুযোগ চাই। তুমি কী আমাকে মাফ করতে পারবে?'

রানা কোনদিন মনে করতে পারবে না ঠিক কী বলতে যাচ্ছিল, শুধু মনে থাকবে একেবারে শেষ মিলিসেকেন্ডে ঠোঁট কামড়ে কথাগুলোকে জিভের ডগায় আটকে ফেলে। সগর্জন নীরবতা ভাঙছে না। তারপর, আবার সেই ভারী ও জোরাল গলায় চিৎকার ভেসে এল। 'জাহান্নামে যাও তুমি!' ক্ষেপণাস্ত্র আকৃতির বোমাটা দোলকের মত আন্দোলিত হচ্ছিল, হঠাৎ সেটা একদিকে ছুঁড়ে দিল

ময়নিহান, নিজেও জানে না কোনদিকে। একটা ফাটলের ভেতর পড়ে বিস্ফোরিত হলো গোলাটা। আওয়াজটা ভোঁতা শোনালেও, পায়ের নিচের পাথুরে মাটি কেঁপে উঠল। তারপর যে নিস্তব্ধতা নামল সেটার গর্জনও কম জোরাল নয়।

নালার গায়ে গা ঠেকিয়ে হাঁটুর ওপর নিচু হলো কর্নেল ময়নিহান। তার চোখ দুটো এখনও খোলা। দৃষ্টি রানার হাতে ধরা ছুরির ওপর স্থির। ভাষাটা পড়তে অসুবিধে হলো না–নিঃশব্দে করুণা ভিক্ষা চাইছে সে।

রানা হাঁটু গাড়ল। ছুরির ডগাটা ময়নিহানের হৃৎপিণ্ডের ওপর ছোঁয়াল। তারপর চাপ দিল। এমন কী তখনও, শেষ মুহূর্তের অমানুষিক জীবনীশক্তির সাহায্য নিয়ে তার রক্তাক্ত ঠোঁট নড়ে উঠল, গলা থেকে বেরিয়ে এল ঘড়ঘড়ে আওয়াজ। 'গুডবাই, রানা।' সেই সঙ্গে ময়নিহান পরিণত হলো বিরাট আকারের একটা পুতুলে।

এরপর স্বপ্নটা ফিরে এল। তবে এবার রানাই সে-ই আকৃতিবিহীন জীব, আগে যার কাছ থেকে পালাচ্ছিল ও, জানে না কী বা কাকে ধাওয়া করছে, তবে তাকে বা সেটাকে পাশ কাটাবার সময় সমস্ত কিছু দপ করে জ্বলে ওঠা একটা আগুনে সব ঢাকা পড়ে গেল। আশপাশে কোথাও আছে সিকান্দার। সিকান্দার যেন কাঁদছে। আমিনাও কাছাকাছি কোথাও আছে। তারপর কেউ কোথাও আর থাকল না।

দশ

'স্থানীয় কর্তৃপক্ষকে সব বুঝিয়ে ঠাণ্ডা করতে আজ সকালে প্রায় এক গ্যালন ঘাম ঝরাতে হয়েছে আমাকে,' সংশ্লিষ্ট মন্ত্রণালয়ের সচিব সৈয়দ নির্ঝর হাসান বললেন। 'ছোট দেশ, আমাদেরই মত তুচ্ছ বিষয় নিয়ে গোঁ না ধরলে ভাবে সার্বভৌমত্ব রক্ষা করা গেল না। গ্রিসের মর্যাদা আর এথেন্স পুলিস ডিপার্টমেন্টের সুনাম নিয়ে দীর্ঘক্ষণ আলাপ হলো। তবে, সার, ওদের কিছু যুক্তি আমি মেনেও নিয়েছি।' রাহাত খানের দিকে তাকিয়ে ছিলেন ভদ্রলোক, এখন রানার দিকে ফিরলেন। 'রাস্তায় একটা বন্দুকযুদ্ধ–চারজন মারা গেছে, তাদের মধ্যে দু'জন বিদেশী, বিদেশীদের মধ্যে একজন আবার এক ধরনের ডিপ্লোম্যাট। কারও বিরুদ্ধে কোন প্রমাণ নেই, তবে কমিশনারের সঙ্গে কথা বলবার সময় আমি বুঝতে পেরেছি আসলে কী ঘটেছে তা তিনি আন্দাজ করে নিয়েছেন। ওহ্, ধন্যবাদ।'

সাদা কোট পরা একজন ওয়েটারের হাত থেকে এক গ্লাস ঠাণ্ডা টমেটো জুস নিলেন সচিব নির্ঝর হাসান, চুমুক না দিয়ে মার্বেলের টেবিলে নামিয়ে রাখলেন সেটা, তারপর নিজের নামের সঙ্গে মিল রেখে আবার শুরু করলেন।

'তারপর রোববারে এই ঘটনা। আধ ডজন লাশ, দু'জন ইজরায়েলি ট্যুরিস্ট নিখোঁজ, রহস্যময় বিস্ফোরণ, আল্লাহ্ই জানেন আরও কত কী–অথচ অপরাধী বা

সাক্ষী হিসেবে কাদেরকে পাচ্ছে ওরা? একটা বিদেশী মেয়ে, যে কথা বলবে না বা বলতে পারে না; আধপোড়া একটা গ্রিক গুণ্ডা, যে বলছে সে কিছুই জানে না, শুধু এইটুকু জানে যে মাসুদ রানা নামে এক লোক তার এক বন্ধুকে খুন করেছে আর তার বোটটা পুড়িয়ে দেয়ার চেষ্টা করেছে। আমি বলতে বাধ্য হচ্ছি, মিস্টার রানা—অবশ্যই অফ্ দ্য রেকর্ড, বুঝতেই পারছেন—এত কিছুই যখন করলেন, মিশনটায় পরিপূর্ণতা আনবার স্বার্থে এই লোকটারও একটা ব্যবস্থা করা উচিত ছিল না? এ-কথা এজন্যে বলছি যে আপনার রিপোর্টে দেখলাম, সেদিন সকালেই আপনি তিনজন প্রতিপক্ষকে সাফ করে দিয়েছেন। আরেকটা হলে মহাভারত কি সত্যি অশুদ্ধ হয়ে যেত?'

হোটেল ইপিরাস ইন্টারন্যাশনাল, ওপরতলার ব্যাংকুইট রুমের এয়ারকন্ডিশনিং ইউনিট ঠিকমত কাজ করছে না; জোরাল কথাবার্তার আওয়াজও খুব বেশি হচ্ছে, বিশেষ করে ড্রিঙ্ক টেবিলের কাছে জড়ো হওয়া ভারতীয় গ্রুপটা রীতিমত শব্দ দূষণের উৎস হয়ে উঠেছে। তবে, বসের ছোট্ট করে মাথা ঝাঁকানোটাকে অনুমতি ধরে নিয়ে, উত্তর দেয়ার জন্যে প্রস্তুত হলো রানা।

'মিস্টার সেক্রেটারি, সেটা হত ঠাণ্ডা মাথায় খুন। ততক্ষণে আমি ক্লান্ত হয়ে পড়েছিলাম, আশপাশেও এমন কেউ ছিল না যে কাজটা তাকে করে দিতে বলব। ব্যাখ্যা দিতে আপনার সমস্যা হওয়ায় আমি দুঃখিত। তবে অসমর্থিত অভিযোগ খুব একটা গুরুত্ব বহন করে না, করে কি?'

'আই সী, আই সী,' রানা থামবার আগেই বিড়বিড় করছেন নির্ঝর হাসান।

'শেষ পর্যন্ত কী ঘটল, নির্ঝর?' এই প্রথম মুখ খুললেন রাহাত খান। সচিব ভদ্রলোকের নামই ধরবেন তিনি, যেহেতু উনি ঘনিষ্ঠ বন্ধুর ছেলে।

'জ্বী, সার—আংকেল। শেষ পর্যন্ত ওদেরকে আমরা বোঝাতে পেরেছি যে, কোনও রকম অভিযোগ না তোলাটাই বুদ্ধিমানের কাজ হবে। এ-ব্যাপারে কেউ কিছু জানে না, এই ভান করাই সবদিক থেকে নিরাপদ। কারণ তা না হলে সিআইএ গ্রিক সরকারকে চেপে ধরবে। বলবে, তাদের সহায়তা নিয়ে তাদেরই একটা দ্বীপে বিদেশী কিছু রাষ্ট্রের সরকারী কর্মকর্তারা আমেরিকার বিরুদ্ধে ভয়ানক কোন ষড়যন্ত্রের ছক তৈরি করতে বসেছিল। ওদের হোম সেক্রেটারি আমার যুক্তি মেনে নিয়েছেন। ইয়াহুদের আসল পরিচয় পেয়ে রীতিমত শিউরে উঠেছেন ভদ্রলোক। তিনি আমাকে কথা দিয়েছেন, টপ সিক্রেট কনফারেন্সের ব্যাপারেও তাঁর সরকার কোন উচ্চবাচ্য করবে না।'

'এটা বিরাট একটা স্বস্তিকর ব্যাপার,' রানার দিকে ফিরে বললেন রাহাত খান।

'জ্বী, আংকেল, জ্বী—বিরাট একটা স্বস্তি।' নির্ঝর হাসান এরপর রানার দিকে তাকালেন। 'আপনার বন্ধু, মিস্টার রানা। সিকান্দার, তাই না? ভাবছি প্লেন ধরবার আগে তাঁর সঙ্গে দু'মিনিট কথা বলা দরকার কি না।'

'যদি সময় করতে পারেন, প্লিজ,' বলল রানা। 'নিজের জীবনের ওপর ঝুঁকি নিয়ে, স্বেচ্ছায়, আমাকে সাহায্য করেছেন তিনি।'

‘ও, আচ্ছা, তবে তো অবশ্যই ধন্যবাদ জানাতে হবে তাঁকে। আমি তাহলে একবার ঘুরে আসি, আংকেল।’

তিন ঢোকে জুস শেষ করে নির্ঝর হাসান ব্যাংকুইট রুম ছেড়ে চলে যাবার পর রাহাত খান বললেন, ‘আসলে কী ঘটেছে শোনার পর এ-মুহূর্তে ভারতীয়রা যথেষ্ট লজ্জিত আর অনুতপ্ত বোধ করছে। অফিশিয়ালি ক্ষমা চেয়েছেন মিস্টার রাধাবল্লভ সিংহানি।’

‘র চীফ? টেলিফোনে?’

‘সশরীরে। তবে তাঁর অনুরোধ, সরাসরি তোমার সঙ্গে কথা বলবেন। তা না হলে নাকি অবশ্য পালনীয় একটি দায়িত্ব ঠিকমত তাঁর পালন করা হয় না। তুমি কথা বলতে চাও কি না সেটা তোমার ইচ্ছে, তবে ওরা তোমাকে নিতে আসবে...’

এই সময় সুদর্শন, স্মার্ট একজন ভারতীয় তরুণ অফিসারকে ওদের দিকে এগিয়ে আসতে দেখা গেল। ‘এক্সকিউজ মি, জেনারেল, সার। আমাদের চীফ রাধাবল্লভ সিংহানি আজকের ফ্লাইটেই দিল্লিতে ফিরে যাবেন—আর দু'ঘণ্টা পর। উনি আপনার সঙ্গে কথা বলার সুযোগ পেলে খুশি হবেন, মিস্টার রানা। আপনি কি আসবেন, প্লিজ?’

র-র চীফ রাধাবল্লভ সিংহানি দীর্ঘকায় পুরুষ। ভদ্রলোকের বয়স পঞ্চাশের বেশি নয় দেখে মনে মনে একটু অবাকই হলো রানা। বিজ্ঞানী আবুল কালাম ভারতের প্রেসিডেন্ট হবার পর র-কে নতুন করে ঢেলে সাজানোর একটা পরিকল্পনা নেয়া হয়েছে, সেই পরিকল্পনার প্রথম কাজ ছিল পাঁচজন সিনিয়র কর্মকর্তাকে ডিঙিয়ে রাধাবল্লভ সিংহানিকে চীফ বানানো। ভদ্রলোক রানার হাত ধরবার পর আর ছাড়লেন না, ‘পরিচয় বিনিময়ের কোনও দরকার নেই, পরস্পরকে আমরা চিনি,’ বলে ইঙ্গিতে নিজের লোকজন আর বডিগার্ডদের দূরে সরে থাকার নির্দেশ দিলেন, রানাকে নিয়ে চলে এলেন সম্রাটদের বসবার উপযোগী করে তৈরি একজোড়া সিংহাসনের কাছে, পাশেই একটা মার্বেল ফায়ারপ্লেস। মুখোমুখি বসল ওরা। সিংহানি জানতে চাইলেন, ‘কিছু নেবেন?’

‘না। ধন্যবাদ।’

‘গুড। আপনাকে আমি বেশি দেরি করিয়ে দেব না। প্রথমেই আমি যেটা বলতে চাই, আপনি আমার দেশের যে উপকার করেছেন তার তাৎপর্য ভাষায় বলে বোঝানো সম্ভব নয়। আমরা কৃতজ্ঞ। আমাদের প্রেসিডেন্ট এবং প্রধানমন্ত্রী, দুজনকেই সমস্ত কিছু জানানো হয়েছে। তাঁরা আমাকে নির্দেশ দিয়েছেন, আমি যেন নিজে আপনার সঙ্গে দেখা করে তাঁদের ধন্যবাদ আর অভিনন্দন আপনার কাছে পৌঁছে দিই। এসব নিয়ে অফিশিয়ালি আরও অনেক কিছু ঘটবে পরে।

‘কৃতজ্ঞতা প্রকাশের পাশাপাশি এটাও খুব উচিত হবে যে প্রতিষ্ঠান হিসেবে র আপনার কাছে ক্ষমা চাইবে...’

‘এ-সবের সত্যিই আসলে কোন প্রয়োজন নেই,’ বলল রানা, সাংঘাতিক অস্বস্তি বোধ করছে, ভয়ানক বিব্রত। ‘মিস্টার সিংহানি, আমরা বরং সাদামাঠা ভাষায় প্রয়োজনীয় কয়েকটা বিষয় নিয়ে কথা বলি? যেমন—এখানে আপনাদের সেট-আপে

একজন বিশ্বাসঘাতক ছিল–ভগৎসিং আচারিয়া মৃত্যুর আগে সেরকমই ইঙ্গিত দিয়ে গেছেন–তাকে কি আপনারা শনাক্ত করতে পেরেছেন?'

ধীরে-সুস্থে একটা চুরুট ধরালেন র চীফ। 'বিশ্বাসঘাতক মানে ডাবল এজেন্ট,' বললেন তিনি। 'হ্যাঁ, অবশ্যই তাকে আমরা চিনতে পেরেছি। তার ব্যবস্থাও করা হয়েছে, মিস্টার রানা।'

'তারপর ধরুন জেনারেল মাধব সিন্ধিয়া...'

'ওটা একটা ইডিয়েট,' বলে তাড়াতাড়ি নিজেকে শুধরে নেয়ার চেষ্টা করলেন সিংহানি, '...মানে, ওটা একটা ইডিঅটিক কাজ হয়েছে–মিস্টার সিন্ধিয়ার উচিত ছিল আমিনাকে পুরোপুরি বিশ্বাস করা। এই ভুলের মাশুল তাঁকে দিতেও হয়েছে। তিনি নেই।' নেই বলতে কী বোঝাতে চাইলেন তা আর ব্যাখ্যা করলেন না। 'তবে নেই হবার আগে ভাগ্যটা খুব ভালই ছিল বলতে হবে তাঁর।'

'কি রকম?'

'ইয়াহুদের ছোঁড়া কামানের গোলা সবগুলো সাগরে বিস্ফোরিত হয়। সবাই আতঙ্কে নীল হয়ে গেলেও, কারও কোন ক্ষতি হয়নি। বলতে হবে, আমার ভাগ্যটাও ভাল। কনফারেন্সের ব্যাপারটাকে এখানকার কর্তৃপক্ষকে হালকা করে দেখাবার জন্যে পুরো একটা দিন অমানুষিক পরিশ্রম করতে হয়েছে আমাকে। ওরা যদি জানত কারা জড়িত, আমি বিপদে পড়ে যেতাম।'

'কিন্তু যতই আপনি হালকাভাবে দেখাবার চেষ্টা করুন, এটা তো আর সম্ভব নয় যে বোটভর্তি ইল্লিগাল ইমিগ্র্যান্টকে পাচার করে আনাটা গোপন রাখতে পারবেন।'

'আপনার এই প্রশ্নের উত্তর খুব কঠিন, আবার খুব সহজ। সহজ উত্তরটাই দিই–সোনা-চাঁদি কথা বলে। তাছাড়া, কনফারেন্স তো শেষও হয়ে গেছে। কেউ এসেছিল কি না, সে তারা কীভাবে প্রমাণ করবে? তাঁরা কি কেউ আছেন?'

হেসে ফেলল রানা। 'বেশ। এবার মাধব সিন্ধিয়া সম্পর্কে আরও কিছু বলতে পারেন।'

'কামানের ওই গোলাগুলো আপনি ফেলেছেন বলে দাবি করলেন তিনি। কিন্তু দাবির পক্ষে কিছু দাঁড় করাতে পারলেন না। সংশ্লিষ্ট সরকারগুলোকে সিআইএ-র এই ষড়যন্ত্র সম্পর্কে বিস্তারিত জানানো হয়েছে। কাজেই আপনাকে বা আপনার বসকে এ-ব্যাপারে উদ্বিগ্ন হতে হবে না। মিস্টার সিন্ধিয়াকে সরিয়ে নতুন কর্মকর্তাকে দায়িত্ব দেয়া হয়েছে, তিনি আমিনার সাহায্য নিয়ে তদন্ত শুরু করবেন।' সিংহাসন ছেড়ে দাঁড়ালেন সিংহানি। রানার দিকে ডান হাত বাড়ালেন। 'ভবিষ্যতে যখনই মনে হবে আমি আপনার কোন উপকারে আসতে পারি, সঙ্গে সঙ্গে যোগাযোগ করতে ভুলবেন না, মিস্টার রানা।'

'ধন্যবাদ।'

'গুডবাই।'

ভারতীয় দল থেকে নিজেকে আলাদা করে নিয়েছে আমিনা, এই মুহূর্তে কথা বলছে সিকান্দারের সঙ্গে। সেদিকে এগোল রানা।

'ধন্যবাদ, মিস্টার সিকান্দার। আপনার ঋণ কোনদিন শোধ করতে পারব না। এ-সব একবার বলেছি, তবে এটা বোধহয় আরেকটা অনুষ্ঠান যেখানে রিপিট করার সুযোগ আছে।'

সিকান্দার রানার পিঠ চাপড়ে দিল। 'ধন্যবাদ দেয়ার কোন প্রয়োজন নেই। ব্যাপারটা আমি উপভোগ করেছি। সুযোগ পেলে আবার এই কাজ করব। তবে এত কিছুর পরও বিরাট একটা অতৃপ্তি রয়ে গেছে আমার ভেতর।'

'আমি জানি,' বলল আমিনা, তার চেহারা থমথম করছে।

'আপনার মনে পড়বে না, মিস্টার রানা, কিন্তু সাগর থেকে হাওয়া খেয়ে ফেরবার সময় নিজেকে আমার উদ্‌ভ্রান্ত লাগছিল। ইয়াহুদকে ব্যাপারটা আমি কোনমতেই বোঝাতে পারলাম না, মিস্টার রানা।' সিকান্দারকে অসহায় আর বিষণ্ন দেখাচ্ছে। 'তার ধারণা, বসনিয়া–হার্জেগোভিনায় সে যা করেছে, ঠিকই করেছে। বললাম, বাচ্চাদের কেন খুন করলে? সে উত্তর দিল, যুদ্ধে সব চলে–ওটা ছিল প্রতিশোধ ও রণকৌশল। আমি তাকে উপলব্ধি করাতে চেয়েছিলাম তার অপরাধ কী ভয়ঙ্কর। চেয়েছিলাম সে অনুতপ্ত হোক। ঈশ্বরের কাছে ক্ষমা চাক। কিন্তু বৃথাই। আমি গুলি করতে উল্টে অভিশাপ দিল। গুলিটা আমি শাস্তি হিসেবে করতে চেয়েছিলাম, কিন্তু রেগে গিয়ে সময়ের আগেই ট্রিগার টিপে দিই...'

'তাহলে ঠাণ্ডা মাথায় নয়,' বলল রানা, চেষ্টা করছে সান্ত্বনা দিতে।

'হয়তো তাই। তবে আমার কোন অপরাধবোধ নেই। বাদ দিন। আপনার কথা বলি। শুকুর আল্লা, শরীরটা খুব মজবুত, তাড়াতাড়ি সেরে উঠেছেন। আবার সেই গ্ল্যামারাস এসপিওনাজ এজেন্ট। আমার ধারণা, আপনার ওই সুট খুদে ইলেকট্রনিক্স যন্ত্রপাতিতে ঠাসা।'

'পুরোপুরি।' একটু বিস্ময়ের সঙ্গে রানার এই প্রথম মনে পড়ল ওর এজেন্সির টেকনিক্যাল ডিপার্টমেন্ট কিছু ডিভাইস সত্যি সত্যি সুটটায় ভরে দিয়েছিল। যদিও বিপদের সময় ওগুলো কোন কাজেই লাগেনি।

নিজের গ্লাসে চুমুক দিল সিকান্দার। 'আমাকে যেতে হচ্ছে। আপনাকে আমি ডায়াটাস সম্পর্কে পরে জানাব। পরিচিত সবাইকে তার খোঁজ করতে বলেছি। সৎ একটা ছেলে, বোট নিয়ে পালাবে, এ আমি বিশ্বাস করি না।'

'না, করি না,' বলল আমিনা।

'আমিও।' ডায়াটাসের বুদ্ধিদীপ্ত চোখ দুটো মনে পড়ছে রানার।

'ও, ভাল কথা, শুনলাম সকালে আপনি চলে যাচ্ছেন। গ্রিসে আবার আসবেন, মিস্টার রানা। যখন আমেরিকান আর ভারতীয়রা আপনাকে ধাওয়া করছে না। আপনাকে দেখাতে নিয়ে যাবার মত অনেক জায়গা আছে গ্রিসে। গুডবাই।'

'আসব। গুডবাই, মিস্টার সিকান্দার।'

করমর্দন করল ওরা। আমিনার কপালে একটা চুমো দিয়ে চলে গেল সিকান্দার।

রানা যেন হলুদ মাখন দিয়ে তৈরি একটা মুখ দেখছে। 'কেমন আছ, আমিনা?'

‘কেন, সুখী একটা মেয়েকে দেখে তুমি চিনতে পারো না?’

‘হ্যাঁ, চিনতে পারছি। তোমাকে সুখীই দেখাচ্ছে বটে। তবে ভাবছিলাম…সেই রাতের পর…’

হাসল আমিনা। ‘সেই রাতে ওরা আমার কোন ক্ষতিই করতে পারেনি, রানা।’

রানার কাছে ব্যাপারটা অবিশ্বাস্য মনে হলেও চেহারায় কিছুই ফুটল না। ‘তাই?’

‘জানি বিশ্বাস করছ না।’ আবার হাসল আমিনা। ‘তবে এবার করবে। আমি ওদেরকে বলেছিঃ যা খুশি করতে পারো, আমার কোনও আপত্তি নেই, বরং খুশি হব। তবে একটা কথা তোমাদের না জানালে অন্যায় হবে–আমার এইডস্ আছে।’

‘বলো কী! এই কথা শুনে কী বলল ওরা?’

‘কিচ্ছু বলেনি, লাথি মেরে আমাকে বিছানা থেকে ফেলে দিল মাটিতে। ব্যস, ওখানেই শুয়ে থাকলাম। এবার চলো, আমি জানি তোমার খিদে পেয়েছে। পায়নি?’

‘সাংঘাতিক। কোথায় যাব?’

‘ইন্টারেস্টিং একটা রেস্তোরাঁ চিনি আমি। ভাল কথা, তুমি সিকান্দার চাচাকে যেভাবে ধন্যবাদ দিলে আমাকে কিন্তু সেভাবে দিলে না।’

‘দিইনি ইচ্ছে করেই। কারণ তুমি তো ডিউটিতে ছিলে। তুমি ইন্ডিয়ান সিক্রেট সার্ভিসের একজন এজেন্ট। কিংবা একসময় ছিলে।’

রানার দিকে তির্যক দৃষ্টিতে তাকাল আমিনা। ‘এখনও আছি। এটা আমার চাকরি।’

‘এত কিছুর পরেও এটাকে তুমি ভাল চাকরি বলো?’

‘হ্যাঁ, বলি। সবার ব্যর্থতা আর বোকামি আমাকে বরং মনে করিয়ে দিচ্ছে চাকরিটা সত্যিই গুরুত্বপূর্ণ।’

‘এটাই যদি তোমার মনের কথা হয়, তাহলে ওদের সঙ্গে লেগে থাকাই উচিত তোমার।’

রানার কাঁধে একটা হাত রাখল আমিনা। ‘অন্তত আজকের রাতটা আমরা সিরিয়াস না হলে পারি না? হাতে আর সময় কোথায়! চলো, তুমি তো কালই চলে যাচ্ছ।’

‘হ্যাঁ। চলে যেতে হয়, যেতে দিতে হয়। তবে বিশ্বাস করো, সত্যি চলে যেতে চাই না আমি। করো বিশ্বাস?’

‘করি।’

পাঁচ মিনিট পর এথেন্সের একটা চৌরাস্তায় হাত ধরাধরি করে হাঁটবার সময় রানা বলল, ‘আমার সঙ্গে ঢাকায় চলো, আমিনা। অল্প ক’দিনের জন্যে। আমি জানি ওরা তোমাকে ছুটি দেবে।’

‘যেতে আমি চাই, তুমি যেমন ফিরতে চাও না। কিন্তু আমার পক্ষে তা সম্ভব

নয়। আমি জানতাম, তুমি হয়তো বলবে আমাকে কথাটা। এ-ও জানতাম, হ্যাঁ বলার জন্যে ব্যাকুল হয়ে আছে আমার অন্তর। তারপর বুঝতে পারি, কেন যেন ব্যাপারটা উচিত হবে না।'

'সেটা আমিও এখন বুঝতে পারছি। দু'জন দুটো আলাদা দেশের হয়ে কাজ করি, এটাই একমাত্র বাধা। বুঝলাম, কিন্তু মনটা খারাপ হয়ে গেল।'

'আমারও। এর জন্যে আমাদের পেশাই দায়ী। লোকে মনে করে কী মজার চাকরি, স্বাধীন, কত জায়গায় বেড়ানো যায়। কিন্তু আসলে তো আমরা মুক্ত নই।'

'না,' বলল রানা। 'আমরা বন্দি। তবে সুযোগ যখন আছে, এসো, সময়টা উপভোগ করি। তবে একটা কথা,' থমকে দাঁড়িয়ে পড়ল রানা রাস্তার ওপর। গলা নামিয়ে সিরিয়াস ভঙ্গিতে বলল, 'সত্যিই এইড্স্ নেই তো আবার?'

হা-হা করে হেসে উঠল আমিনা। 'থাকলেই কী! যা হওয়ার তো হয়েই গেছে!'

রাস্তার সবাইকে সচকিত করে এবার দুজনই গলা ছেড়ে হেসে উঠল এক সঙ্গে।

চলল আবার হাত ধরাধরি করে।

***